জীবনস্মৃতিতে বিশ্বচিন্তায়

মানুষ আমরা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

কাছের ও দূরের বিশ্বটিকে নানা দিক থেকে যেভাবে অনুভব করেছি সেসব কিছু চিন্তা নিয়ে এই বই। এর উপজীব্য মূলত মানুষ– 'মানুষ আমরা', যা কিনা আমাদের বৈজ্ঞানিক নামের প্রকারান্তর। বিজ্ঞান বল্‌ছে, অভিজ্ঞতা বল্‌ছে বিশ্ব-মানুষটি একই মানুষ– তার আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, জীবন আশ্চর্যজনক ভাবে একই। সব দেশে, সব গোষ্ঠিতে একই জেনেটিক মহা-লাটারির একই বন্টনে যাবতীয় সম্ভাবনাগুলোকে নিয়েই সে আসে। সে সবের বিকাশ কতখানি হবে তার ওপর গর্ভকালীন মায়ের পরিস্থিতি থেকে শুরু করে পরিবার, শিশু-শিক্ষা ইত্যাদি দারুণ প্রভাব রাখে। আর্টস-সায়েন্সে বিভক্ত দুই সংস্কৃতি চতুর্মুখী শিক্ষাকে দূরে রেখে তার পরবর্তী বিকাশে বাধ সাধ্‌ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে হওয়ার কথা বিশ্বদৃষ্টি লাভের স্থল– সেটি এখন কোন্ পর্যায়ে?

বিশ্ব-মানুষ আজ এক রকম অস্থিত্ব-সংকটে– কোভিড, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব ইত্যাদি এখন গায়ের ওপর এসে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সবাই বাঁচলে তবে নিজে বাঁচবো, তা যতই শক্তিমান হই না কেন। সবাই বাঁচার একটাই পথ– বিশ্ব সমঝোতা, আসলে বিশ্ব-মানুষের সমঝোতা। এই প্রক্রিয়াটি এখনো অনুপস্থিত। মৌলিক মানবিক মূল্যবোধগুলোকে যে কোন মূল্যে সর্বত্র নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতাকে অন্তর্ভুক্ত করেই শুধু সেটি সম্ভব।

প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

জীবনস্মৃতিতে বিশ্বচিন্তায়

মানুষ আমরা

জীবনস্মৃতিতে বিশ্বচিন্তায়

মানুষ আমরা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৪৭৫ টাকা

ISBN 978-984-.....

Jibinsmritetey Bishochintay Manush Amra by Muhammad Ibrahim
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2022, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 475 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

উ|ৎ|স|র্গ

গত দুই বছরে কোভিড বিশ্বমারিতে যে অনেক বন্ধু, সুহৃদ ও সহকর্মীকে হারিয়েছি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

বেশ কয়েক বছর আগে নিজের জীবনস্মৃতি প্রকাশ করেছিলাম আমার দেখা মানুষ, দেশ ও বিজ্ঞানের গল্পটি বলে। সেটি ছিল এক রকম কলম দিয়ে ছবি এঁকে যাওয়ার মত– যা দেখেছি, যা ভালো লেগেছে, যা করেছি, তার ছবি। জীবনের একটি পর্যায়ের কথায় এসে ওই আঁকাটি শেষ করেছিলাম। এই বইতে জীবনস্মৃতির দিকে আরেকবার তাকাতে গিয়ে, বিশেষ করে শেষ করার পরের সময়টির দিকে, ঠিক করলাম এবার ঘটনার ছবি নয়, বরং নিজের চিন্তার ছবিটাকেই বড় করে তোলা যাক। চিন্তাগুলোও অনেকটা সেই দেখা, ভালো লাগা ও করা জিনিসগুলো থেকে উৎসারিত হয়েছে, তবে অন্য ভাবে জানা বিষয়গুলো থেকেও। এসবের মধ্যে দিয়ে কাছের ও দূরের বিশ্বটিকে নানা দিক থেকে যেভাবে অনুভব করেছি তা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার ইচ্ছা থেকেই এটি বই লেখা। সে কথা মূলত মানুষের জীবন নিয়ে আমার কাছের মানুষের, দেশের মানুষের, এবং আরও বড় কথা বিশ্বের মানুষের। এটি আমরা মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসা চিন্তা।

মনে হয়েছে বিজ্ঞান যা বলছে, নানা অভিজ্ঞতা যা বল্‌ছে তাতে বিশ্ব-মানুষটি একই মানুষ– সব দেশে, সব গোষ্ঠিতে। তার জন্ম, তার বেড়ে ওঠা, তার শিক্ষা, তার আশা-আকাঙ্খা, তার জীবন এসব আশ্চর্যজনকভাবে এক রকম। সেখান থেকে আমাদের নিজেদেরও সেই পর্যায়গুলোকে আলাদা করার কোন উপায় নেই– তাই আত্মচিন্তা আর বিশ্বচিন্তা একই সঙ্গে চলেছে। সর্বাধুনিক বিজ্ঞান এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিতে পেরেছে– একদিকে মানুষের বংশগতি অন্যদিকে একেবারে শৈশবে তার পারিবারিক ও পারিবেশিক পরিস্থিতি কীভাবে তার ভবিষ্যৎকে অনেকটা প্রভাবিত করে, সবচেয়ে বেশি করে যে সময় সে গর্ভে থাকে তখন তার মায়ের পরিস্থিতি। মানব জেনোম গবেষণা একেবারে তার কোষের মধ্যে ডিএনএ'এর বার্তা পড়ে এ রকম অনেক বিষয়ের খবর দিতে পেরেছে। বরাবরের মত বিজ্ঞান থেকে পাওয়া ইঙ্গিতগুলোই আমার ভাবনাকে তার মূলসুর দিয়েছে। ভাবনার বাকিটা এসেছে অন্য মানুষরা কী করছে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে– দেশের মানুষরা কী করছে, দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষ কী করছে। তার মধ্যে কিছু কিছু নিজে কাছে থেকে দেখা, এমনকি নিজেরই অভিজ্ঞতা,

বাকিগুলো নানা মাধ্যম থেকে দৈনন্দিন যা জেনেছি।

বিশ্বের সে সব মানুষের কাজ ও কথা আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে তাঁরা অন্য মানুষের জন্য কাজ করেছেন, নিজেদের চিন্তা, জীবন অভিজ্ঞতা আর সুস্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে অন্যকে ভাবিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ক'দিন আগের পরস্পরের বিধ্বংসী শত্রু দেশগুলোকে অভাবনীয় এক ঐক্যের মধ্যে আনতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বপ্ন যে কয়েকজন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ প্রথম দেখিয়েছিলেন, অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে আমাদের গায়ের ওপর প্রায় এসেই পড়েছে তা নিয়ে করণীয় সম্পর্কে যেই বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা পথ দেখিয়েছেন, অথবা যে বয়োজেষ্ঠা মার্কিন কংগ্রেস-ওয়ামেন তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে রাজনীতি মানে হলো প্রত্যেকটি ব্যক্তির সমব্যথী হওয়া, সেই মানুষটি সংখ্যাগরিষ্ঠের হোক কি সংখ্যালঘিষ্ঠের হোক, সপক্ষের হোক কি বিপক্ষের হোক। আর আমাকে মুগ্ধ করেছে সৌখিন নাগরিক চর্চাকারীরা, যাঁরা নিজের বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলোর বাইরে গিয়ে জীবনে অনেক কাজ করেছেন শুধু করা উচিত বলে, শুধু নিজের আনন্দে– এঁরা নাগরিক বিজ্ঞানী, নাগরিক সাংবাদিক,নাগরিক ইতিহাসবিদ এমনি সবাই দেশে দেশে। তাঁরা সাধারণ নাগরিক, নিজের চেষ্টায় শিখে নিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে এসবের চর্চা করেছেন, আমি নিজেকে তাঁদেরই একজন হিসেবে ভাবতে ভালোবেসেছি সব সময় । স্কুলে থাকতে বাসায় নিজের ল্যাবোরেটরি, কলেজে শুরু করা বিজ্ঞান পত্রিকা, তারপর এক সময় বিজ্ঞান সংগঠন– সবকিছুকে সৌখিন, আনন্দের কাজ মনে করেছি, বছরের পর বছর, সারা জীবন। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বা বিশ্ব-পরিস্থিতির মত অন্য বিষয়েও নাক গলাবার কোন বিরাম ছিল না। দেশে দেশে সৌখিন নাগরিক ওই অবদানকারীদের অনেকে অবশ্য অবিশ্বাস্য রকমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। আমার প্রিয় বলেই এই সৌখিনতার সৌন্দর্যটি নানাভাবে এই ভাবনাগুলোতে এসেছে। বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে ওই আনন্দের, ওই স্বতস্ফূর্ততার সাজুয্যের প্রয়োজনীয়তাটি।

বহুদিন আগে আমার বিভিন্ন সময় লেখা কিছু প্রবন্ধকে একত্র করে একটি বই প্রকাশ করেছিলাম– নাম 'শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন'। মানুষ নিয়ে ঘুরে ফিরে আসা ভাবনাগুলোরও বিষয় একই ধরণের– শৈশব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব রকমের শিক্ষা কেমন হচ্ছে, কেমন হবে। দুনিয়ার সব শিশু যে এক জেনেটিক মহা-লটারিতে প্রায় একই রকম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে– সেই সম্ভাবনার বিকাশে বাকি সব কিছু কী প্রভাব রাখে? একেবারে শৈশবে এমনকি মায়ের গর্ভে? বিজ্ঞান যা বল্‌ছে তা শিক্ষা নিয়ে,

মায়ের সুরক্ষার গুরুত্ব নিয়ে, পরিবারের গুরুত্ব নিয়ে, আমাদের সব ভাবনা বদলে দিচ্ছে। শিক্ষার মধ্যেই আর্টস-সায়েন্সের কৃত্রিম বিভাজন যে দুই সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে তা এক দিন পাশ্চাত্যকে অনেক ভুগিয়েছে, এখনো আমাদেরকে ভোগাচ্ছে। বিশেষ করে সর্বক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণে আছেন যে কাণ্ডারিরা তাঁরা যেভাবে বিজ্ঞানকে শুধু বিশেষজ্ঞের বিষয় বলে মনে করেন যা তাঁদের নিজেদের না জানলেও চলবে, সেটি এখন আমাদের দেশে অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই দুই সংস্কৃতির বিড়ম্বনার কথাটি এই বইয়ে নানা ক্ষেত্রে বার বার এসেছে, শিক্ষাকে চতুর্মুখী করার প্রয়োজনীয়তাটিও। আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানেই হলো বিশ্বদৃষ্টি অর্জন– অর্থাৎ আজকের ও চিরন্তন বিশ্বের উপলব্ধিটি নিজের মধ্যে এনে নিজকে সেখানে স্থাপন করতে পারা, নেহাৎ স্কুলের মত আরও কিছু বিদ্যা শেখা নয়। এই বিশ্বদৃষ্টি অর্জন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কতখানি আগে হয়েছে, কতখানি এখন হচ্ছে? আর সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও কতটুকু হচ্ছে? এটি এবং অন্যান্য দর্শন আমার জন্য নেহাৎ তাত্ত্বিক কথা নয়, বরং দেখে দেখে ঠেকে ঠেকে যা মনে হয়েছে তারই চিন্তার ছবি।

১৯৯২ সালে ব্রাজিল ধরিত্রী সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র বিলোপের বিষয়গুলো চিন্তায় ভালোভাবেই যোগ হয়েছিল, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায় আমার কাজে নবায়নযোগ্য শক্তির বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়াতে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত আর একটি বিষয়কে যোগ করতে আমি বরাবর ভালোবেসেছি– তা হলো সব মানুষের মস্তিষ্কে থাকা একটি অন্তর্নিহিত জীবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম। মানুষ যখন আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে প্রথম মানুষ হয়ে উঠছিলো সেটি ওখানকারই এক রকম জেনেটিক স্মৃতি। কিছুদিন আগে গ্লাসগোতে কপ-২৬ এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচলগুলো যখন সবার বিশ্লেষণে জানছিলাম তখন ওই স্মৃতির চিন্তাটি আশাটাকেই মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল। এই জীবপ্রেমটি আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, এটি নিরাশ করতে পারে না। এ নিয়ে গ্লাসগোতে এবং তারও আগে দুনিয়ার দেশে দেশে কিশোর-কিশোরী-তরুণ-তরুণীদেরকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার খবরে আরেকবার চিন্তা করতে শিখেছি ওদের যে ভবিষ্যৎ পৃথিবী তার অনুধাবন ওদের সবার কাছেই এক; আসলে সব মানুষের এই অনুধাবন এক। তাই এত সহজে একটি কাজ, একটি আন্দোলন তাদেরকে একই মিছিলে আনতে পেরেছে।

এই প্রজন্মের মিছিলে জায়গা না হলেও আমিও সৌভাগ্যক্রমে কিছুটা

বাল্যকাল থেকেই দেশ-বিদেশের অনেক বন্ধু পেয়েছি– দেখেছি যাদেরই মনের কিছু কাছে যেতে পেরেছি, মনে হয়েছে যেন আমরা একই গ্রামের মানুষ। বাইরে থেকে যে রকম মনে হয় বিশ্বের এদিক আর ওদিকের মানুষের আকাশ পাতাল তফাৎ তা কিন্তু মোটেই নয়। দেশে দেশে ঐক্যমত্য সৃষ্টির জন্য কূটনীতিবিদদের টেবিলে বসে যে সমঝোতার চেষ্টা তার থেকে অনেক বেশি কার্যকর এই যে মানুষের কূটনীতি। আসলে কূটনীতিই নয়, স্রেফ মানুষে মানুষে হৃদয়ের বন্ধুত্ব– যা সবচেয়ে ভালো হয় এক সঙ্গে বড় লক্ষ্যের কাজ করতে গিয়ে। ওই কাজ ও লক্ষ্য, আরও বেশি সবার সম্মিলিত কিছু মূল্যবোধ, তাদেরকে বিশ্ব-ঐক্যে আনতে পারে। এই বিশ্ব-ঐক্য গড়াটির প্রয়োজনীয়তা হালকাভাবে নেবার সুযোগ নেই। মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এই কথা বিশেষভাবে মাথায় আসছে আজ এমন একটি সময়ে যখন এ ছাড়া মানব জাতির কোন গতি নেই বলেই মনে হচ্ছে।

কোভিড বিশ্বমারি যখন দুইটি বছর সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশকে কাবু করে রেখেছে, মারণ যজ্ঞ চালিয়েছে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক জায়গায়, তখন বিশ্ব-ঐক্য ছাড়া বাঁচার উপায় কী? কেউ বলবে না কোভিডই শেষ ভাইরাস। তাহলে আমরা সবাই আবার কবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো, কীভাবে? অন্যদিকে বিজ্ঞান বলছে এখনই ভূ-উত্তাপের রাশ পুরোপুরি টেনে না ধরতে পারলে এটি পাগলা-ঘোড়ার মত আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে তখন আমাদের একমাত্র পৃথিবীটাকে রক্ষার তেমন কোন উপায় আর থাকবে না।আবার নীরবে এসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক উভয়-সংকটে ফেলে দিচ্ছে এখনই। সে কারখানার শ্রমিক থেকে বিমানের পাইলট, ডাক্তার এবং অফিস-আদালতেরও সব কাজ নিজের হাতে নিয়ে ফেলে দারুণ নিখুঁতভাবে করতে পারছে। এটি কী অতীতের অনেক দুঃখকষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্ত করে প্রথমবারের মত মানুষ মাত্রকেই জীবন উপভোগ করতে দেবে, নাকি মানুষের কাজ কেড়ে নিয়ে আর্থ-সামাজিক এক চরম সংকট সৃষ্টি করবে? এই সব ব্যাপারগুলো মাথার উপর যখন খাঁড়ার মতো ঝুলছে, আলাদাভাবে কারো মুক্তির উপায় নেই। সবাই বাঁচলে তবে আমিও বাঁচবো–এটি এখন স্পষ্ট। এই বাঁচার একটিই পথ– বিশ্ব-ঐক্য। ঐক্যটির যে এক রকম ব্যবস্থা এখন জাতিসংঘ করে রেখেছে তা দিয়ে সব সমাধান অন্তত এই ধরণের সংকটে হবার নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় সবার বাঁচাটি নির্ভর করে কারো কারো ইচ্ছা বা দয়ার ওপরে– সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে নেবার, একই মূল্যবোধে চলার, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। দেশে দেশে

সেই সংহতিও নেই, একই গণতান্ত্রিকভাবে বিশ্বের সব মানুষের কণ্ঠটি শোনার ব্যবস্থাও নেই। একটি নতুন ব্যবস্থার চিন্তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদাহরণটি দেখিয়ে দেয় তার সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। ইউরোপ যা পেরেছে বিশ্ব তা পারবেনা কেন, বিশেষ করে তার যখন বাঁচার জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই?

মানুষই এই বইয়ের সব চিন্তার কেন্দ্রীয় চরিত্র– সবকিছুর মূল প্রতিপাদ্য হলো মানব-উদযাপন। অতীতে চরম বৈষম্য আমরা দেখেছি, আজ কেউ সেগুলো দেখতে চায়না– বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, চরম ধন বৈষম্য, কোনটাই নয়। বিজ্ঞান ও সাধারণ মানবিকতা বোধকে আশ্রয় করে এক-বিশ্ব এক-মানুষের লক্ষ্যকে অর্জন করার চিন্তাটাই এখন মুখ্য। তার যেটুকু আমার চিন্তায়ও ধরা পড়েছে তা নিয়েই এই বই।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারি ২০২২

সূচি

কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মানুষ / ১৩
দুই সংস্কৃতি / ২৮
শিশুর নাম সম্ভাবনা / ৪৮
বিশ্বদৃষ্টির বিদ্যালয় / ৭৯
সৌখিনতার সৌন্দর্য / ১০৯
সাভানার স্মৃতি / ১৩৭
পরকে করিলে ভাই / ১৬৬
মানুষনীতি / ১৯৯
বিশ্ব ইউনিয়ন / ২২১
মানুষের ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ / ২৫১

কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মানুষ

মানব-উদযাপন

মাঝে মাঝে নিজের জীবনস্মৃতির আগে-পরের নানা অংশে ফিরে গেলে একটি সুখ-চিন্তা মূলসুরের মত বার বার খুঁজে পাই। যতভাবেই দেখি তাতে যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ঘুরেফিরে আসে– সে একজন মানুষ, শিশু-বুড়ো-দেশি-বিদেশি যে রকমই হোক। তার নানা সমস্যা নিয়েই সে চিন্তায় আসে বটে, কিন্তু শেষ অবধি তার জয় হয়। এজন্যই একে সুখ-চিন্তা বলছি– এ যেন এক মানব-উদযাপন। যখন অভিজ্ঞতায় যা এসেছে, অথবা যা শুনেছি বা পড়েছি সেই অনুযায়ী চিন্তাটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়েছে, যার সবই অবশ্য সেই মানুষ নিয়েই। বিষয়ান্তরে যাওয়ার সময়গুলো বা কারণগুলোও বেশ মজার। নিজের জীবনে, নিজের কাজে, অথবা বাইরের পরিস্থিতিতে ঠেকে ঠেকে এগুলো এসেছে; আমার বিশ্বাস সবার ক্ষেত্রেই এভাবে আসে। আমাদের যত দ্বিধা, যত আকাঙ্খা এসবতো শেষ অবধি মানুষকে জড়িয়েই হবার কথা; অনুভূতিতে ও আনন্দে এই মানব-উদযাপনটি নিশ্চয়ই সবার মনে মনে আছে। তাই ওই চিন্তাগুলো ভাগ করে নেবার ইচ্ছে থেকেই এই বইয়ের জন্ম– 'মানুষ আমরা', যা কিনা আমাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'হোমো সেপিয়েন্সের' প্রকারান্তর।

প্রজেক্ট জিনিসটি আমার খুব পরিচিত ছোটবেলা থেকে একটির পর একটি প্রজেক্ট করে যাচ্ছি আপন আনন্দে। বিশেষ করে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে গত চল্লিশ বছরে একটানা প্রজেক্টের পর প্রজেক্ট করে গেছি অনেক সহকর্মীর সঙ্গে– মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা, লাগসই প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, কিশোরী ক্ষমতায়ন, শিক্ষার জগতকে কাজের জগতের সঙ্গে মেলানো, আরও কত কী। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় বিভিন্ন রকমের কিছু প্রজেক্ট মানুষের ওপর কেন্দ্রীভূত হয় একই নামে এসে প্রায়ই আমাকে অভিভূত করেছে; ওই সাধারণ নামটি হলো হিউম্যান প্রজেক্ট, কোন না কোনোভাবে যা মানুষের অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রজেক্ট। ভালো লাগার কারণ হলো কাজগুলো বিচিত্র রকমের

হলেও এর সব ক'টাতে চেষ্টা রয়েছে মানুষকেই সত্য করে তুলতে, যত সাংঘাতিক সমস্যাই থাকুক, মানবতাকে যেন সেখানে হারতে না হয়।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে এই নামের একটি প্রজেক্ট বেশ খ্যাতি পেয়েছিলো। ওসময় এ নগরের প্রচুর মানুষের মধ্যে দারিদ্র, অপরাধ-প্রবণতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সবাইকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিলো। বিশেষজ্ঞরা বোঝতে চাচ্ছিলেন এখানে কীসের থেকে কী হচ্ছে। এজন্য এই জনগোষ্ঠির দেহ ও মনের অনেকগুলো উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা হয়েছিলো। অনেকগুলো সম্পর্ক বিজ্ঞানের দিক থেকে এসেছে, আবার বেশ কিছু সম্পর্ককে বিভিন্ন মানববিদ্যার আলোকে দেখতে হয়। এভাবে বাস্তব তথ্য থেকে কম্পিউটারে যে গাণিতিক মডেল গড়া হয়েছে তাই আবার কিছু কিছু বাস্তব সমস্যার সমাধান দেখিয়ে দিতে পারছিলো। ওই উপাদানগুলোর কোন জায়গায় হাত দিতে পারলে ওই ভুক্তভোগীদের মননে ও আচরণে ভালো পরিবর্তন আসতে পারে তা মডেলই বলে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সবার জন্যই ওখানে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে আছে। কিন্তু এই পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই শিক্ষা কতখানি কাজ করছে? এটি কি দারিদ্র কমাতে পারছে, আচরণকে যৌক্তিক করতে পারছে; নাকি শিক্ষার ভেতরেই গলদ রয়েছে? এমনি নানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এক একটি বড় বড় মানবিক ছবি ফুটে উঠেছে যেখানে হাত লাগাবার অনেক জায়গা স্পষ্ট হয়েছে। একে একে নানা বিষয়ে অন্তত ওই নগরের বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ওভাবে হাত লাগাবার চেষ্টাও হয়েছে। যেমন শিক্ষাকে ওই কিশোর-কিশোরীদের জন্য যথাযথ ও অন্তরঙ্গ করে তুলে তাদের তারুণ্যের উচ্ছাসটি নতুন খাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ওই অর্থেই এটি হিউম্যান প্রজেক্ট - জাতি-বর্ণ-অতীত নির্বিশেষে সবাইকে মানবতার স্বাভাবিক সুন্দর প্রেরণাগুলোর মধ্যে নিয়ে আসা।

আরেকটি হিউম্যান প্রজেক্টের সন্ধান পেয়েছি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে টেলিভিশন তথ্য-চলচ্চিত্র সিরিয়াল হিসেবে। এর প্রতিটি পর্ব গল্পচ্ছলে নিয়ে গেছে শুধু একটি প্রশ্নেই – মানুষ হবার মানে কী। পদে পদে নানা সমস্যায় জড়ালেও ওতে সবকিছুর মধ্যে মানুষের জেতার সম্ভাবনাটি বড় হয়ে ওঠে; ওটাই যেন খুবই স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, যা বড়ই তৃপ্তিকর ও আশাবাদী। নানা দেশের বিচিত্র রকম মানুষের জীবন থেকে প্রশ্নটি এলেও এটি যেন প্রত্যেক দর্শককে নিজের জীবনের দিকে তাকাতে বাধ্য করে। এর কারণ প্রত্যেকে বোঝতে পারে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ভালোবাসা, নৈতিক

মূল্যবোধ, প্রকৃতি-পরিবেশে আবিষ্কারের নেশা ইত্যাদি মৌলিক মানবিক উপাদান অনেক কিছুর সমাধান করে দিতে পারে। ওই সব বিচিত্র সত্যিকার মানুষদের কারো জীবনে ওই মানবিক প্রেরণাগুলো এসেছে জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে, কারো ক্ষেত্রে বাইরের নানা প্রভাবে– যেমন লেখাপড়ার মাধ্যমে সাহিত্য-শিল্পের মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, অথবা কারো ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রকৃতি-পাঠের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে। মানুষের শত বৈচিত্রের মধ্যে মূল-প্রেরণাগুলো একই রকম, সব একই মানবিকতা সৃষ্টি করে। সব রকম সমাজ থেকে এসে এই একই উপলব্ধিতে আসা এই তথ্য-চলচ্চিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট।

এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হিউম্যান প্রজেক্ট। কিন্তু দুনিয়া কাঁপানো অতি উচ্চাকাঙ্খী মানব প্রকল্পটি এসেছে বিজ্ঞানের এক বিরাট জয়জয়কার হিসেবে। সেটি হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট– এক ভাবে দেখলে এ একাই যেন সব কিছু ফয়সালা করে দিতে চাইছে, মানুষের জেনোম অর্থাৎ তার জিন-সমগ্রকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করে দিয়ে। আমাদের প্রতিটি কোষে কোষে যে ডিএনএ আছে তাতেই 'জিন' রূপে নিহিত আছে সকল মানবিক প্রেরণাসহ জীবনের পুরো নীলনক্সা। দেহ-মনের এক একটি দিক এক বা একাধিক জিনের ভাষায় সেখানে লেখা। মানুষের পুরো ডিএনএ পড়ে ফেলার মাধ্যমে জিনগুলো উদ্ঘাটন এবং তাদের কোন্‌টির কী কাজ তা নির্ণয়ই হলো এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। উদ্ঘাটনের কাজটি ২০০০ সালের মধ্যেই হয়ে গেছে, মোট যে ৫০ হাজারের মত জিন মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে তার অনেকগুলোর কাজ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু সে খোঁজারপর্বও কিছুটা হয়ে গেছে, আরও কিছু বাকি। অর্থাৎ একেবারে তার কোষের মধ্যে ঢুকে মানুষকে– সব মানুষকে এক করে, আবার আলাদা এক একজন মানুষকেও– চিনে ফেলার কাজটি প্রায় সম্পন্ন হতে চলেছে। মানব উদযাপনে উৎসাহী সবার কাছে এর থেকে উচ্ছাসের বিষয় আর কী হতে পারে?

মানুষে মানুষে মৌলিক যদি কোন পার্থক্য থাকে তা এখান থেকেই ধরা পড়ার কথা। কারণ হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট প্রথমে নানা জাতি-গোষ্ঠির মানুষের ডিএনএ নমুনা নিয়ে একটি গড়পড়তা মডেল-মানুষের জিন-বৈশিষ্টগুলো উদ্ঘাটন করেছে, তারপর আবার দেশে দেশে নানা বৈচিত্রের সত্যিকার আলাদা আলাদা মানুষের ক্ষেত্রেও তাই করেছে। খবর যা এসেছে তা ওই কথাটিকেই একেবারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে– আমাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র যে মানুষ সে আসলে এক ও অভিন্ন মানুষ; তাকে যেই দেশ, যেই

জাতি, যেই পরিস্থিতি থেকেই খুঁজে আনা হোক না কেন। অবশ্য একজনের সঙ্গে অন্যজনের সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, কিন্তু সেগুলো মৌলিক কিছু নয়। নানা জনগোষ্ঠি নিলে তাদের দেহাবয়ব ইত্যাদির এরকম কিছু বাহ্যিক বৈচিত্র থাকে বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মতর জিনিস বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার যে কোন জায়গার যে কোন জনগোষ্ঠি নিলে তাদের মধ্যে ওগুলো ঠিক একইভাবে বণ্টিত আছে। যে কোন একটি গুণ নিলে তার মাঝারি মানই জনসংখ্যায় বেশি, খুব উচ্চমান কম, আবার খুব নিম্নও কম। সব জায়গার মাঝারিরা একই মাত্রার মাঝারি, তেমনি উচ্চ ও নিম্ন একই মাত্রায় উচ্চ বা নিম্ন। কাজেই দুনিয়া কাঁপানো ওই বিরাট বৈজ্ঞানিক কাজটি বলে দিচ্ছে মানুষের ঐক্যের কথা। আমি যে সব ছোট ছোট কাজের সঙ্গে অনেক দিন ধরে জড়িয়ে আছি তার কুশীলবরা প্রতিদিন নিজেদের জীবনে এটিই প্রমাণ করছিলো– সুবিধা-বঞ্চিত ছেলেমেয়ে হয়েও তাদের মধ্যে মানুষের শত ভাগ সম্ভাবনাই সুপ্ত রয়েছে ওই একই জিন-বণ্টনের কারণে। যে কোন দেশের যে কোন ছেলেমেয়ের পাশে সে সম্পূর্ণ সক্ষমতা নিয়েই দাঁড়াতে পারে। সবার একটিই পরিচয়– মানুষ আমরা, যেটি মানুষ প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নামের হেরফেরও বটে; হোমো সেপিয়েন্স, 'আমরা জ্ঞানী'; আমাদের মত বুদ্ধিমান মানুষ অর্থেই জ্ঞানী, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে সেই 'আমরা মানুষ'।

ঐতিহাসিক বৈষম্য এখনো

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট যে একেবারে নতুন কথা বলেছে তা কিন্তু নয়– তবে প্রতিটি দেহকোষের আণবিক অভ্যন্তরে দেখে বলছে বলেই তার গুরুত্ব বেশি। দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা দুনিয়ার যে কোন জায়গার মানুষের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, আবেগ, আচরণ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে লক্ষ্য করে আসছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন যে একজন মানুষকে দেখেছি তো দুনিয়ার সব মানুষকেই দেখেছি। অল্প পর্যবেক্ষণে তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে মৌলিক স্তরের যে ব্যতিক্রমগুলোর কথা অতীতে ভ্রমণকারীরা বা এমনকি কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ ভাসা ভাসা বলে এসেছেন সেগুলো পরে ধোপে টেকেনি। নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির বাহ্যিক রীতিনীতিতে পার্থক্য অবশ্যই আছে; কিন্তু মৌলিক আচরণে ও সক্ষমতায় তা মোটেই নেই।

আমি এক দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে স্কুলে থাকতেই স্কাউটিঙের সুবাদে নানা দেশের ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হবার, এমনকি বন্ধুত্ব করার সুযোগ পেয়েছি, এবং পরেও অন্যভাবে নানা সংস্কৃতির কাছে যাবার সুযোগ

পেয়েছি। আমাদের দেশের জাতীয় জাম্বুরী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলে বহুদূরের বহু রকম স্কাউটের এক রকম মেহমানদারি করার সুযোগ পেয়েছি; আবার ফিলিপাইনে বিশ্বজাম্বুরী ও জাপানের জাতীয় জাম্বুরীতে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী দলে থাকায় বেশ কিছুদিন বার্মা, ফিলিপাইন ও জাপানে কাটিয়েছি ও সেখানে অন্য বহুদেশ থেকে আসা কিশোর ও তরুণদের সংস্পর্শে এসেছি। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব হয়েছে, অনেকের ক্যাম্পে গিয়ে নিয়মিত আড্ডা দিয়েছি; কখনো অনুভব করিনি ওদের চিন্তাধারা আমার স্কুলের বন্ধুদের থেকে কোন দিক থেকে একটুকুও ভিন্ন। হ্যাঁ, কখনো কখনো ভাষা বুঝতে না পেরে, বুঝাতে না পেরে আমার জাপানি বন্ধুদের কাউকে কাউকে লাজুক হবার ভাণ করতে হয়েছে, আমাকেও তা করতে হয়েছে! অথচ আমরা কেউ আসলে লাজুক ছিলাম না। ঠিক তেমনি বহুদিন পর আমাদের বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কাজ করতে গিয়ে গ্রামের সুবিধা-বঞ্চিত কিশোরীদেরকে প্রথম যখন দেখেছি তখন তারা নিজেদের জন্য কিছুই বলতে পারছিলো না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সেটি বক্তব্য না থাকার কারণে নয়, তার মধ্যে সক্ষমতা কিছু কম আছে বলে নয়; স্রেফ সুবিধা-বঞ্চনার কারণে। দুদিন যেতে না যেতেই দেখেছি তার সঙ্গে এতদিন ধরে আমার দুনিয়া-জোড়া দেখা যে কোন কিশোরী বা কিশোরের কোন পার্থক্য নেই– কৈশোরের সব সক্ষমতা তার মধ্যেও একই ভাবে আছে– শুধু বাধা দিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র।

কিন্তু দেশ-বিদেশের এমন কিছু কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি যাদের মধ্যে খুব ব্যথা ভরে লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা সব মানুষকে এক রকম বলে মনে করেন না। কারো মধ্যে যদি কোন ঘাট্‌তি লক্ষ্য করেন– সেটি দেখতে তাঁদের মতো না হওয়ার ঘাটতি, তাঁদের ভাষা বলতে না পারার ঘাটতি, তাঁদের মত সম্পদশালী না হওয়ার ঘাটতি যাই হোক – সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত হবে ওদের গোষ্ঠিটার মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন কিছুর অভাব আছে, ওরা তাঁদেরমত সমান মানুষ নয়, কিছুটা কম। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এ ধরণের চিন্তার উৎস ঐতিহাসিক– যখন একদল মানুষ হয়ে ওঠেছিল ক্ষমতাশালী, উপনিবেশ স্থাপনকারী, হামলার মাধ্যমে দাস সংগ্রহকারী এবং দাসের মালিক, এবং রাজা; আরেকদল মানুষকে তারা পরিণত করেছিলো উপনিবেশের নেটিভ দেশি গোষ্ঠিতে, ক্ষেত্র বিশেষ দাসে, এবং প্রজাতে। একবার তা করার পর এই পার্থক্যটি প্রথম দলের মাথায় স্থায়ী হয়ে বসে গিয়েছিলো এবং দুনিয়া বদলে গেলেও তাদের অনেকে ওই ধারণা হারায়নি। ওরা আবার তখনই তাদের উপনিবেশের

মধ্যে নানা রকম স্তরের সৃষ্টি করেছিলো। তাদেরো ওপরের স্তরগুলো তার একটু নিচের স্তরের মানুষের প্রতি ঠিক উপনিবেশ স্থাপনকারীর মতই আচরণ করেছে। যাবতীয় বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা, এমনকি হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট সত্ত্বেও তাদের এই মাথায় ঢুকে যাওয়া ধারণায় সহজে পরিবর্তন আসেনি। এগুলোই এখন কখনো জাতি বৈষম্য, কখনো বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, হোয়াইট সুপ্রিমেসি (সাদাদের প্রাধান্য) হিসেবে অনেকের মনের ভেতর রয়েছে, আবার অনেকের মধ্যে খুব বিশ্রীভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এখনো যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে অনেক নির্দোষ কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতিত হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, তারা কৃষ্ণাঙ্গ মাত্রকেই অপরাধী বলে সন্দেহ করে বলে। এর বিরুদ্ধে সেখানে শুরু হওয়া 'ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার' আন্দোলনও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে প্রত্যেকটি খেলার আগে সব দেশের ক্রিকেটাররা হাঁটু গেড়ে কিছুক্ষণ বসে এর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন।

আজকাল অবশ্য ওই বৈষম্যের শব্দগুলো সরাসরি উচ্চারিত হয় না। এর বিরুদ্ধে আইন করা আছে, কেউ প্রকাশ্যে ওসব শব্দ ব্যবহার করলে বা বৈষম্যমূলক আচরণ করলে তাকে তিরস্কার করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে ওগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই– বৈষম্য বেশ প্রকাশ্যেই চলছে অসংখ্য মানুষের মধ্যে; তা ভুক্তভোগী যে কারো চোখে পড়তে বাধ্য। দুনিয়ার নানা দেশের অনেকের সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই মিশতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে এটি আমারো অভিজ্ঞতার বাইরে কখনো ছিল না। অত্যন্ত বন্ধুসুলভ মানুষের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে এর উপস্থিতি টের না পেয়ে উপায় ছিল না, তাদের নিজেদেরকে জন্মগতভাবেই একটু শ্রেষ্ঠতর ও বড় ভাই গোছের মনে করাটি। বৈজ্ঞানিকভাবে অসার প্রমাণিত এবং নীতিগতভাবেও পরিতাজ্য এই বৈষম্য কেন এখনো মানুষের মাথায় ভর করে আছে, কেন এগুলো কাজ করে চলেছে, এর একটি সহজ উত্তর হলো ঐতিহাসিকভাবে পেয়ে আসা সুবিধাগুলো অনেকে ছাড়তে চাচ্ছে না। সুবিধা আরও সুবিধা সৃষ্টি করে। এই যে বৈষম্যের ভুক্তভোগীদের অধিকাংশরা বরাবর সুবিধা-বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে তার কারণও ওখানেই। অন্যরা সুবিধার জায়গা থেকে শুরু করে এদেরকে সহজে তার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে; এমনকি শেষোক্তরা বুঝতেও পারেনা যে কীভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আগের থেকে পেয়ে আসা সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখতে পারলে জন্মগতভাবেই তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে থাকে, নতুন উঠে আসা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়না ওই সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য। কর্তৃত্বে থাকা সবাই মিলে

ধরে নিতে পারে যে ওদের নিজেদের সক্ষমতা অন্তর্নিহিতভাবেই বেশি। উপনিবেশবাদ চলে গিয়ে তার জায়গায় নব্য উপনিবেশবাদ চাপানো হয়েছে। এটি আরও ভয়ঙ্কর, কারণ এটি টের পাওয়া যায় না। মনে হয় যৌক্তিকভাবে, বাণিজ্যের নিয়মানুযায়ীই এটিএসেছে– তাই এর প্রতিবাদ করাও কঠিন। পুরুষতন্ত্র, ক্ষমতাতন্ত্র, দাতাতন্ত্র ইত্যাদিও আজকাল ঠিক একইভাবে কাজ করে। বাণিজ্যের নিয়মে বুঝিয়ে দেয়া হয় কেন এর মধ্যে কোন বৈষম্য কাজ করছে না, সব কিছু নিয়ম মাফিকই হচ্ছে। বৈষম্যের কথাতো মুখে আনাই পাপ। এভাবেই আগের বৈষম্য পরের নীরব বৈষম্য সৃষ্টিতে সুবিধা করে দিচ্ছে।

ওই ঐতিহাসিক উপনিবেশবাদী ধারণা আজো কেন মাথায় ভর করছে তার আরও একটি উত্তর আছে মনে হয় আমার কাছে। লক্ষ্য করেছি বিদেশের কিন্ডারগার্টেনে বা স্কুলে যেখানে নানা জাতিগোষ্ঠি, ধর্ম, বর্ণের ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করে সেখানে অন্তত শুরুর দিকে ওরা বাহ্যিক পার্থক্যগুলোকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে ওই আশরাফ আতরাফের ধারণাগুলো ওদের অনেকে পেতে থাকে উচ্চতর স্কুল-কলেজ শিক্ষা থেকে এবং বাড়িতে ও পাড়ায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে। সেখানে ধনী দেশের সমস্যাগুলোকে সূক্ষ্মভাবে আনা হয় আজকের 'অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের ফল হিসেবে', 'তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা' হিসেবে চাল-চুলোহীন সম্ভাবনাহীন 'মানব-সমুদ্রের' সৃষ্টি হিসেবে; ওদের অনেককে চিন্তায় ফেলে দেয় এরা তাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে কি না, দিচ্ছে কি না। এমনকি মনে মনে এমনো ভাবে যে ওই বিজাতীয়দের মধ্যে যারা তাদের মত দেখতে না হয়েও 'অবিশ্বাস্যভাবে' তাদের কাছাকাছি উন্নতি করে ফেল্‌ছে, সেই উন্নতির পেছনে নিশ্চয়ই কোন গোঁজামিল আছে, ওটি ফাঁকিবাজির উন্নতি– ওই গোঁজামিল, ওই ফাঁকি, বের করতে লেগে যাও। এটি বড় উন্নতদের কথা হলেও, যারা আবার নিজেদেরকে নব্য উন্নত হয়ে উঠেছে বলে মনে করে তাদের মধ্যেও নিচে থাকা অন্যদের প্রতি একই ধরণের হেয় করা ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। আজ ওই অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন কেন হতে হচ্ছে, ওই তৃতীয় বিশ্ব বা ওই চাল-চুলোহীন মানব মহাসমুদ্র কারা ওখানে গিয়ে সৃষ্টি করে এসেছিলো, এসবের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়াগুলো শিক্ষার মধ্যে তুলে না ধরে সূক্ষ্মভাবে বরং এমন ভাব দেয়া হয় যেন ওদের রক্তের মধ্যেই ওসব দোষ আছে।

অথচ উল্টো যদি মানব জেনোম প্রজেক্টের মত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ওই শিক্ষায় বড় করে তোলা হতো; যদি এক-মানুষ, এক-বিশ্ব

সৃষ্টির উপায় উপকরণগুলোকে সবার মাথায় আনা হতো; তৃতীয় বিশ্ব বা বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক নতুন উপনিবেশ হিসেবে নয়, একই সংগ্রামকারী মানুষ হিসেবে দুনিয়ার সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকতো; যদি 'সবাই বাঁচলে আমরা বাঁচবো' এই সহজ সত্যটি উচ্চারণের জন্য কোভিডের বা জলবায়ু পরিবর্তনের চরম অবস্থার জন্য অপেক্ষা না করা হতো; তা হলে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম বৈষম্যগুলোকে আমরা ইতিহাসেই রেখে আসতে পারতাম। এক-বিশ্ব সৃষ্টিতে বাধাগুলো কমে যেতো।

কিন্তু পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শুধু যে কোভিড বা জলবায়ু পরিবর্তন সেই বদলে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করছে তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধির মত অবশ্যম্ভাবীভাবে আসা অভিনব প্রযুক্তিও পৃথিবীকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এদের কোনটিই সুবিধাগুলো এত বড় সংখ্যক সুবিধাভোগীর হাতে আর থাকতে দেবেনা– ধীরে ধীরে প্রবণতাটি হবে ওই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের মত বিশাল পুঁজি যে গুটি কতেক মানুষের হাতে থাকবে সুবিধাগুলোও সব তাদের হাতে চলে যাওয়ার। বিশ্বের বাকি সব মানুষকে শেষ পর্যন্ত এক কাতারে এসে গিয়ে ওই গুটি কতেকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হবে; যদি সেই প্রবণতাকে না থামাতে পারি। আগে যখন বিশ্ব পরিস্থিতিতে কারো জন্য পৌষ মাস কারো সর্বনাশের কথা উঠ্‌তো, তখন পৌষ মাসটি হতো বেশ অনেক সংখ্যক মানুষের– উন্নত বিশ্বের প্রায় সবারই। কোভিড দেখিয়েছে কোভিড মহামারী যদি কারো জন্য পৌষ মাস এনে দিয়ে থাকে তবে তাদের সংখ্যা খুবই অল্প–মহা ধনশালী অল্প কিছু বাণিজ্যের মানুষ। বাকিদের সবার জন্য শুধু সর্বনাশ নয়, জীবন সংহারকারী সর্বনাশ; যার থেকে ছোট বড় কেউই রক্ষা পায়নি, পাচ্ছে না। এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে পৌষ মাসের মানুষ আরও হাতে গোণা হয়ে যাবে, বাকিদেরকে সম্মুখীন হতে পারে মহাসর্বনাশের। কিন্তু সবকিছু যদি এক-বিশ্ব হিসেবে মোকাবেলা করা যায় তা হলে হয়তো সর্বনাশের কথা উঠবেইনা; বরং ওই প্রযুক্তি দিয়েই সবার জন্যই চির পৌষ মাসের ব্যবস্থা হতে পারে। মানব-উদযাপনটি তাই এখন বৈশ্বিকভাবে একই উদযাপন হতে পারে; জাতি-ভেদের সূক্ষ্মতম অভিমানের সুযোগও এখানে নেই।

'নহি তো মেষ'
আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

এক শ' বছরেরও কিছু সময় আগে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় তাঁর সেই অমর গানে বাঙালীর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্পের কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করিয়েছেন– মানুষের আচরণ মেষের মত হতে পারে না।

মেষ ঝাঁকে চলে। তাদের মধ্যে কেউ যদি ঝাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বাকি সবাই এক যোগে তাকেই অনুসরণ করে; সে বামে গেলে বামে যায়, ডানে গেলে ডানে যায়। সেই সামনে দাঁড়ানো দিগপ্রদর্শক যদি মেষ না হয়ে একটি কুকুরও হয় তা হলেও তারা তাকে অনুসরণ করে। মেষ-চরানো কুকুর এ কারণেই সহজে নিজের বাহাদুরি দেখাতে পারে। মানুষের মধ্যে এই ঝাঁকে চলার প্রবণতাটি থাকার কথা নয়। তবুও প্রায়ই এটি আরোপিত হয়ে দেখা দেয় বলেই দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সতর্কবাণী। এই যে আজকের দিনে এসেও যে নিজেকে কারো কারোদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবৃত্তি, এটি কিন্তু একা একা হয়নি, এটিও ঝাঁক থেকে এসেছে। ঝাঁকের একটি ব্যাপার আছে বলেই যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট সুপ্রিমেসির সমর্থকরা সারা দেশেই ছড়িয়ে থাকলেও দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে এবং বর্তমান রিপাবলিকান দলের প্রাধান্যে থাকা আরও কিছু রাজ্যে বহুল বিস্তৃত হয়ে আছে এবং ছিল– সেই দাস প্রথার আমল থেকেই। সাধারণত ব্যাপারটি চোখে পড়ার মত অবস্থায় থাকতো না, রাজনীতির নানা সময়ের নানা কিছু এসে তাকে কিছুটা আড়াল করে রাখতো। কিন্তু একজন ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে ঝাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়াতে সব বদলে গিয়েছে; তখন থেকে ওরা সবাই মিলে তাঁকে অনুসরণ করেছে– বামে, ডানে যখন তিনি যেদিকে দেখিয়েছেন। সাধারণত প্রকাশ্যে কেউ নিজেকে বর্ণবাদী অথবা হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট বলতে চায় না, কিন্তু নেতা যখন ঝাঁককে ওদিকে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন ওদের মধ্যেও অনেক ভালো মানুষ আছে, তখন আর সেই চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন হয় না। এমনকি রিপাবলিকান পার্টির বাঘা বাঘা এবং বিচক্ষণ সব নেতাও, যাঁরা মানবতাবাদী বলে খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁরাও সুড় সুড় করে এই মেষের ঝাঁকে যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনের আইন কানুন হঠাৎ ভুলে গিয়ে তাঁরাও নেতাকে অনুসরণ করে সুর মিলিয়েছেন– ওটি সঠিক নির্বাচন হয়নি, একে আরও বিশ্লেষণ করতে হবে, আমাদের পক্ষের রাজ্যগুলোকে বাধ্য করতে হবে যাতে তাঁরা ট্রাম্পের হারকে হার বলে ঘোষণা না দেন। ঝাঁকের আচরণটি এতই সংক্রামক যে ট্রাম্প যখন নিজেই বিজ্ঞানী সেজে বলেন ওই ওষুধটা করোনার দমনে এমন মহৌষধ যে তিনি ওটি এমনি এমনি খান, তখন সবাই তাঁর সঙ্গে এমনি এমনি খায়। তিনি যখন বলেন মাস্ক পরা ভীরু মানুষের কাজ, তখন তারাও সবাই বড়

জনসমাবেশে মাস্ক ছাড়া গিয়ে বীরত্ব দেখায়।

মেষতন্ত্র মোটেও যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়– যদিও সেখানে অসংখ্য মানুষ কেন সমাজতন্ত্র শব্দটা মুখে নেয়াও পাপ মনে করে, গরিবের চিকিৎসার জন্য সরকারি ব্যবস্থাকে বেআইনি মনে করে, কিংবা ইচ্ছে মত অস্ত্র কেনার ও বহন করার অধিকারকে দুই শ' বছর আগের সংশোধিত সংবিধানের দেয়া মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার মনে করে, তা বোঝা কঠিন। মেষতন্ত্র ছাড়া এর আর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রত্যেকটির কারণে অসংখ্য অসহায় মানুষের সীমাহীন দুর্গতি ঘটলেও, এবং অসংখ্য মানুষের নিত্য মৃত্যু ঘটলেও, তাতে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

দুনিয়ার অনেক দেশে মানুষকে মেষের ঝাঁকে পরিণত করতে বড় রকমে যুগিয়েছিল দুই পরাশক্তির শীতল যুদ্ধে, তার মধ্য দিয়েই আমার পুরো ছাত্রজীবন কেটেছে। প্রথম দিকে শীতল যুদ্ধের খুব ঝলোমলো অর্জনের দিকগুলোই আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিলো, অন্যদিকে তেমন মনোযোগ দেইনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন হঠাৎ করে মানুষের প্রথম কৃত্রিম চাঁদ স্পুটনিক আকাশে উৎক্ষেপন করলো আর আমরা নিয়মিতভাবে রেডিওতে তা আমাদেরকে অতিক্রম করার বীপ্ বীপ্ শব্দ পেলাম, তখন আমিও যেন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করেছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নকেই মনে হয়েছিলো বিজ্ঞানে শেষ কথা, তাছাড়া এটিই আমাদের মত পেছনে পড়া সব দেশের মানুষকে সাম্য আর আশার বাণী শোনাচ্ছিল। কিন্তু রেডিও আর পত্রিকার সঙ্গে লেগে থাকার কারণে পরে অন্য রকম খবরও জানতে পারছিলাম– এই সোভিয়েত তার নিজের নাগরিকদের ওপর ও তার জোটের ভেতরের দেশগুলোর ওপর কী রকম জবরদস্তি করছিলো সে সব খবর। যেখানেই মানুষ বিদ্রোহ করছিলো, সেখানেই সোভিয়েত সৈন্য আর ট্যাঙ্ক তাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করছিলো। ওই স্পুটনিক উৎক্ষেপণের কাছাকাছি সময়েই দুটি ঘটনা মনে খুব দাগ কেটেছিলো। একটি হলো হাঙ্গেরিতে মানুষের স্বতস্ফূর্ত সোভিয়েত বিরোধী বিদ্রোহ এবং সেটি দমন। আর একটি ঘটনা একই বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন প্রধান নেতা নিকিতা ক্রুশ্চভের নিজেরই তাঁর পূর্বসূরি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ। বহুদিনের একনায়ক স্টালিন নিজের দলের মানুষকে এবং যে কোন ভিন্ন মতাবলম্বীকে অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কীভাবে দাবিয়ে রেখেছিলেন তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা। সবখানে চেষ্টা করা হয়েছে মানুষকে ভেড়ার ঝাঁকে পরিণত করার; ওই চেষ্টা যে ক্রুশ্চেভের নিজের আমলে ও তারপরে খুব বেশি কমেছিলো তা বলা যাবে না, বড় জোর নিষ্ঠুরতা কিছু

কমেছিলো। এই সোভিয়েতের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য তার প্রতিপক্ষরা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দেশে দেশে একইভাবে মেষতন্ত্র কায়েম করেছিলো গণতন্ত্রের নাম দিয়ে। দক্ষিণ কোরিয়ার সীগম্যান রী, পার্ক চুংহী; দক্ষিণ ভিয়েতনামে নগো দিন দিয়েম; ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো প্রমুখরা পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে এই কারণেই খবরের শীর্ষে ছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত এক এক সময়ে এসে ওই সব দেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়ে এর অবসান ঘটিয়েছে।

একই অজুহাতে আমাদের নিজেদের দেশেও এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিলো তখন, এবং একই সঙ্গে অনুরূপ আরও নানা দেশের সঙ্গে জোট বাঁধতে প্রলুব্ধ করা হয়েছিলো– শীর্ষ-দেশগুলোর ইঙ্গিতে ঝাঁকে চলাটি যাতে আরও সম্পূর্ণ হয়। কম্যুনিস্ট উত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা চুক্তি তুরস্ক, ইরান, যুক্তরাজ্যকে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে গঠিত হয়েছিলো সেন্টো (সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন)। যুক্তরাজ্য ছাড়া এদের বাকিগুলোর চরিত্রে মেষতন্ত্রটি অত্যন্ত প্রবল ছিল– বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতিতে। এমনিভাবে আরও একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে পাকিস্তানকে জড়ানো হয়েছিলো সিয়াটো (সাউথ ইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অরগানাইজেশন) তাতে ঝাঁকের দেশ ছিল পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ও ফিলিপাইন– প্রত্যেকটিই ছিল তার জন্য উর্বর ক্ষেত্র; অন্য সদস্যরাযারা ঝাঁকের দিগপ্রদর্শক হিসেবে এই উর্বরতায় সহায়তা দিচ্ছিলো তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তখন বয়সে ছোট থাকলেও ছাত্র রাজনীতি ও দেশের রাজনীতিতে যা ঘটছিলো তা কাছে থেকে দেখেছি। যা দেশকে নিয়ে ঘটে চলেছিলো তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা দেখেছি, কিন্তু যাঁরা এ পক্ষের ও পক্ষের গোঁড়া সমর্থক ও সুবিধাভোগী তাঁদের মধ্যে কোন বিকার দেখিনি। তাঁরা নিজ নিজ পক্ষকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে গেছেন নিজেদের আন্তর্জাতিক ঝাঁকে শামিল থেকে। সেই যে মনোযোগ দিয়ে এমনি ঝাঁকের স্বার্থে মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার ঘটনাগুলো দেখে এসেছি তারপরও সেই একই ট্র্যাডিশন চলেছে বহু দেশে।

একটি জিনিস খুব মনে হয়েছে– এই এত রকম দেশে যে মেষতন্ত্র চলেছে এবং চলছে তা সব দেশ কিন্তু একইভাবে গ্রহণ করেনি। মানুষ মেষতন্ত্র পছন্দ করে না, তাই দীর্ঘদিন তারা একে সহ্য করেনি, ব্যাপারগুলো ধরে ফেলে তারা বরং নিজের বিবেককেই আবার অনুসরণ করতে পেরেছে। অনেক জায়গার মানুষই যখনই পেরেছে প্রবলভাবে বাধা দিয়ে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে যে মানুষ মেষ নয়– যেমন ভিয়েতনামের মানুষ, দক্ষিণ

আফ্রিকার মানুষ। কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় এমনকি ফ্রাঙ্কোর স্পেন বা সালাজারের পর্তুগালের মত উন্নত দেশেও দীর্ঘকাল মানুষ মেষতন্ত্র মেনে নেয়ায় আশংকা হয়েছে অধিকাংশ মানুষ যেন এর জন্য তৈরিই ছিল। যেন একটি অদ্ভুত আরাম বোধে আচ্ছন্ন হয়ে তারা সামনে থাকা যে কারো কাছ থেকে ডান-বামের নির্দেশনা নিয়েছে, তাকে অনুসরণ করেছে হয়তো সামান্য ঘাস-বিচালির আশায়। দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এই ভয়েই শংকিত ছিলেন। আর আধুনিককালে আমাদের আর এক কবি শামসুর রাহমান এ নিয়ে অনেকের নির্লিপ্ততায় এত অস্থির হয়েছেন যে যেন রসিকতার মত করে ওই আরামবোধকে হিংসেই করেছেন–

মেষ রে মেষ তুই আছিস বেশ
মনে চিন্তার নেই কো লেশ।
ডানে বললে ঘুরিস ডানে
বামে বললে বামে।
হাবেভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষ ধামে।

যে ঘড়ি ক্রমাগত ফাস্ট হচ্ছে

ঘড়িটি বাইরের কোন ঘড়ি নয়; একেবারেই নিজের মাথার ভেতর, নিজের বোধশক্তির ভেতরের ঘড়ি। কিন্তু আমার কাছে সময়ের বোধটি এটি দিয়েই নির্ধারিত হয়, হাতে বাঁধা বা টেবিলে রাখা ঘড়ি দিয়ে নয়। বাইরের ঘড়ির থেকে স্বাধীন অবস্থায় এরকম একটি ঘড়ি যে আমার মধ্যে গাঁথা আছে সেটি আবিষ্কার করেছি তাও বহুদিন হলো। লক্ষ্য করেছি বছর, মাস, সপ্তাহ এগুলো যেন ক্রমে আমার কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে; যতই সময় যাচ্ছে ততই এটি বেশি বেশি হচ্ছে। যেন আমার ভেতরের ঘড়িটি ক্রমেই ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে; আগে যতটা ফাস্ট হয়েছিলো পরে তার চেয়েও বেশি। বাইরের ঘড়িতে এক ঘণ্টা কাটলে আমার কাছে মনে হয় যেন মাত্র দশ মিনিট কাটলো। একটি পুরো সপ্তাহ ঘুরে আসার পর আমার কাছে মনে হয় আজ শুক্রবারের আগের শুক্রবার এসেছিলো যেন মাত্র গতকাল, সপ্তাহটি আমার জন্য হুশ করে শেষ হয়ে গিয়েছে। আরও বড় কথা আগেও এরকম হয়েছে, কিন্তু এতটা নয়– ক্রমাগত বাড়ছে ব্যাপারটি। গত কয়েকটি বছর যে গেছে খুব একটা টের পাইনি, এক সময় এক একটি বছরকে মনে হতো একটি পুরো জীবন, এখন আর তা নয়। ব্যাপারটি মন খারাপ হয়ে যাবার মতো। বুঝতে পারার পর প্রথম প্রথম ভাবতাম, একি শুধু আমারই হচ্ছে? না

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি এটি অনেকেই নিজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে। তা হোক, কিন্তু এর মানে কি সারাদিনে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছিনা যে কারণে দিনটি আমার কাছে খবর হচ্ছে না। সেটি ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সেই প্রথম প্রথম। কিন্তু হিসেব করে দেখেছি সে রকম কিছু মোটেই নয়। বরং করতে করতে আমার কাজের দক্ষতা বাড়াতে দিনের মধ্যে আগের থেকে অনেক বেশি কাজ করতে পারি। ব্যাপারটি এমন নয় যে দিনগুলো কাজে ভরপূর নয়, মনের মধ্যে অপূর্ণতা আছে, তাই মনের ঘড়ি শূন্যে লাফ দিয়ে ছুটছে। সময়ের সঙ্গে আমার বাঁধন ঢিলে হলেও কাজের সঙ্গে তা হয়নি।

কিন্তু তারপরও মন খারাপ হয়। কাজ শুধু করা তো বড় কথা নয়, সেই কাজগুলোর যদি আগের মত সময় নিয়ে চেখে চেখে স্বাদ নিতে না পারি তা হলে সেটিই তো অনেক কিছু হারানো। নিজের কাছে সপ্তাহ যদি হুশ করে শেষ হয়ে যায়, তা হলে সপ্তাহের অর্জনগুলোর স্বাদ নেবার সময় কোথায়? আর মানব-উদ্‌যাপন নিয়ে যে এত চিন্তা মাথায় ঘুরছে, মানুষকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে মনে মনে যে একীভূত বিশ্ব রচনা করে চলেছি প্রতি পর্যায়ে তাকে ভালো করে দেখার ফুরসত কোথায়, এর মধ্যে তো নতুন সপ্তাহ, নতুন কাজ এসে যাবে।

সাম্প্রতিককালে এসে যখন একেবারে ধারাবাহিকভাবে আত্মজীবনী লিখতে বসেছি, দেখলাম খুব ছোট বেলার স্মৃতিগুলোই ফুরোতে চাচ্ছে না, স্কুলে ভর্তি হবার আগের যে দু'তিনটি বছরের স্মৃতি মনে আছে তা লিখেই শেষ করতে পারছিলাম না, ওখানকার এক একটি বছর যেন সেই একটি পুরো জীবন– এত কিছু, সবই নতুন, সবই মনকে বিভোর করে রাখা। তার পরে পরেও এমনিভাবেই ভরাট সব স্মৃতি, খুঁটিনাটি সব বর্ণনা; স্কুল পর্ব শেষ করতে গিয়েই মোটা এক খণ্ড বই হয়ে গেলো, যেখান থেকে কিছুই বাদ দেবার মত নয়। তার পরের পরিণত বয়সের জীবনটির জন্য অবশ্য ওরকম আরেকটি খণ্ডই যথেষ্ট হয়েছে। সেই পরিণত বয়সের ভেতরেও আগের অংশ যেমন কাহিনিতে ভরপূর, পরের অংশ ততটা নয়। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এ সেই ঘড়ির দিন দিন ফাস্ট হতে থাকা। বহুকাল পরে লিখতে গিয়েও ওই বহু আগের ক্রমাগত ফাস্ট হওয়াটি ধরা পড়েছে। যখন সত্যি সত্যি ওই সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনো ব্যাপারটি এভাবেই হয়েছে, সব কিছু ক্রমাগত দ্রুততর হতে থেকেছে– লিখতে গিয়ে সেটিও টের পাচ্ছিলাম।আর এখনকার ঘড়ির ফাস্ট হওয়া– সেতো রীতিমত ঘোড়দৌড়ের মত!

ব্যাপারটির অস্থিত্ব বা কারণ সম্পর্কে কোথাও কোন লেখাজোকা দেখিনি। সাধারণভাবে মনে হয়েছে পরিণত বয়সে মানুষের অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন জিনিসের সংখ্যা কমে আসে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলো আগে এসেছে সেগুলোই বার বার আসতে থাকে। ফলে অভিনবত্বের অভাবে ওগুলো নিজের বোধের মধ্যে সময়কে বেশি ধরে রাখতে পারে না, এমনি এমনি সেটি বয়ে যায়; বয়ে যে গেছে সেই খবরটিও ঠিক মত দিয়ে যায় না। কিছু বছর আগে প্রথম একজন বিশেষজ্ঞের রচনায় দেখতে পাই যে এরকম একটি ব্যাপার সব মানুষের ঘটে; অন্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মানুষের বোধ-ঘড়ির কথা বলেছেন। কিন্তু এর ওপর প্রথম আটঘাঁট বাঁধা একটি তত্ত্ব এসেছে মাত্র এই সেদিন ২০১৯ সালে। দেখলাম আমি কারণ হিসেবে যা ভেবেছিলাম সেটি এই তত্ত্বটির সাধারণ ধারণার থেকে খুব দূরে নয়। তত্ত্বটি দিয়েছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী এ্যাড্রিয়ান বেজান।

বেজান বিষয়টিকে সম্পর্কিত করেছেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে তথ্যের সিগন্যাল যাবার গতি কমে যাওয়ার সঙ্গে। তাঁর মতে এটি দুটি কারণে ঘটে, প্রথমত স্নায়ুকোষের একটির সঙ্গে অন্যটির দূরত্ব বাড়ে ও দ্বিতীয়ত উভয়ের সংযোগ-পথে নানা ক্যামিকাল জমতে থাকায় সিগন্যাল যাওয়ার পথে বাধাও বাড়তে থাকে। ওই সিগন্যালগুলোর সঞ্চালনই ঘটতে থাকা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বোধ জন্মাবার জন্য নির্দিষ্ট ছোট্ট একটি সময়ে একটি করে স্থিরচিত্রের ফ্রেম তৈরি করে। এগুলো একটির পর একটি সৃষ্টি হতে হতে আমাদের জন্য বোধের এক রকম চলচ্চিত্র তৈরি করে। সিগন্যাল সঞ্চালন ধীর হলে একটি ফ্রেমের মধ্যে তথ্যের যথেষ্ট বুনোট গড়ে ওঠার সময় পায় না– ফ্রেমে তথ্য কম ঘন থাকে। এমন পাতলা-বুনোটের একটি ফ্রেমের সঙ্গে তার পরের ফ্রেমের পার্থক্য কম থাকে, পরপর ফ্রেমগুলো একই রকম মনে হয় বলে সেগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বোধ সৃষ্টি না করেই চলে যেতে থাকে। পর পর অনেক ফ্রেম একাকার হয়ে গিয়ে তা বোধের বাইরে দিয়েই বয়ে যায়, আমাকে তার সঙ্গে জড়িত না করেই। কম বয়সে তার ঠিক উলটো হয়। দ্রুত গতির সিগন্যাল এক একটি ফ্রেমকে ঠাসবুনোট তথ্য দিয়ে তৈরি করে। নিজের বোধের কাছে প্রতিটি ফ্রেম এতো অনন্য যে তাতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হয়, একটির পর আরেকটি আসার আগে সময়ের বোধকে থমকে দাঁড়াতে হয়, আমাকে গভীরভাবে খবর দিয়ে দিয়ে তাকে চলতে হয়– আমার কাছে ঘড়ি তাই স্লো থাকে, সেই কম বয়সে।

বয়সের সঙ্গে আসা এই ব্যাপারটিকে মেনে নিয়ে সময়কে বেখবর বয়ে যেতে দিতে হচ্ছে বটে; কিন্তু বয়স সত্ত্বেও ঘড়ির ফাস্ট হওয়ার রাশ একটু টেনে ধরার সুযোগ আছে। যখন এক দিনের মধ্যেই হরেক রকমের অভিনব অভিজ্ঞতা পাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়– একেবারে নতুন ধরণের চিন্তা, নতুন ধরণের কাজ, নতুন ধরণের মানুষ, দৃশ্য বা জিনিসের সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুযোগ ঘটে, তখনই এটি সম্ভব হয়। এটি যে সত্যি হয় নাটকীয়ভাবে বুঝতে পারি এই ফাস্ট ঘড়ির কালেও মাঝে মাঝে যখন সম্পূর্ণ নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন বিষয়ের মধ্যে যাবার সুযোগ পেয়েছি– বিশেষ করে বিদেশ ভ্রমণে। বিদেশে ভ্রমণের মাত্র দুটি সপ্তাহ কাটিয়ে আসার পর মনে হয়েছে মাঝখানে যেন এক যুগ পার হয়ে গেছে! সেই যে কবে যাত্রা শুরুতে এয়ারপোর্টে গিয়ে বিমান ধরেছিলাম সে কথা যেন সুদূর অতীতে। মাঝখানে এতকাণ্ড হয়ে গেছে যে ওটি অনেক পেছনে পড়ে গেছে ঘড়ি হঠাৎ করে অস্বাভাবিক স্লো হয়ে যাওয়ায়। অথচ যদি বরাবরের মত এই দুই সপ্তাহ ঢাকায় থাকতাম ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে বুঝতে হতো যে দু'সপ্তাহ কেটেছে; কারণ এরকম কত সপ্তাইতো কেটে যায় বুঝতে না পেরে। দৈনন্দিন কাজ করে গেছি, কিন্তু সময় যে অনেক কেটেছে বুঝতে পারিনি। কিন্তু হায় এখন বিদেশ ভ্রমণের মতো ক্রমাগত বিজলি চমকানো দিনওতো বিরল ঘটনা। নতুন ধরণের চিন্তা বা নতুন ধরণের কাজও বা পাব কোথায়? সাধারণত তো আমার জন্য ওই যে বলে 'কানু বিনে গীত নাই'। বৈষ্ণব পদাবলিতে ঘুরে ফিরে কৃষ্ণগীত ছাড়া আর কী থাকবে? আমার জন্য বহুকাল ধরে গীতটি মানব-উদযাপন নিয়ে– একই মানুষকে শতকোটি মানুষের মধ্যে অভিন্নভাবে দেখে এক-বিশ্বের চিন্তা; তার ভেতর বিশেষভাবে দেখা বিজ্ঞান কী বলে, দুনিয়ার আজকের হালচালই বা কী বলে। তাই এতে ঘড়ি আরও ফাস্ট হলেও কিছু করার নেই, ওই একই গীতই গাইতে হবে।

দুই সংস্কৃতি

আর্টস না সায়েন্স?

কলেজ জীবনে শোনা একটি চুটকি মনে পড়ছে। দুই নম্বর বাস কলেজ গেইটে থামলে নেমে আসলেন এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ। নামতেই আরেক শীর্ণকায় বৃদ্ধ 'আরে দোস্ত, কতদিন পর দেখা হলো'– বলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। একথা সেকথা বলে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমার?', উত্তর এলো 'করোনারি'। ফিরতি জিজ্ঞাসা– 'তোমার'? অন্য বন্ধুর উত্তর 'কিডনি'। হাসতে হাসতে দুই বন্ধু পঞ্চাশ বছর আগে কলেজ ভর্তির দিনে প্রথম দেখা হবার কথা মনে করলেন। সেদিন প্রশ্নটি ছিল 'আপনার'? উত্তর– 'আর্টস'। ফিরতি প্রশ্ন 'আপনার'? উত্তর– 'সায়েন্স'।

এখানে আমার আগ্রহটি মোটেই দুই শীর্ণকায় বৃদ্ধের করোনারি বা কিডনির সমস্যার প্রতি নয়; বরং আগ্রহটি হলো দুই টগবগে কিশোরের দু'জনার আর্টস ও সায়েন্সে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রতি। কলেজে পা দেয়া সব নবীনের মন ঠিক করা আছে– আর্টসে যাবে না সায়েন্সে যাবে। ভাবখানা এমন যেন পুরা দেশটাই আর্টস সায়েন্সে ভাগ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে কলেজের আঙ্গিনায় ঢুকে সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা যে সব ভবনের দিকে যাচ্ছে যেখানের পরিবেশে হাইড্রোজেন সালফায়েডের পঁচা ডিমের গন্ধ, টিউনিং ফর্কের টুংটাং শব্দ অথবা সুন্দর বোটানিক্যাল গার্ডেন– যাতে অবশ্য প্রবেশ নিষেধ। আর আর্টসের ছেলেমেয়েরা যে সব ভবনের দিকে গেলো সেখানের পরিবেশে ছোট ছোট দলে কবিতা আর গানের সঙ্গে আড্ডাটাই বেশি দেখা যায়। না তাতে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু শিগগির দেখা গেলো এই দুই দলে নানা ফারাক দেখা যাচ্ছে– তাদের ভাষা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, মেজাজ আলাদা হয়ে যাচ্ছে, এমনকি একের সম্পর্কে অন্যের ধারণাও। তবুও ভালো যে এসব কৈশোর-তারুণ্যের মাঝামাঝি সময়ে ঘটছিলো, অন্তত আমরা ততদিনে আর্টস-সায়েন্স নির্বিশেষে এক জায়গায় মিলিত হয়ে চুটিয়ে তর্ক করতে শিখে গেছি– সেটি ছাত্র রাজনীতিতে, তারুণ্যের অন্যান্য সংস্কৃতিতে।

কিন্তু আমাদের কিছু পরে যারা স্কুলে থেকেছে তাদের ক্ষেত্রে বিভক্তিটি

একেবারে শিশু বয়সেই ঘটে গেছে– অষ্টম শ্রেণির পরেই। তখনই তাদেরকে ভাগ করে ফেলা হয়েছে বিজ্ঞানে অথবা মানববিদ্যায়। এতে ওদের নিজেদের কিছু উৎসাহ যে নেই তা নয়। তবে বিভাজনটা মূলত করে দিয়েছে অভিভাবক ও শিক্ষকরা– ও অংকে কাঁচা, ওর লেখার হাত ভালো, এমনি সব বিবেচনা থেকে; যেন এর মধ্যেই এসব রায় দেয়ার সময় হয়ে গেছে। তারপর ভবিষ্যতের আকাঙ্খাগুলোও রয়েছে– এই পথেই হওয়া যাবে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার; বা ওই পথেই হওয়া যাবে আইনবিদ বা প্রশাসক। হয়তো আকাঙ্খা অভিভাকেরই বেশি, বেচারা শিশু হয়তো এখনো এসব তেমন ভাবছেইনা; সে ভাবছে পরীক্ষা বা একটানা প্রাইভেট পড়তে হওয়ার কথা। তবে সব কিছুতে বিভাজনটি পরিষ্কার। এমনই ভাব করা হচ্ছে তারা যেন যার যার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ বৈ নয়– এক দলের পড়ার বিষয়গুলো নিয়ে অন্য দলের না ভাবলেও চল্‌বে। যে শিশু বিজ্ঞান পড়ছে, বিজ্ঞানের বাইরে তার যে অন্য কিছুতে আগ্রহ থাকতে পারে, অথবা মানববিদ্যার ছাত্রের যে মনে মনে বিজ্ঞানের কোন দিকে উৎসাহ থাকতে পারে, এরকম কোন সুযোগই রাখা হলো না।

আশি আর নব্বইয়ের দশকে আমি স্কুল শিক্ষা-সংস্কারের নানা সরকার-আয়োজিত কর্মদলে ও কমিটিতে কাজ করেছি, স্কুল পাঠ্য বইয়ের সংস্কারেও। সে সময় নবম শ্রেণিতে এসে এই বিভক্তিটিকেই আমি স্কুল শিক্ষার বড় বাধা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সবাই এতে খুব অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, কোন যুক্তিই কাজে লাগছিলো না। ওই বিভক্তির যে প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয় তার মধ্যে প্রধানটি হলো দিন দিন জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ছে, বিজ্ঞানে এবং মানববিদ্যায় উভয়টিতে। কাজেই শিশু বয়স থেকে শুধু এর একটি দিকের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করলে সব জেনে কুলানো যাবে না। আসলে ব্যাপারটি সেরকম নয়। নতুন বিষয় যতই আসতে থাকুক কোন্ পর্যায়ে তার কতখানি কোন্ ভঙ্গিতে জানতে হবে তার সীমা সব সময় প্রায় একই থাকে। শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে সক্ষমতা এমন একটি রূপ লাভ করে যে তখন নতুন সবকিছুর মধ্যেই সহজে বিচরণ করা যায়। তাই বলে সব নতুন কথা আত্মস্থ করার সুবিধার জন্য শিশুকেও 'বিশেষজ্ঞ' হতে হবে এটি অবাস্তব কথা। শিক্ষার কোন পর্যায়েই বেশি বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা না করাই উচিত– বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। জরুরি মৌলিক শিক্ষাগুলো সবই প্রয়োজন– বড়জোর পরে সেখানে একটি দিকের ওপর কিছুটা বেশি জোর দেয়া যায়। কিন্তু শেখার বিষয় হিসেবে অন্য দিকগুলোকে ভুলে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকা উচিত নয়। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়ার সময় অল্প কিছুদিনের জন্য এমনি একটি সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তারা কলাভবনে গিয়ে সভ্যতার ইতিহাস পড়তাম ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপকের কাছে। আমার অদ্ভুত ভালো লাগতো। মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা কার্জন হলে এসে বিজ্ঞানের একটি বিষয় পড়তো। পরে ছাত্র আন্দোলনের মুখে এব্যবস্থা আর চলেনি। শেষ পর্যন্ত সায়েন্স আর আর্টসে আর মুখ দেখাদেখি হয়নি– কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নয়ই, স্কুলে ওপরের ক্লাসেও নয়। এতে ক্ষতি দুদিকেই হলেও বেশি বঞ্চিত হয়েছে মানববিদ্যার ও সমাজবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীরা। এর কারণ বিজ্ঞানে পড়েও বাধ্যতামূলকভাবে অনেকটা পথে সাহিত্য, বাংলা-ইংরেজি ভালো লেখা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়, আর সাধারণ জ্ঞান হিসেবে গণমাধ্যম, বইপত্র, নানা আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সবারই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকেফহাল থাকার কিছু সুযোগ থাকে। কিন্তু উলটোটা হবার সুযোগ বলতে গেলে খুবই কম, বিজ্ঞানের বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সাধারণ জ্ঞান হিসেবেও আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার ব্যবস্থা কোথায়? তারচেয়েও আশঙ্কার কথা আগ্রহটিও উভয় দিকেই কম, সেই আগ্রহ সৃষ্টির আয়োজনও কম। আমাদের প্রকাশিত পত্রিকা বিজ্ঞান সাময়িকী, আমাদের বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন, এবং সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে দীর্ঘকাল কাজ করতে গিয়ে এই দুর্বলতার সঙ্গেই লড়তে হয়েছে বেশি।

বিভাজন জিনিসটিই যে খারাপ তা দেখেছি। কিন্তু সেটি যদি মেনেও নিই তা হলে সব থেকে হৃদয়-বিদারক বিষয় যা ঘটেছে তা হলো কালটি যতই আধুনিক হয়েছে আর্টসে যাওয়া আর সায়েন্সে যাওয়াদের অনুপাত ততই আর্টসের দিকে ভারি হয়েছে– প্রধানত স্কুলের কারণে। নব্বইয়ের দশকে ও তারপর থেকে দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ও তাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর বাড়লেও তার মধ্যে সর্বত্র বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার সুযোগ তেমন থাকেনি। স্বাভাবিক নিয়মেই অনেকেরই বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক সব জায়গার মত গ্রামাঞ্চলেও থাকে। কিন্তু অষ্টম শ্রেণির পর থেকেই তাদেরকে সেদিকে সব আশা ছাড়তে হয়েছে। সুযোগ না থাকার কারণ হিসেবে যা জেনেছি মানসম্মত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভবন, উপকরণ ইত্যাদির সঙ্গতি সে সব স্কুলের ছিল না, আর বিজ্ঞান শেখাবার যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট শিক্ষক পাওয়াও সম্ভব ছিল না। অথচ আমার মতে উচিত ছিল এখানে বহিরঙ্গের মানের বিষয়ে জোরাজুরি না করেই শিক্ষার মর্মটুকুর ওপর

জোর দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু রাখা। যদি কোন শিশু ওই বাইরের মানের অভাবে ওখানকার দুবছরে কিছুটা পিছিয়েও থাকে তাদের অনেকে নিজ প্রতিভায় পরবর্তী পর্যায়ে তা পুষিয়ে নিতে পারতো। আসলে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ, উপকরণ ইত্যাদির তথাকথিত মান সব সময় বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেনা– স্থানীয় সহজলভ্য জিনিস দিয়েই তার অভাব মেটানো যায়। শিক্ষকের আনুষ্ঠানিক ডিগ্রিকেও অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যায়, যদি তিনি বিজ্ঞানে উৎসাহী থাকেন। এগুলো আমরা বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের অতি সাধারণ আয়োজনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পেরেছি। বড় কথা হলো শিশুদের জন্য সুযোগ সব দিকে অব্যাহত রাখা।

স্কুল শিক্ষাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই হোক সব সময় আমি 'মিনিম্যালিস্ট' নীতি অনুসরণের পক্ষে ছিলাম, এখনো আছি। 'ম্যাক্সিমাম' অর্জনের অলীক কথা বলে মিনিমামটুকু বিসর্জন দিতে আমি রাজি নই। জোর দিতে হবে সবাই বিষয়টির মর্মে পৌঁছে এর সম্পর্কে ন্যূনতমটুকুর সন্ধান পেয়েছে কিনা তার ওপর। সেটি যদি হয় তা হলেই অনেকখানি অর্জন হয়। নইলে দেখেছি অনেকে উপরে উপরে মুখস্থ অনেক কিছু আওড়াতে পারে; পাঠক্রমে লেখা নানা শর্ত পূরণের জন্য ছাত্রদের নিয়ে অনেক বড় বড় দাবি করতে অভ্যস্ত হই আমরা, কিন্তু ওভাবে বনের আদ্যোপান্ত জেনেছে এমন দাবি রক্ষা করতে গিয়ে ছাত্র গাছটাকে চিনতেই ভুলে যায়। অথচ কাছে গিয়ে ধরে ও দেখে গাছটি চিনলে পরে ওই চেনা দিয়ে সহজাত প্রতিভায় ছাত্র বনটিকে সত্যি চিনে নিতে পারতো। বনের মধ্যে গাছকে হারাতে না দেয়াই মিনিম্যালিস্ট হওয়া। তা হয়নি বলেই ব্যাপক আয়োজনের প্রাথমিক পাবলিক পরীক্ষা দিয়ে অনেকে দারুণ ভালো করার পরও দেখা যায় অসংখ্য ছাত্র পড়তে আর লিখতেও পারছে না। আরও এক ভাবে সাম্প্রতিককালে স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা সংকোচিত হয়েছে, এবং একই কারণে মানববিদ্যা ও সমাজবিদ্যারও। সেটি হলো স্কুলেও বাণিজ্য শিক্ষাকে বড় করে তোলা। নতুন শতাব্দীতে আসার কাছাকাছি সময় থেকে বিশ্বময় এবং আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ ডিগ্রির জন্য পড়ার মাধ্যমে ব্যবসা প্রশাসন শিক্ষা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এখন স্কুলেও অনেকে মৌলিক বিষয়ের ধার বেশি না ধেরে ওই বাণিজ্য শাখায় পড়ছে– ওই শিশুদের মধ্যেই; যেখানে তার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে কম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু বাণিজ্যের বিষয়কেই লক্ষ্য করলে সেটি শিক্ষিত জনসংখ্যা সৃষ্টির জন্য তো ভালো হবেই না বাণিজ্যের জন্যও ভালো হবেনা; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের কারণেই তো আধুনিক বাণিজ্যের প্রসার।

আর্টস-সায়েন্সের বিভাজনে দুই সংস্কৃতির একটি সংকট বরাবর ছিল, এরকম কম বয়সে শুরু হয়ে সংকটটি বেড়েছে।

বিভাজনহীন তারুণ্য

আর্টস-সায়েন্সের বিভক্তির বিষয়টির জন্ম অবশ্য আমাদের দেশে নয়। যেখান থেকে আমরা এই আধুনিক শিক্ষার মডেলটি গ্রহণ করেছি সেই বৃটেনে ওই দুই সংস্কৃতির বিভাজন বহু পুরানো– ওটি আমরা একটু পরে দেখবো। আমাদের সমস্যা হলো আমরা ওটিকে আজকের দিনেও টেনে এনেছি, এবং তাকে শিশুদের মধ্যে নিয়ে গেছি। শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছুতেই আজকাল বাকি দুনিয়ার থেকে আলাদা থাকার উপায় নেই এটি এখন বৈশ্বিক ব্যাপার, অনেক কিছুর মতই। কৈশোর-তারুণ্যে আর্টস-সায়েন্সের মত বিভাজনগুলো আরোপিত ব্যাপার, বড়রা আরোপ করেছে। তারুণ্য নিজের জন্য যা করে তাতে কোন বিভাজন নেই, আর তাও দিন দিন বৈশ্বিক হচ্ছে। আমাদের তরুণ বয়সের সময় এদেশের তারুণ্যে বৈশ্বিক প্রভাবটি রাজনৈতিক চেতনায় বেশি ছিল, সংস্কৃতিতে তেমন ছিল না। কিন্তু এর পর একটু একটু করে বাইরের হাওয়া সংস্কৃতি জগতেও এসেছে, তবে তাকে দেশজ করে নিয়ে। এটি সঙ্গীতে এসেছে, পরে বিনোদন প্রযুক্তিতে। এই আগাগোড়া সময়ে নানা তরুণরা আমার সামনেই ছিল– যখন নিজে তরুণ ছিলাম তখনো, আর এরপর থেকে ওদের নিয়েই আমার সব কাজকারবার থাকার জন্য আজ অবধি। গোড়াতে বিদেশে কাটাবার সুবাদে এবং সব সময় এই তরুণ সংস্কৃতির বাঁধনহারা প্রকৃতিতে আমার ঔৎসুক্য ছিল বলে সেখানে একে লক্ষ্য করেছি। নিজের বয়স বাড়লেও দেশে ফিরে আমার সামনে যে তারুণ্য তা কিন্তু একই রয়ে গেছে– ছাত্র হিসেবে, আমার লেখালেখির পাঠক-সমালোচক হিসেবে, আমাদের বিজ্ঞান গণশিক্ষার সাথী হিসেবে ওরা ছিল বলে সব সময় কৈশোর-তারুণ্যের সঙ্গেই কাজ করতে হয়েছে। একটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট ছিল– ওরা নিজেদের সংস্কৃতিতে নিজেরা সার্বভৌম, বিভাজনহীন, ভেদবুদ্ধিহীন, যদি না ওসব চাপিয়ে দেয়া হয়।

চাপিয়ে দেবার কাজটিকে কিন্তু বড়দেরকে খুব কসরৎ করে করতে হয়; কারণ যাদের ওপর চাপানোর আয়োজন তারা খুব স্বাধীনচেতা মানুষ, এজন্য প্রায়ই ওই কাজটি ভণ্ডুল হয়ে যায়, চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা কার্যকর হতে চায় না। সাম্প্রতিক মস্তিষ্ক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই দীর্ঘ কৈশোর থাকে, যার ফলে ২৪ বছরের মত বয়সের

আগে মানুষের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল নামক খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সম্পূর্ণই হয় না। অথচ এটিই হলো মস্তিষ্কের সর্বাঙ্গীন বিবেচনার অংশ, যেই বিবেচনা ঝুঁকি নির্ণয়, আত্ম-মূল্যায়ন, ও ভবিষ্যতের হিসেব-নিকেশ করার জন্য খুব জরুরি। এজন্য তারা গতানুগতিকভাবে চলার চেয়ে অসম্ভব কল্পনা শক্তিতে চলে, বেপরোয়া রকমের সৃষ্টিশীল হতে পারে; আবার ঝুঁকির মধ্যেও নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য মস্তিষ্ক গবেষণা বহুদিন ধরে জানা এই বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছে মাত্র। সুকান্ততো বহু দিন আগেই তাঁর 'আঠারো বছর' নামের কবিতায় লিখতে পেরেছিলেন 'এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।' তিনি 'দুর্যোগে ঝড়ে', 'রক্ত দানের পূণ্যকে' মেনে, 'তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' ভোগ করে আঠারোকে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। আবার ভারতের মাদ্রাজে রামানুজম এই বয়সেই গণিতের অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছেন, আইনস্টাইন বিশ্বকে একেবারে নতুন রূপে দেখেছেন এর কাছাকাছি বয়সে, আর মোৎসার্ট তাঁর অনবদ্য সিম্ফোনি রচনা করেছেন।

বৈশ্বিক দিক থেকে ওই তারুণ্যের সংস্কৃতির মূল উপজীব্য মনে হয়েছে সঙ্গীত– তাকে আশ্রয় করেই যেন ওরা ক্রমাগত বাস্তব পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য একটি জগত রচনা করেছে। ষাটের দশকেও দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দীর্ঘ শান্তি-সমৃদ্ধির ছোঁয়া বীটলদের নরম সুরে ভালোবাসার গানের মধ্যে ওরা অনুভব করছে। বীটলরা কিশোর অবস্থাতেই এ সুর শুরু করেছিলো– ছোট্ট স্থানীয় গানের দল হয়েও বৃটেন জয় করেছে, আমেরিকা জয় করেছে, বিশ্ব জয় করেছে। এমনকি বৈষম্য ও হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকেও ওরা পরিণত করেছে নরম সুরের তালে তালে প্রতিবাদে, যুক্তির ও প্রেমের ভাষায়। কিন্তু তারুণ্যের এমনই স্বভাব যে এমন নরম প্রতিবাদ বিশ্বের তরুণদের বেশিদিন সহ্য হয়নি; বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপোষ করা ওই সুর থেকে (বিটলদেরকে রানি রাজকীয় উপাধিও দিয়েছেন) বেরিয়ে এসে নিজেদের কালচারকে সাব-কালচারে পরিণত করেছে– ওরা হিপ্পি হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার মধ্যে এক সঙ্গে থাকার কম্যুন তৈরি করেছে। রোলিং স্টোনের গানেই যেন তাদের ঘোষণা, 'পেইন্ট ইট্ ব্ল্যাক' – শুধুই বিষাদ, দুঃখ, ক্ষোভ। ওই সাব-কালচারে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ বিরোধী, বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী প্রতিবাদ, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গদের ব্ল্যাক পাওয়ার, অদ্ভুত চুলের স্টাইলেও সেই প্রতিবাদ, যে কারণে সে আমলের বিখ্যাত মিউজিক্যালের নাম 'হেয়ার'। এর থেকে

সমাজের সুখি পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরাও আলাদা থাকেনি, সমাজের মূলস্রোতের ওপর এর প্রচুর প্রভাব পড়েছে, অন্তত একটি সময়ে। তারপর আশির দশকে এটি থিতিয়ে এসে সঙ্গীত শামিল হলো প্রযুক্তিতেও।

প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ-স্বর সঙ্গীত, হেভি মেট্যাল ব্যান্ড যেমন এলো তেমনি এলো ভিডিয়ো গেইম্সের আর্কেড। (নানা খেলার আয়োজন সহ মিলন কেন্দ্র)। আগে এমন আর্কেডে সঙ্গীতের ঝুমঝামের মধ্যে পিন-বল অথবা বাগাডুলির লটারি জাতীয় মামুলি খেলা চল্তো বটে, এখন বড় পর্দায় দুর্দান্ত সব ভিডিয়ো গেম্স– প্রায়শ কল্পলোকে অন্য জগতে নিজেকে সক্রিয় করে খেলা। এই ধারাতেই এসেছে সায়েন্স ফিকশন সিনেমা– স্টার ওয়ার, ইটি ইত্যাদি। ষাটের দশকের হিপ্পি তারুণ্য থেকে বিরাট পরিবর্তনই বলতে হবে।

খুব সর্বব্যাপ্তভাবে না এলেও আগাগোড়া এর কিছু রেশ আমাদের দেশের কিছু তরুণ-তরুণীকে স্পর্শ করেছে। ঢাকায় স্যাড জেনারেশন ও তাদের মুখপত্র 'না' নামের পত্রিকা ইত্যাদি খুবই ক্ষুদ্র থেকে গেলেও পপসঙ্গীত কিন্তু ক্ষুদ্র থাকেনি। সেই ষাটের দশকে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু সাফায়াতের অনেকটা পারিবারিক আয়োজন 'জিঙ্গা'র বড় আকারে বেরিয়ে আসার পর সত্তরের দশকে এবং পরে পরে 'সোল্স', 'ফীডব্যাক', 'মাইলস' ওই বৈশ্বিক প্রভাবের পপ সঙ্গীত এদেশেও তারুণ্যকে মাতিয়েছে। অন্যদিকে আজম খান, ফিরোজ শাই, জানে আলম প্রমুখরা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বিশ্ব প্রতিবাদী ঐতিহ্যের দেশীয় সংস্করণের জন্য। তাঁদের মাধ্যমে পপ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এদেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও তুঙ্গে উঠে। ওসময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অক্ষর চক্কর' নামের একটি সাক্ষরতা বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে করতে গিয়ে আমি তাঁদের গানের প্যারোডি তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি– যেমন 'স্কুল খুইলাছে রে মাওলা', 'ওরে সালেকা ওরে মালেকা', 'একটি গন্দমের লাগিয়া'– ইত্যাদি গানের প্যারোডি; উদ্দেশ্য তাঁদের জনপ্রিয়তার সুযোগ নেয়া। ভিডিয়ো গেইম্সের আর্কেড তখন এখানে দেখা না দিলেও হাত-ঘড়ির আকারের বা হাতের তালুতে রাখার আকারের ভিডিয়ো গেম্স কিশোর ও তরুণদের হাতে হাতে এখানেও দেখা গেছে; ওতেই মগ্ন হয়ে তারা কল্পলোকে চলে যেতো। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সহজলভ্য ভিডিও ক্যাসেটের কল্যাণে সায়েন্স ফিকশন সিনেমাতেও বেশ বুঁদ হয়ে পড়ে তরুণ-তরুণীরা। এ সবে আর্টস-সায়েন্সের কোন বিভাজন ছিল না, এখনো নেই।

নব্বই দশকের পরে এখন অবধি উন্নত বিশ্বের নগর-দরিদ্রদের

বিপজ্জনক ও মানসিক যন্ত্রণার জীবন যে ভাবে র‍্যাপ বা হিপ্‌হপ সঙ্গীতের মাধ্যমে বৃহত্তর উদার সমাজকেও নাড়া দিয়েছে সেটি এখানে রেখাপাত তেমন করেনি। কিন্তু রাতারাতি এখানেও তরুণ তরুণীদের সবকিছু বদলে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম– বিশেষ করে ফেইসবুক। এ যেন কৈশোর-তারুণ্যে থাকা এখানকার সবার বিশ্বজোড়া সংযোগ জাল। এ জালের কোথাও একটু নড়েচড়ে উঠলেই পুরো জালে থাকা সবাই তা টের পায়। ইতোমধ্যে এদেশের তরুণদের অনেকে বিশ্বময় পাড়ি দিয়েছে বলেই এ জাল এখন বিশ্বজোড়া। এতে ভালো হলো কী খারাপ হলো তরুণরা তা থোড়াই চিন্তা করে; আগেও বিশ্বের তরুণ তরুণীরা যা করেছে তা স্বাধীনভাবেই করেছে, এক্ষেত্রেও তাই করছে। কী অর্জিত হয়েছে, কী বর্জিত হওয়া উচিত ছিল এসব বড়দের ভাবার ব্যাপার, তারুণ্যের সংস্কৃতি সার্বভৌমভাবে এগিয়েছে।

বিশ্বজোড়া ওরা এখন ফেইসবুকের তথ্যের মধ্যে ডুবে আছে– প্রধানত পরস্পরের তথ্য, অন্যান্যদেরও তথ্য। সব তথ্য, সব সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ কি না, এগুলো সব সত্য কি না এসব নিয়ে তাদের কেউ ভাবে, কেউ ভাবে না। একভাবে এটি তাদের সবাইকে সচেতন করছে, সৃজনশীলতার একটি চাহিদা নিজেদের ভেতরেই সৃষ্টি করছে– পরস্পরের ফটোগ্রাফি, ছোটখাট কাজ, সঙ্গীত, মজার কথা, ফ্যাশন, ভালো লাগা-না লাগার জিনিস ইত্যাদি রূপে। আগের ওই সঙ্গীতের, প্রতিবাদের, হিপ্পির কাজগুলো যেমন বাঁধনহারাভাবে করেছে, এখানেও তাই। আগেও বিতর্ক হয়েছে বাড়াবাড়ি আচরণে তাদের অতিরিক্ত মগ্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ নিয়ে, এখনো তাই হচ্ছে। ফেইসবুক একটি নেশায় পরিণত হচ্ছে না তো, যাতে সত্যিকারের অনেক কাজ ও যোগাযোগ জলাঞ্জলি যেতে পারে? সামাজিক মাধ্যম কি তাদের নিজেদেরকে নিজেদের মধ্যেই আসলে অসামাজিক করে তুলছে না, সরাসরি যোগাযোগের উষ্ণতার অভাবে? বই পড়া, লেখালেখি, সামনাসামনি আলাপ-আড্ডা, সশরীরে ভ্রমণ, অভিযাত্রা, খেলাধূলা এসবের কী হবে? ফেইসবুক পোস্টিং দিতে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে, লাইক পেতে উদ্বিগ্ন হতে গিয়ে মানসিক চাপের সৃষ্টি হচ্ছে না তো? হয়তো দেখে দেখে ঠেকে ঠেকে তারাও এসব ব্যাপারে বিবেচনা বিবেক প্রয়োগ করতে শিখছে। যতক্ষণ এর ফলে বড় রকমের একটি মেষতন্ত্র সৃষ্টি না হচ্ছে, আর সেই তন্ত্র সবাইকে এক বানোয়াট জগতের মধ্যে নিয়ে না ফেল্‌ছে ততক্ষণ হয়তো মারাত্মক ক্ষতি কিছু হবে না। তাছাড়া তরুণরা ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছে বলেই তো তারা সেটিকে গ্রহণ করেছে, সে কথা ভুললে চলবে না।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন তরুণদের গঠনশীল মস্তিষ্কের কারণে যে অস্থিরতা থাকে তা নিবারণে ফেইসবুকের হালকা মেজাজের ভাবনা বেশ কাজে আসে। এই আমি কফি হাউসে বসে আছি, গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছি, সামনের রাস্তায় লোকজনের চলাচল লক্ষ্য করছি; এমন মামুলি অভিজ্ঞতাগুলো শান্ত মনে দূরের সব নিকট-বন্ধুদেরকে বলতে পারার মধ্যে একটি প্রশান্তি আসে যা উপকারী। এর বাইরে অন্য অনেকের সঙ্গেও যদি এমন উত্তেজনাহীন সম্পর্কের মধ্যে এ কথাগুলো অবলীলাক্রমে বলতে পারে তবে নিজের জন্য একটি সামাজিক সমর্থন অনুভব করা যায়। এমনি সামাজিক সমর্থন পাওয়ার চেষ্টাকে নেশা না বলে স্থিরচিত্ত ও হালকা হবার উপায় বলা যেতে পারে। তবে তারুণ্যের নিয়মই সব সময় এমন ছিলো যে ওরা ওদের চাহিদা মত সৃষ্টি করে যাবে, বড়রা সমালোচনা করলেও। শেষ পর্যন্ত উভয়ের একটি বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে আমরা বার বার দেখেছি। এবারো দেখছি ফেইসবুক কেমন করে তরুণদের দ্বারা শুরু হয়েও বড় ও বিখ্যাতদেরকেও নীরবে বদলে দিচ্ছে।

আমরা যে বিশ্ব সমঝোতার কথা বলছি, এক-মানুষের এক-বিশ্বের কথা বলছি সেখানে তরুণদের এই ভেদবুদ্ধিহীন নিজস্ব সংস্কৃতির একটি বিরাট ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। এ মুহূর্তে দেশে দেশে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা বড় বড় বিশ্ব-নেতাদেরকে ভর্ৎসনা করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নিজেরাই যে আন্দোলনে নেমেছে এটি তো তারই প্রমাণ। ওদের নিজেদের স্বাধীন সংস্কৃতি না থাকলে এটি কি সম্ভব হতো? সেই আন্দোলনের ফলটি নেহাৎ একটি পপ্ ফ্যাশনের মত উবে যাবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই– ইতোমধ্যেই তা বড় বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে বিশ্ব বাঁচাবার কাজে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে। আসলে তরুণদের কোন আন্দোলনই, কোন সাংস্কৃতিক সৃষ্টিই, নেহাৎ পপ ফ্যাশন ছিল না, উবেও যায়নি। হৃদয়-নিঃসৃত সঙ্গীত সেখানে ধারাবাহিকভাবে 'আধ-মরাদেরকে ঘা দিয়ে বাঁচিয়েছে'– বৈশ্বিক, সামাজিক সমস্যার প্রতি নির্লিপ্ততাকে কষাঘাত করেছে; প্রয়োজনে সেই সমাজের রীতিনীতিকে বর্জন করে বেরিয়ে এসেছে। তরুণরা এভাবে নিয়মিত বিশ্বকে বদলিয়েছে, আমরা সবাই তার ফল ভোগ করছি।

'কাণ্ডারির' সংস্কৃতি

ষাট বছর আগে বৃটেনেও:

২০০৯ সালে একটি বিতর্ক ইউরোপ-আমেরিকায় সৃষ্টি হয়ে আমাদের

দেশেও তার রেশ রেখেছিলো, এবং এখানে আমিও তাতে কিছুটা অংশ নিয়েছি। একটি পুরানো বিতর্কের ৫০ বছর পূর্তি পালন করতে গিয়েই এটি ঘটছিলো। ওই মূল বিতর্কটির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বৃটেনে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ও ঔপন্যাসিক সি পি স্নো ওখানে ১৯৫৯ সালে একটি বক্তৃতা দিয়ে। ওই বক্তৃতা ও পরে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'দুই সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময় থেকে দেখা দেয়া বিজ্ঞানের অপার সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই ছিল বক্তৃতাটির উদ্দেশ্য, কিন্তু এটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার শিরোনামের প্রথম অংশের কারণে, এবং বিতর্কের জন্মও সেখানে। দুই সংস্কৃতি বলতে স্নো বুঝিয়েছেন সেই সায়েন্স-আর্টস বিভাজনকে– যা আমরা শুরুতেই কিছুটা আলোচনা করেছি এবং এই অধ্যায়ের নামও করেছি তাঁকে অনুসরণ করেই 'দুই সংস্কৃতি'।

দুই সংস্কৃতি সম্পর্কে স্নোর বক্তব্য ছিল সে সময়ের বৃটেনে মানুষ এক দিকে সাহিত্য ও মানববিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকা, আর অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের মধ্যে আবদ্ধ থাকা এই দুই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করছিলো। এর মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাটি সমাজে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিরল ছিল এবং তাদের কাছে তেমন গুরুত্বও বহন করতো না। বৃটেনের জন্য যে বিজ্ঞানমুখী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হতে পারতো তার পথে তিনি একে বড় একটি অন্তরায় হিসেবে দেখছিলেন। দেশের নীতি নির্ধারণ ও নেতৃত্বে ছিলেন যে রাজনীতিবিদ, আমলা, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক গোছের মানুষ তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ওই প্রথম দলের মানুষ– সাহিত্য-মানববিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ। তাদেরকেই আমরা এখানে 'কাণ্ডারি' বল্‌ছি, যাঁরা মনে করেন তাঁরা সব কিছুতে নেতৃত্ব দিতে পারেন, সব কিছু পরিচালনার কাণ্ডারি হিসেবে কাজ করতে পারেন, বিজ্ঞানের সম্পর্কে কোন খবর না রেখেই সেটি পারেন। স্নো অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন পুরানো আমলের মত তখনো ল্যাটিন, গ্রিক প্রভৃতি ধ্রুপদী ভাষা শিক্ষায় ও কিছু কিছু সনাতনী মানববিদ্যায় পড়াশোনা করেই কাণ্ডারি হওয়াটিই নিয়ম; বড় জোর আইন অথবা সমাজবিদ্যায়। তাঁর আক্ষেপ অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের মত বনেদি বিশ্ববিদ্যালয়ও তখনো সত্যিকারের পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী (ইনটেলেকচ্যুয়াল) বলতে শুধু ওইসব বিষয়ে পারদর্শীদেরকেই বোঝাচ্ছে, এমনকি আর্থার এডিংটনের মতো বিশ্বসেরা জ্যোতির্বিদ বা পল ডিরাকের মত পদার্থবিদকেও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে গণ্য করা হয় না।

স্নো বৃটেনে ও বৃটেনের বাইরেও বড়সড় বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর

এই দুই সংস্কৃতি বিষয়ের সমালোচনাগুলো এনে, বিশেষ করে ওই বুদ্ধিজীবী বলে বিবেচিতদের প্রতি একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে। তিনি বললেন 'থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম' নামের যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীতিটি আছে তার সম্পর্কে কিছু না জানাটাকে তাঁরা নিজেদের জন্য স্বাভাবিক মনে করেন, যাবতীয় কাণ্ডারিদের জন্যও স্বাভাবিক মনে করেন; কিন্তু তাঁরাই আবার শেক্সপীয়ারের নাটক সম্পর্কে কোন কিছু না জানা না থাকলে বিজ্ঞানের মানুষকে ডাহা নিরক্ষর বলে তিরস্কার করেন। কাণ্ডারিরা যে বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ না জেনেও যাবতীয় কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করছেন তাকে তিনি বৃটেনের জন্য অশনি সংকেত মনে করেন। অবশ্য এসব ব্যাপারে তিনি কিছু বিজ্ঞানীকেও দায়ী করেছেন। একেবারে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ধরণের কাজ করা এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন ওভাবে তাত্ত্বিক হওয়াটা কৌলীন্যের প্রমাণ – যেহেতু তাতেই পাণ্ডিত্যের প্রমাণ, যা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে নেই।

স্বাভাবিকভাবেই স্নো যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তাঁর প্রতিপক্ষও কম প্রবল ছিল না। এই প্রতিপক্ষ দলের এক রকম নেতা হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে সুপরিচিত এফ আর লীভিস। থার্মোডাইনামিক্স-শেক্সপীয়ার নিয়ে স্নোর কথার জবাবে লীভিস যা বলেছেন তার থেকেই বোঝা যায় প্রতিপক্ষের যুক্তির ধরণ। তাঁর কথা হলো:

'থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম একটি বিশেষ ধরণের জ্ঞান, কোন বিশেষ জনের কাছে এটি কী প্রয়োজনীয় হবে? না কি অপ্রাসঙ্গিক হবে তা নির্ভর করবে তাঁর সামনের কাজটি কী তার ওপর। অন্যদিকে শেক্সপীয়ারের রচনাগুলো হলো মানবাত্মার ভেতরটি দেখতে পাওয়ার এক একটি জানালা, এগুলো জানা আর নিজেকে জানা একই কথা, এগুলো সবার কাছেই প্রাসঙ্গিক।'

লীভিস অনায়াসে এমন যুক্তি দিতে পেরেছেন তার কারণ তিনি থার্মোডাইনামিক্স সম্পর্কে কিছুই জানেন্ না। যদি জানতেন তা হলে বুঝতেন ওই দ্বিতীয় নিয়মটি নেহাৎ কোন বিশেষ কাজ করার ফর্মুলা মাত্র নয়, ওটি আমাদের পুরো মহাবিশ্বের অনিবার্য অবক্ষয়ের দিগ্‌দর্শিকা, যা না জানলে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের প্রতিবেশ ও মহাবিশ্ব কোন ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছে তার কিছুই জানব না। এদিক থেকে এটি আমাদের উপলব্ধির ও জ্ঞানের একটি মর্মকথা। লীভিসের যুক্তি স্নোর আশঙ্কাটিকেই বরং প্রমাণ করছে। দুই সংস্কৃতির বিপদ তো ওখানেই– বিজ্ঞানের বিষয়ে না জানাটাকে স্বাভাবিক মনে করা, তারপরও নিজেদেরকেই কাণ্ডারি মনে করা। স্নো

বৃটেনে এর অবসান চেয়েছিলেন। তিনি এমন একটি অবস্থা কামনা করেছেন যেখানে তাঁর চেনা অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের হাই-টেবিলে খানা খেতে খেতে মানববিদ্যার যে পণ্ডিতরা জ্ঞানের আলোচনা করছেন তার ভেতর মৌলিক কণিকা জগতের বাম-ডান প্রতিসাম্য নাকচ করে সাম্প্রতিক আবিষ্কারটিও কিছুটা ঝড় তুলবে। সে সময় ইয়াং আর লী এই দু'জন পদার্থবিদ ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছিলেন– ওই প্রতিসাম্যটি প্রকৃতির গাণিতিক সৌকর্যের একটি অতি সুন্দর ও গভীর প্রকাশ– সৌকর্যপ্রিয় পণ্ডিত মাত্রেরই এতে দারুণ উৎসাহ থাকার কথা। কিন্তু হায় সেটি এই ক্ষেত্রে সম্ভব ছিলনা!

সিপি স্নোর বক্তৃতা বিতর্কের ঝড় যেমন তুলেছিলো, তেমনি অনেককে বেশ ভাবিয়েছে। এর সুফল কোথায় কতটা হয়েছে বা হয়নি পরে খানিকটা দেখা যাবে। কিন্তু দুই সংস্কৃতিকে এক জায়গায় আনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তখন বিখ্যাত আমেরিকান পদার্থবিদ ওপেনহাইমার যা বলেছিলেন তা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন– 'সায়েন্সের যাঁরা সৃষ্টিকার আর আর্টসের যাঁরা সৃষ্টিকার তাঁদের প্রত্যেকের ভেতরে অন্তর্নিহিত এক অদ্ভুত দ্যোতনা আছে। এই দ্যোতনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হবেনা যদি তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের চারিধারের বিশেষজ্ঞের দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলে অন্য বিষয়ের অন্যদেরকেও সেই দ্যোতনায় আলোকিত না করেন।' আমারও মনে হয় ওই দেয়াল ভাঙ্গাটি একটি বড় কাজ; দুই সংস্কৃতি বা বহু সংস্কৃতি নয়, একটি মিশ্র সংস্কৃতিই মানব-উদযাপনের সবচেয়ে ভালো বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে।

আজকের কাণ্ডারিরা:

স্নোর ওই সমালোচনার দিন থেকে অন্তত বৃটেনের পরিস্থিতি যে অনেক বদলিয়েছে তা তার দশ বছর খানেক পর সে দেশে দীর্ঘদিন থাকতে গিয়েই টের পেয়েছি; সেটি আজ থেকে ৫০ বছরেরও আগের কথা। আর এখন তো স্নোর বৃটেনকে চেনাই যাবে না। একটি উদাহরণ দিলে কিছুটা বোঝা যাবে। ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এডোয়ার্ড হীথের রক্ষণশীল দলের নতুন মন্ত্রীসভায় তখনো তরুণী মার্গারেট থ্যাচারকে দেখেছি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে– কিছুদিন আগেও পেশাদার কেমিস্ট ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রী থাকা কালে তখনই অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় খরচ বলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুধ খাওয়ানোর বহুদিনের প্রথা বন্ধ করে 'মার্গারেট থ্যাচার, মিল্ক স্ন্যাচার' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ওই কেমিস্ট্রির শিক্ষা প্রাপ্ত মাথায় তখনই কাউকে কিছু বিনে

পয়সায় না দিয়ে দেয়ার ব্যতিক্রমী রক্ষণশীল অর্থনীতি গিজগিজ করছিলো যা পরে তাঁর দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে থ্যাচারিজম নামে দুনিয়াখ্যাত হয়েছিলো। আর এখন আরও বহুদিন পরে আরেক দেশের আরেকজন দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছা বিদায়ে মনটি ভারী হয়ে আছে। তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মের্কেল– তিনিও রক্ষণশীল দলের নেতা হয়েও থ্যাচারের একেবারে বিপরীত মেরু। মের্কেল কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যায় পিএইচডি করে ১৯৮৯ পর্যন্ত ওই বিষয়ে গবেষণা-বিজ্ঞানী ছিলেন। সে বছরেই রাজনীতিতে যোগদান করেন তিনি; তারপর তিনি শুধু জার্মানিকে বদলাননি, ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বদলিয়েছেন, এবং দুনিয়াতে সহমর্মিতার ও সৌহার্দের রাজনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই দুই নেত্রীর কেউ নিজেকে সায়েন্স-আর্টসে বিভক্ত করেননি।

বৃটেন সহ অনেক জায়গায় দুই সংস্কৃতির বিভাজন অনেকটাই চলে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে গেছেকি? অন্য অনেক কিছুর মত এই বৃটিশ ঐতিহ্য আমরা আজও সযত্নে পোষণ করে যাচ্ছি। রাজনৈতিক নেতা, উচ্চ আমলা থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক– আমাদের কাণ্ডারিরা ওই একটি সংস্কৃতিতে থাকাটাই নিয়মে রয়েছে তখন থেকে এখনো। রাজনীতির জন্য আইন পড়া মানুষ হলেই ভালো (এখন অবশ্য ব্যবসায়ে জড়িত মানুষই বেশি), আর আমলা, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ইত্যাদি অন্য কাণ্ডারিদের জন্যও বিজ্ঞান ছাড়া সব কিছু সই– ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি সবই। পণ্ডিত সমাজ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক-কলামিস্ট যাঁরা কাণ্ডারি না হয়েও কাণ্ডারিদেরকে উপদেশ দিতে পারেন তাঁদেরো সাধারণত এমনিই পটভূমি; সিপি স্নো বৃটেনে সে সময় যেমনটি দেখেছিলেন। তাঁদের কথা হলো– বিজ্ঞান পড়া মানুষ নমস্য, তবে ছোটবেলা থেকে অংক কষে কষ্ট করে তাঁরা যা শিখেছেন তাকে কাজে লাগানোর জন্য আমরাই বেশি উপযুক্ত, কারণ ওরা নিজেরা তো দেশের হালচাল বোঝে না। বুদ্ধিজীবী আমরাই হলেও সেই বুদ্ধি আমাদেরকেই খরচ করতে হবে এমন কি কথা? 'জুতা আবিষ্কারে' রবীন্দ্রনাথের হবুচন্দ্র রাজা এজন্যই বলেছিলেন- 'তবে কেন পুষিতেছি এতগুলো বৈজ্ঞানিক ভৃত্য'। ওরা যার যার কাজ করবে, ভাইরোলোজিস্ট ভাইরাস সামলাবে, কেমিস্ট কেমিক্যাল সামলাবে; ইঞ্জিনিয়ার দালান সামলাবে, আমরা সবকিছু সামলাবো তাদের মাধ্যমে, আমরাতো কাণ্ডারি। কখনো অর্থনীতির হিসেব কষে ভবিষ্যতের চিত্র আমরাও দিই, তবে সে তো বিজ্ঞান নয় যে দুয়ে দুয়ে চার সব সময় হতেই হবে। হলে ভালো, না হলে একটি ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়া

যাবে।

২০২০ সাল আসার পর থেকে গত দেড় বছর ধরে কোভিড-১৯-এর কারণে একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি বিজ্ঞানবিহীন সর্বজ্ঞ কাণ্ডারিদের দাবি কত অসার– শুধু আমাদের দেশে নয়, দুনিয়ার দেশে দেশে। আগেও বহু রকম দুর্যোগ নানা দেশের ওপর দিয়ে গেছে। দুর্যোগগুলো পুরো সামাল দেয়া না গেলেও কেন যায়নি তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতো– অন্তত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোন এক ধরণের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা যেতো। এবারকার দুর্যোগটি শতভাগ জীবাণুঘটিত, একেবারেই জীবতাত্ত্বিক। এখানে না জেনেও জানি ভেবে নীতি নির্ধারণের সুযোগ নেই, ভাইরাস সে কথা বুঝবে না। আমাদের মত দুনিয়ার সব মানুষই প্রতি পদক্ষেপে মুখিয়ে আছে কাণ্ডারিদের কথা শুন্‌তে নয়, ভাইরোলজিস্টের কথা শুনতে, এবং তা সরাসরি হলে তারা আশ্বস্থ হয় বেশি। সিপি স্নোর প্রতিপক্ষ সেই লীভিসের মত এখানে কেউ বলতে সাহস করবেননা যে 'বিজ্ঞান কখনো প্রাসঙ্গিক, কখনো অপ্রাসঙ্গিক; এতো আর শেক্সপীয়ারের রচনার মত অন্তরাত্মার জানালা নয় যে সবাইকে তা জানতেই হবে'। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে না জানলে সেই 'বাবু ও মাঝি' কবিতাটির মত জীবন ষোল আনাই মিছে হয়ে যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতি

সি পি স্নো দুঃখ করেছিলেন দুই সংস্কৃতি নিয়ে। তাঁর সেই বক্তৃতার ৬০ বছর পরে এসে এখন যেন তা বহু সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, যার জন্য দায়ী বিজ্ঞান-পড়া বিশেষজ্ঞরাই। আগে আর্টসের মানুষরা এই বিজ্ঞান-পড়াদের বিষয়ের কিছু বুঝতেন না, বুঝতে চাইতেননা বলে। এখন ওই বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের এক দলের বিষয় অন্যদলও বুঝেননা; কোন দল চায়না যে অন্যরা তাদের কথা বুঝুক– সেই অন্যরা নিজ বিষয়ে যত ভালো বিজ্ঞানী হোন না কেন। যার যার বিষয় তার তার কাছে রাখাটাই যেন একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে– বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতি। স্নোর নিজের দেশ বৃটেন এবং অন্য উন্নত দেশগুলোতেও এটি ঘটেছে, তবে সেখানে অতটা বিশেষজ্ঞ না হওয়াদেরও একটি জায়গা আছে যারা বিষয়ের একটি ব্যাপ্তির মধ্যে এখনো কাজ করতে পারেন। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো বৃটেনের বা কানাডার মত দেশে যেখানে নাগরিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার একটি জাতীয় ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সাধারণ চিকিৎসকদের (জেনারেল প্র্যাকটিশিনিয়র) দিয়েই প্রায় সব চিকিৎসা শুরু করতে হয়, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে ওখানেই চিকিৎসা শেষও হয়ে যায়। সেই সুবাদে ওই সাধারণ চিকিৎসককে চিকিৎসার সব দিকের জ্ঞান বেশ কিছু রাখতে হয়। আমাদের দেশে ক্রমে ব্যাপারটি দুর্লভ হয়েছে। তাছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির নানা শাখার ওপর সার্বিক দখল আনার বদলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ হবার দিকেই লক্ষ্য থাকে– কারণ বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতিটি এখানে প্রবল। বলা যায় এটি কাণ্ডারি সংস্কৃতির একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বেশি জোরদার হয়েছে। আমাকে যখন সাধারণভাবে নেতৃস্থানীয় হবার, দিগনির্দেশনা দেবার বা বুদ্ধিজীবী হবার জন্য উপযুক্ত মনে হচ্ছেনা তখন আমি বরং নিজের বিদ্যাটিকে দুর্লভ ও মূল্যবান করে তুলি।

ক্রমে বিশেষজ্ঞের কাজের এলাকাটি আরও বেশি বিশেষায়িত হচ্ছে। এর সপক্ষে যুক্তিটি হলো তা হলে মনোযোগ ওই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জায়গায় নিবদ্ধ করার ফলে কার্যকারিতা বাড়বে; তাছাড়া ওই ক্ষুদ্র বিষয়েও নিত্যনতুন এতো জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে যে অন্যথা সেগুলো শিখে কুলানো যাবে না। প্রকৌশল, চিকিৎসাবিদ্যার মত ফলিত বিষয়ে এটি বেশি ঘটে– কারণ সেখানে এভাবে বিশেষজ্ঞ নিজেকে অনেকের কাছে অপরিহার্য করে তুলতে পারেন, এবং পেশা-জীবনে নিজের জন্য বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে পারেন। এটি যে নতুন সৃষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য সব সময় হচ্ছে তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে খুব কাছাকাছি জ্ঞান হলেও ভিন্ন বিশেষজ্ঞের আওতায় থাকা বিষয়ে তাঁরা কোন মন্তব্য করতেই রাজি হন্ না। যেমন বহুতল ভবনের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী অল্পতল ভবনের ব্যাপারে মত দিতে চান না, অথবা তাঁকে ওই বহুতলে থাকতে বাসিন্দাদের সম্ভাব্য অনুভূতির কথা জিজ্ঞেস করলে সেই প্রশ্ন স্থপতিকে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দেন; অথবা চোখের পাতার চর্মরোগের ওষুধ চোখের কারণে ব্যবহার করা যাবে কিনা তা জানতে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার পরামর্শ। বোঝা যায় যে এটি যতটি না জ্ঞানের অপ্রতুলতার ব্যাপার, তার চেয়ে বেশি অন্যের এলাকায় না ঢুকার সংস্কৃতির ব্যাপার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফলিত বিশেষজ্ঞের বিক্রিয়া বেশি ঘটে বলে এই সংস্কৃতিটি ফলিত বিষয়ে টের পাওয়া যায় বেশি। এখানে কেউ সহজে এর ব্যতিক্রম করতে চান না। কিন্তু এটি বিজ্ঞানের আরও মৌলিক বিষয়েও ঘটছে না তা নয়। পদার্থবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির মত বিষয়ে এখন হাজারো শাখা-প্রশাখা; অনেক ক্ষেত্রে অধ্যাপনা, গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুবই বিশেষায়িত বিষয়ের মানুষেরই কদর বেশি হয়, অন্যদিকে যাঁরা কিছুটা মিশ্র ও ব্যাপক বিষয়ে কাজ করেন তাঁদের আদর কম। তবে ফলিত বিষয়ের মত পেশাগত বিষয় জড়িত নয়

বলে মৌলিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমানটি অবশ্য কিছুটা কম।

কাণ্ডারির সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়ে বিশেষজ্ঞের এই অভিমানটি একেবারেই কাণ্ডারির মনোভঙ্গির বিপরীত অবস্থানে চলে যায়। কাণ্ডারি দেখাতে চান মানুষ ও দেশের কোন বিষয়ই তাঁর অগম্য নয়, অসাধ্য নয়; আর বিশেষজ্ঞ দেখাতে চান বিশেষায়িত একটি গণ্ডিবদ্ধ এলাকায় তাঁকে ছাড়া গতি নেই, এর বাইরে তিনি যেতে চান্ না। তারপরও যেহেতু আধুনিক কোন কোন ক্ষেত্রের পরিচালনাতেও বিশেষায়িত জ্ঞানটি থাকা সুবিধাজনক তাই আজকাল তাঁদেরকেও খুব সীমিতভাবে কাণ্ডারির দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে– টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী, ট্যাকনোক্র্যাট আমলা ইত্যাদি হিসেবে– প্রধানত স্বাস্থ্য, বিভিন্ন প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি কারিগরি দিক সম্পন্ন কাজে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতি সেখানেও তাঁদেরকে নিজের ব্যাপ্তি ঘটাতে বাধা দেয়। ওই 'টেক্‌নোক্র্যাট' কথাটি যেন তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে– কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সারা জীবনের শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘ পেশা-জীবন ইত্যাদির শেষে গিয়ে তাঁরা এই কাণ্ডারির ভূমিকা লাভ করেন। সেই শিক্ষায়, সেই পেশায় যদি দেয়াল ভেঙ্গে অন্য বিষয়কে জানার এবং নিজের বিষয় অন্যকে জানাবার সুযোগ থাকতো তা হলে কাণ্ডারি হিসেবে দায়িত্ব পালনে নেহাৎ টেকনোক্র্যাট হয়ে থাকতে হতো না। বরং বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতাগুলোর ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহার করে তাঁরাই যে কারো থেকে বেশি সার্থক কাণ্ডারি হতে পারতেন।

মৌলিক হোক বা ফলিত হোক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অতিরিক্ত গণ্ডিবদ্ধ হওয়ার একটি খারাপ ফল অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করেছি যা সব থেকে বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। এটি হলো নিজের বিষয়ের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগাযোগের অভাব, এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে তাঁর নিজের বিষয়েরই আসল সত্যতার ওপরও অনাস্থা। সারা জীবন মূলধারার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবিদ হিসেবে কাজ করে সে পেশা চালু থাকার সময় অথবা সেটি ত্যাগের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রত হবার মধ্যে এমনি অনাস্থা দেখতে পাই, একই ব্যাপার কেমিস্ট্রির নাম করা অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও দেখেছি। হোমিওপ্যাথির কথিত মূলনীতির সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির মূল নীতি একেবারে এই মেরু আর ওই মেরু– একটি সত্য হলে অন্যটি তা হতে পারে না। এর অর্থ হলো নিজের বিষয়ে মূলনীতির ওপর পুরোপুরি আস্থাভাজন না হয়েও সেই বিষয়কেই সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র করা। এমন অনেকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে যাঁরা সারা জীবন জীবতাত্ত্বিক নিয়মের ব্যবহার করেও জীব বিবর্তন জিনিসটাকেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা

যে কোন বিকল্প কার্যকর তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাও নয়, কারণ ওরকম কোন সফল বিকল্প নেই। পছন্দ হয়না বলেই বিশ্বাস করেন না, তবে ব্যবহার করেন। নিজে বিজ্ঞানের ওই শাখায় কাজ করেন না এমন বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলীদের মধ্যে এটি আরও সচরাচর ঘটে, ভিন্ন শাখার কিছু কিছু জিনিসকে দিব্যি অস্বীকার করেন, যেমন মহাবিশ্বের জন্ম ও প্রসারণের বিগ্‌ব্যাং থিওরি, জীব বিবর্তন ইত্যাদি তত্ত্বকে। আসলে বিজ্ঞানের এক জায়গায় একই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে আস্থা না রেখে অন্য জায়গার বিজ্ঞানও নীতিগতভাবে চর্চা করা যায় না। কিন্তু তাঁদের সুবিধা হলো তাঁরা বিজ্ঞানের অন্য বিষয়ে আগ্রহী নন্, তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যও করেন না। কিন্তু এসব আর যাই হোক, না বিজ্ঞানের সংস্কৃতিকে, না বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতিকে ভালো ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে।

প্রয়োজন মিশ্র সংস্কৃতির

সমস্যার অনেকখানিই শিক্ষার মধ্যে। শিক্ষায় আর্টস-সায়েন্সকে এক যোগে নিয়ে যাঁরা অনেক দূর যান তাঁদের জন্য কাণ্ডারি বা বিশেষজ্ঞের ওই নানা নেতিবাচক দিকগুলো বড় হয়ে ওঠতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে যাঁরা প্রত্নতত্ত্বের বিজ্ঞানেও স্বচ্ছন্দ গভীরতায় যান, বা বিজ্ঞানকে যাঁরা শুধু বিজ্ঞানের নিয়ম হিসেবে না দেখে একই সঙ্গে তার মূলনীতি, তার পদ্ধতি, তার দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে হৃদয়ে আনেন, ওই দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েন তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। ইচ্ছে করলে এবং নেতৃত্বগুণ থাকলে তাঁদের যে কেউ সত্যিকার কাণ্ডারির ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই নিতে পারেন, আবার তাঁদের যে কেউ সত্যি সত্যি পণ্ডিত সমাজের গর্ব হতে পারেন।

আমাদের দেশেও দুই সংস্কৃতিতে বিচরণ করার মত মানুষ যে নেই তা নয়। তবে তাতে বেশি দেখা যায় বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের সৌখিনভাবে সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদির চর্চা করার মাধ্যমে– বিশেষ করে বিজ্ঞানের বাইরের যে নান্দনিক বিষয়গুলোর সমাজে উচ্চ প্রচলন ও আদর রয়েছে। সেই তুলনায় বিজ্ঞানী বা পেশাজীবীদের মধ্যে অন্তত সৌখিন পুরাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, হতে উৎসাহী অনেক কম দেখা যায়। হয়তো বিজ্ঞানীরা এসবে উৎসাহ বোধ করেন না। অথবা যাঁরা আর্টসের দিক থেকে পেশা হিসেবে বা সৌখিনভাবে মূলত এসবের চর্চাকারী তাঁরা অন্য সংস্কৃতির মানুষকে এর মধ্যে তেমন দেখতে চান্ না। সাহিত্য-সঙ্গীত-নাটক এদিক থেকে বেশি উদার। এসব

কারণ যদি সত্য হয় তাহলে এটি মিশ্র সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য ভালো খবর নয়। তার থেকেও খারাপ খবর হলো উল্টো দিকে এরকম মিশ্র সংস্কৃতির চেষ্টা তার থেকেও অনেক বেশি বিরল; অর্থাৎ সাধারণত মানববিদ্যা নিয়ে থাকা মানুষকে সৌখিনভাবে হলেও কোন বিজ্ঞান, প্রকৌশল বা এমনি কিছুতে মগ্ন হতে খুব কম দেখা যায়। একেবারে যে নাই তা বলা যাবে না, কারণ আমি নিজেই এমন মানুষ দেখেছি যিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক হয়ে বড় আকারের ভবন ডিজাইন ও নির্মাণ, সাধারণ আসবাব ডিজাইন ও নির্মাণ করার মতো কাজেও অসম্ভব উৎসাহ ও মুনশিয়ানা দেখাতেন– যা সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টায়, নিজ আনন্দে শিখে অর্জন করেছেন। আর এটি যে বড় বয়সে কোন প্রয়োজনে জড়িত হয়ে তিনি শিখেছেন তাও নয়; অনেকটা স্বভাবজাতভাবে সম্পূর্ণ আনন্দের কাজ হিসেবে ছোট ছোট সখের উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রাবস্থা থেকে করেছেন। এমনি ধারায় একজন তরুণীকে দেখেছি যে অর্থনীতির ছাত্রী ও এনজিও কর্মী হিসেবে কাজ করলেও তার সব থেকে প্রিয় বিষয় ছিল মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস– এই ব্যাপারে তার খুঁটিনাটি জ্ঞান ও ক্রমাগত আরও জানার চেষ্টা প্রায় গবেষণায় রূপ লাভ করেছিলো। কিন্তু হায় এগুলোকে খুবই ব্যতিক্রমী বলতেই হবে। তবে এসব ব্যতিক্রমগুলো দেখে আমার এমন ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে যদি সায়েন্স বা আর্টসের লেখাপড়া করার সময় থেকেই একই সঙ্গে উভয় দিকের বিভিন্ন বিষয়ে সবাই অন্তত কিছুটা সিক্ত হতে পারতো তাহলে ওরকম উদাহরণ আমরা আমাদের চারিদিকে আরও অসংখ্য দেখতে পেতাম। আর সেটি সি পি স্নো'র সেদিনের দুই সংস্কৃতির আশঙ্কাগুলো এবং আমাদের আজকের আশঙ্কাগুলো অনেকটাই দূর করে দিতো; কাণ্ডারি সংস্কৃতি ও বিশেষজ্ঞ সংস্কৃতি এই দুটি কথার অবতারণাই হয়তো আমাদেরকে করতে হতো না।

কিন্তু এমনি ধরনের মিশ্র-সংস্কৃতি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নিজের সব রকম চর্চার মধ্যেও যথাসম্ভব এই মিশ্রণটিকে ব্যবহার করা, তা হলে কিছুটা হলেও ভিন্ন দ্যোতনা এসে সেই চর্চাকে সমৃদ্ধতর করতে পারবে। আর্টস বা সায়েন্সের সীমানা পেরিয়ে নিজের স্বাভাবিক কাজের বাইরে গিয়ে কিছু অর্জনের উদাহরণ যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যেও কিন্তু এই মিশ্রণের ব্যাপারটি সব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। দুই দিকের দুই চর্চাকে সাধারণত তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা রাখেন; আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আলাদা না রাখলে কোন পক্ষেই যেন সেটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ও চর্চার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট হলো দুই বিষয়ের মধ্যে কোন

উপরিপাতন সৃষ্টি না করা। যেমন পদার্থবিদ্যায় যিনি কাজ করেন তিনি কেমিস্ট্রি-ঘেঁষা বা জীববিদ্যা-ঘেঁষা পদার্থবিদ্যা বড় একটা করেন না– যদিও আজকাল এরকম মিশ্র বিষয়ের জয় জয়কার। আর তা বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের উপরিপাতনেই সব সময় সীমাবদ্ধ থাকে না, তার বাইরেও যায়। কিন্তু আমাদের রীতিতে পদার্থবিদ্যার আলোচনায় কোন নান্দনিকতার, সাহিত্যের বা সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এমনকি উপমা হিসেবেও ব্যবহৃত হয় না, আর উল্‌টোটা হয় আরও কম– যেমন সাহিত্যে জীববিজ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে তাতে মনের ভাব প্রকাশ আরও সুন্দর করা, অথবা মনোবিদ্যার কোন তত্ত্বের ব্যবহার সাহিত্যে করা, সেগুলো অনায়াসে হতেই পারতো।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে সংখ্যাতত্ত্বের একজন প্রফেসর ছিলেন অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ যাঁকে অনেকেই আশকার ইবনে শাইখ বলেও চিনতেন– বিশেষ করে নাটকের জগতের মানুষরা। এই নামে তিনি বহু নাটক লিখেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন; সে সময় দেশে নাট্য চর্চার তিনি একজন দিকপাল ছিলেন। নিজে তাঁর ক্লাস না করলেও বন্ধুদের কাছ থেকে সংখ্যাতত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর শিক্ষার ধরণের কথা জানতাম, আবার অন্য বন্ধুদের কাছ থেকে নাটকের মহড়ায় তাঁর ভূমিকার কথাও শুনেছি। এটি জেনেছি যে তিনি সংখ্যাতত্ত্বের ভেতর কোন সুদূর দিক থেকেও নাটকের কোন প্রসঙ্গ আনতেন না, বা কোন নাটকের সংলাপে বা কাহিনিতে সংখ্যাতাত্ত্বিক কোন জিনিসের কোন ছায়া ফেলেছে এমনটিও হয়নি। এমনকি নাটকের মহড়ায় সংখ্যাতত্ত্বের কোন আড্ডাচ্ছলে উল্লেখও নয়। অথচ দুটি বিষয়ই তাঁর মনের ও চর্চার মধ্যে একেবারে অঙ্গীভূত। অনায়াসেই নানাভাবে এগুলো পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারতো; যেমন বিশ্বের নানা ভাষার যত নাটক তিনি পড়েছেন, দেখেছেন, সেগুলোর যে দৃশ্য পরিস্থিতি ও বাচন ইত্যাদি সংখ্যাতত্ত্বের কিছু বোঝাতে কোন উপমা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আকারে স্বাভাবিকভাবেই আসার কথা। সেভাবে নাটকের সংলাপেও সংখ্যাতত্ত্বের বা তার ব্যবহার-অপব্যবহারের নানা প্রসঙ্গ উঠতেই পারতো– দুটিই যখন তাঁর মাথায় গিজগিজ করছে। কিন্তু সেটি হয়নি। যাঁরা নিজের দুই ভূমিকার মধ্যেই আত্মসচেতন থাকেন, তাঁদের পক্ষে ভূমিকা দুটি মিশিয়ে ফেলাটি স্বাভাবিকভাবে আসে না। সব দিকের বিশেষজ্ঞরাই সাধারণত নিজের মূল বিষয়ে আত্মসচেতন থাকেন– এর মধ্যে সখের বিষয়কে আনতে চান্ না।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম আমি লক্ষ্য করেছি যাঁরা আত্মসচেতন থাকেননা তাঁদের মধ্যে, যেমন যে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদেরকে এমনকি নানা পেশায় থাকা বয়স্কদেরকেও আমি স্বতস্ফুর্তভাবে বিজ্ঞানে উৎসাহ নিতে

দেখেছি– লেখা পড়তে, বক্তৃতা শুনতে, বিজ্ঞান ক্লাবে কাজ করতে। তা ছাড়া তাঁদের মত অনেককে পরে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমেও বিজ্ঞানে আগ্রহী হতে দেখেছি। আনুষ্ঠানিক আগ্রহ নয় বলে নানা বিষয়ের পটভূমিতে বিজ্ঞানকে দেখা তাঁদের পক্ষে সহজ হয়েছে– যেমন বিজ্ঞান ক্লাবে সামাজিক সমস্যার সমাধানে তার ব্যবহার। অনানুষ্ঠানিক চর্চায় আত্মসচেতন থাকেননি বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। সিপি স্নোর নিজের দেশ বৃটেনসহ অন্যান্য অনেক দেশে বিশেষজ্ঞরাও এখন নিজের বিষয়ে একাধিক বিষয়কে সম্ভবমত যুক্ত করতে অভ্যস্ত হয়েছেন, কখনো বাধ্যও হয়েছেন। এর কারণ নিজের কাজ যে দিকেই থাকুক সেখানকার বিশেষজ্ঞদের জন্য সার্বিক সমস্যা-সমাধানটিই প্রায়শ বড় হয়ে ওঠে– এবং তা করতে গিয়ে সব অস্ত্রই প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের দেশেও আমি এমন কাউকে কাউকে দেখেছি– আমার শিক্ষক বা সহকর্মীদের মধ্যেই দেখেছি। আমি নিজেও চেষ্টা করেছি আমার আগ্রহের ও সৌখিন চর্চার সব বিষয়কেও বিজ্ঞান-আলোচনার সঙ্গে প্রয়োজনে মেলাতে, এবং আমার জানা বিজ্ঞানকেও নানা দিকের বিষয়ে ব্যবহার করতে। তাতে কোন অসুবিধা দেখিনি; বরং তাতে আমার তাৎক্ষণিক সমস্যা-সমাধান সহজ হয়েছে। যেমন সম্প্রতি আমার 'শিকড়' নামের বইয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ওখানকার প্রাচীন নাবিকদের (খালাসি) প্রসঙ্গে দেখলাম ওই নাবিকদের বড় কাজ ও বাহাদুরি হলো পাল-তোলা বিশাল জাহাজকে হাওয়ার বিপরীতে নিয়ে যাওয়া। এভাবে বিপরীতে যাওয়ার বিজ্ঞানটি সহজ ভাষায় তুলে না ধরে এর পরিচয় কীভাবে দেয়া যাবে তা আমি ভেবে পাইনি। কাজেই সেটিই করতে হয়েছে। তবে এটি করা আমাদের সচরাচর সংস্কৃতির অংশ নয়। কোভিড-১৯ এর মত মহা দুর্যোগ এই সমস্যা-সমাধানটিকে নাটকীয়ভাবে সামনে এনেছে। এখানে যিনি অর্থনীতি রক্ষায় কাজ করছেন তাঁকেও তীব্র দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে ভাইরাসের মতিগতি কোন্‌দিকে যাচ্ছে তার ওপরও; আবার যিনি ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাচ্ছেন তাঁকেও দ্রুত বেশি সংখ্যক মানুষকে টিকার আওতায় আনার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর সঙ্গে তাল মেলাতে হচ্ছে। সব ক্ষেত্রে এভাবে সমস্যা-সমাধানকে আজকাল প্রায়ই বহুমাত্রিক হতে হচ্ছে। আমাদের দেশে আমরা কাণ্ডারির সংস্কৃতি ও বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতিকে যতক্ষণ অক্ষুণ্ন রাখবো, আর্টস-সায়েন্সের মাঝখানে দেয়াল ভাঙ্গবো না, ততদিন কোন পক্ষই সার্বিক সমস্যা সমাধানে সত্যিকারভাবে কার্যকর হতে পারবে না।

শিশুর নাম সম্ভাবনা

শিশু কাহিনি

জন্ম থেকে ঝোঁকঃ

'ভাসিয়া ও কাতিয়া দুই ভাই-বোন। তাদের একটি বেড়াল। বসন্তের সময় বেড়ালটি হারিয়ে গেল। সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করল দুটিতে, কিন্তু পেল না। একদিন গোলাঘরের কাছে খেলছে, শোনে মাথার ওপর কে যেন মিউ মিউ করছে ক্ষীণ স্বরে। ভাসিয়া সিড়ি বেয়ে উঠল গোলার ওপরে। নিচে দাঁড়িয়ে কাতিয়া কেবলই জিজ্ঞেস করছিল, পেয়েছিস, পেলি'?

এটি লেভ টলষ্টয়ের লেখা 'শিশু কাহিনির' একটি গল্প, অনুবাদ ননী ভৌমিক, গল্পটির নাম বেড়ালছানা, পাতায় পাতায় সুন্দর ছবিতে ভরা এই বই থেকে একেবারে অভিনয় করার মত করে পড়তে হতো আমার চার বছরের ছেলে কুশলের জন্য। অভিনয়ে সেও অংশ নিত বিশেষ করে কাতিয়ার উদ্বেগ ভরা জিজ্ঞাসার অংশটি 'পেয়েছিস, পেলি', এখনো কানে বাজে। কারণ ওটি ছিল আমাদের দু'জনের জন্যই খুবই আনন্দের কিছু মুহূর্ত। শৈশবের সব অভিজ্ঞতা হবার কথা আনন্দের– যা যে কোন অজুহাতে ঝরনার পানির মতো বেরিয়ে আসবে। এর নামইতো শিশু। যদি ন্যূনতম পরিবেশটুকু পায় যে কোন জায়গার যে কোন শিশু ও সময় আনন্দে থাকে, আর তার মধ্যে যত রকমের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে সেগুলো সাজানো গুছানো হতে থাকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাওয়ার জন্য।

আমি নিজে যখন শিশু, তখনো শিশুদের নিয়ে কাটিয়েছি, তাদের দেখাশুনাও করেছি– আমার ছোট ভাইদের। আমার থেকে বছর খানেকের ছোট বোন এতে আমার সহযোগী– বাকিরা ছোট, আমরা এই পুরো দঙ্গল প্রায়ই চট্টগ্রাম শহরের বক্সীরহাট থেকে খুব ভোরে বের হয়ে পরীর পাহাড়ের (কোর্ট বিল্ডিং-এর পাহাড়) চারিদিকে পুরো ঘুরে আসতাম। ভোরের শান্ত শহরের অনেক কিছুই আনন্দ দিতো বটে, তবে সব থেকে বড় আনন্দ হতো চল্‌তে চল্‌তে ওই ছোটদের সঙ্গে খুনসুটি করা, বিশেষ করে যাকে মামুলি একটি প্রাম ঠেলাগাড়িতে ঠেলে নিয়ে যেতাম সেই

সর্বকনিষ্ঠটির সঙ্গে, এক বছরেরও নিচে যার বয়স। শিশুদের ভাবসাব দেখা আমার ওখানই শেষ হতো না, আমাদের দোকানের সামনে বারান্দায় ভিখারিনীর বাচ্চাগুলোর দিকেও নজর থাকতো। তাদের মা মানুষের কাছে যতই কাতর মুখ করুক না কেন, বাচ্চাগুলোর হাসি আর লাফঝাঁপের কমতি হতো না; মায়ের ওই নিশ্চিন্ত সান্নিধ্যে থাকা শিশু বলে কথা। তার বহু বহু দিন পর বয়স্ক আমি যখন ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে ফুটপাথে অথবা ফ্লাই-ওভারের নিচে রীতিমত একটি সংসারকে লক্ষ্য করেছি, দেখেছি ওই চরম অসুবিধার কিছুই শিশুগুলোকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করছে না। তারা যথারীতি হাসি আর লুটোপুটির খেলার মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এরা এখানেও পরিবারের মনোযোগ পাচ্ছে, আদর পাচ্ছে; যে কোন শিশুর জন্য এইটুকু খুব প্রয়োজন।

নবজাতকের সত্যিকারের লালন পালন যাকে বলে তার কিছুটা যখন নিজের ছেলের কারণে শিখতে হলো তখন বইয়ের শরণাপন্ন হলাম। বেঞ্জামিন স্পকের নাম তখন অনেকের কাছে শুনেছি– ঢাকায় নিউ মার্কেটেও তাঁর বই পাওয়া যেত। এই মার্কিন শিশু-তত্ত্ববিদ ইতোমধ্যে প্রায় এক প্রজন্মের মানুষের শিশু পালন রীতিনীতি বদলে দেবার উপক্রম করেছেন। উন্নত দেশের মা-বাবারা বিশেষজ্ঞদের কথামতো সেই আমলে খুব নিয়মতান্ত্রিকভাবে মেপে মেপে শিশুর সঙ্গে আচরণ করতেন– প্রথম থেকেই শিশুকে অনেকটা সময় একা থাকার অভ্যাস করাতে হবে; কাঁদলেই ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নেয়া যাবে না, সময়ের বাইরে দুধ দেয়া যাবে না, এগুলো করলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে; ইত্যাদি। স্পক এসে সব বদলে দিয়েছিলেন। আমরা আমাদের দেশে যা করে থাকি মোটামুটি সেরকম পরামর্শই তিনি দিচ্ছিলেন– কাঁদলেই মনোযোগ দিতে হবে, যতবার ক্ষিধে পাবে খাওয়াতে হবে, বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে, একটু বড় হলেও শাসন করা যাবে না, আদর করেই বোঝাতে হবে।

স্পকের পরামর্শগুলো গ্রহণযোগ্য হতে পারার একটি কারণ হলো ওসময় দীর্ঘকালীন ট্যাবুলা রাসা তত্ত্বটি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। ল্যাটিন ভাষায় ট্যাবুলা রাসা কথাটির অর্থ হলো পরিষ্কার স্লেট; যা বলতে চেয়েছিলো সব শিশু শুরুতে নিজস্ব কোন পক্ষপাত বা অভ্যাসবিহীনভাবে একেবারে পরিষ্কার থাকে, তারপর পরিবারে, পরিমণ্ডলে, সমাজে, নানা জনের হাত পড়ে, তাদের প্রভাবে ওদের নানা আচরণ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তাই নবজাতককে মোটামুটি নরম কাদার মত মনে করে বাইরের সবাই তাকে নানা দিকে গড়ে তুলতে পারে– এমনই ছিল তত্ত্বটি। জন্মের

পর থেকেই শৃঙ্খলার মধ্যে রাখলেই শিশুকে যে কোন শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা যাবে, সেটিই হবে আখেরে তার জন্য ভালো– এমনই ছিল ধারণা। এই ধারণা বাতিল হয়ে গেছে জেনেটিক্স বা বংশগতি-বিদ্যার সাম্প্রতিক বিশাল অগ্রগতির ফলে। আগে বাবা-মা'রা অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা জানলেও এখন বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত হলো যে শিশু পরিষ্কার স্লেট নয়, জন্মের সময়ই সে বংশগতভাবে পাওয়া নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা, সক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে আসে– যা ভাইবোনদের মধ্যেও স্পষ্টত আলাদা হতে পারে। একেবারে সাম্প্রতিক জেনেটিক্স গবেষণা, বিশেষ করে হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট থেকে যে সমৃদ্ধ সব তথ্য এসেছে তাতে এও দেখা যাচ্ছে যে শিশুর একেবারে প্রথম দিকের বছরগুলোতে মায়ের এবং পুরো পরিবারের সস্নেহ সান্নিধ্য অত্যন্ত জরুরি। ওই নিয়ে আসা ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতাগুলোর বিকাশের জন্য এ সান্নিধ্য ছাড়া চলে না। এর অভাব ঘটলে তার খেসারত এই শিশুকে তার দেহ-মনের স্বাস্থ্যের দিক থেকে হয়তো সারা জীবন দিতে হবে। বলতে গেলে এদিক থেকে ওই সময়টি একটি সংকটকাল। তাই দোকানের বারান্দায় বা ফ্লাইওভারের নিচেও যেই পারিবারিক সান্নিধ্য ও স্ফুর্তি শিশুর মধ্যে দেখেছি, ওইটুকুর কারণে তারা যে এখনো বহুদূর যেতে পারে তা পরে দেখবো।

শিশু যে গোড়া থেকেই নানা প্রবণতা নিয়ে আসে এবং তার নানান ঝোঁক খুব ছোটবেলাতেই আলাদা হয়ে ওঠে তা একটু লক্ষ্য করলে নিজের পরিবারেই যে কেউ দেখবেন। জেনেটিক্স একেবারে ডিএনএ'র মধ্যে ঢুকে এই ব্যাপারটিই বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছে মাত্র। পরিবারে যথেষ্ট হৈচৈ সত্ত্বেও দেখা যায় যে একটি বাচ্চা আপন মনে থাকে, অথচ আরেকটি খুবই মিশুক– সবার সঙ্গেই। এমনিতরো কয়েক মাস বয়স থেকেই শিশুর বহু ব্যক্তিত্ব-বিচিত্রা আমাদের চোখ এড়াবার কথা নয়। আমার বৃহত্তর পরিবারে লক্ষ্য করেছি এক ভাইপো হেঁটে বাগানে বেড়াবার মত বড় হবার পর থেকেই রীতিমত একজন প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে স্যাঁতসেতে হয়ে থাকা বাগানের নানা গাছ বেয়ে ওঠা ছোট ছোট শামুকগুলোর দিকে গভীর পর্যবেক্ষণে অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে– নির্জীব মনে হওয়া খোলস থেকে কেমন নরম অংশ বের হয়ে অতি ধীরে গাছ বেয়ে ওঠে পেছনে জলীয় রেখা সৃষ্টি করে। তা ছাড়া মুরগির ডিম পাড়া, তা দেয়া ইত্যাদিতেও তার দারুণ উৎসাহ। বড় হয়ে পেশায় সে প্রকৃতিবিদ হয়নি হয়েছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ও পরে খনিজ তেলের সৃষ্ট দূষণ বিশেষজ্ঞ। আমার বিশ্বাস সব কাজে অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-প্রেম তাকে কোন না কোন

ভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে– যদিও সেটির বিকাশ অনুসরণ করাটি আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পেশায় জীববিদ হয়েছে তার বড় বোন। সে যখন অর্থপূর্ণ একটি শব্দও উচ্চারণ করতে শেখেনি, তখনই কোথাও টিকটিকি ডেকে ওঠলে সে সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে তার জবাব দিতো তাক্, তাক্, তাক ... বলে। তারপর নিজে সদ্য কথা বলা শেখার অল্প কিছুদিন পর তাকে দেখতাম বাসার বারান্দার সিড়ির ধাপে বসে থাকা ভিখারিনীর ছোট্ট ছেলেটির একেবারে পাশে বসে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতে– ওই বাচ্চার মা যখন গেছে নানা ফ্ল্যাটে ভিক্ষা করতে। এসব বিরল আচরণ নিশ্চয়ই তার মধ্যে নিহিত ছিল, পরে এই অনুরাগই জীববিদ্যায় উৎসাহ পরিণত হয়েছে।

কাজেই বেঞ্জামিন স্পকের কথাই ঠিক, জেনেটিক্স তা দেখিয়ে দিয়েছে বলা যায়। আমাদের সেকেলে বাবা-মায়েরাই ঠিক কাজ করেছেন– শিশুর জন্য শাসনের প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত শৃঙ্খলা তৈরির দরকার নেই; দরকার শুধু আনন্দময় পরিবারের, ও সম্ভব হলে সুন্দর ঝোঁকগুলোকে উৎসাহ যোগাবার।

সব গোষ্ঠিতে সম্ভাবনার একই লটারিঃ

জন্ম থেকেই শিশুর ওই যে নানা ব্যক্তিত্বে, নানা সক্ষমতায় ও ঝোঁকে এক এক জনের এক এক রকম হওয়া– এ সব বংশগতভাবে বাবা-মার কাছ থেকে পেয়েছে ডিএনএ বা জিনের মাধ্যমে। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে একই বাবা মা'র কাছ থেকে পেয়েও সেগুলো বেশ কিছুটা ভিন্ন হতে পারছে। এর নানা কারণ। বাবা মা'র থেকে যে জিন পাচ্ছি তার কোনটি বাবার থেকে আবার কোনটি মায়ের থেকে পাচ্ছি, গড়পড়তা প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫০% পেলেও তাতে বহু রকম মিশ্রণ সম্ভব। তারপর বাবা-মার অনেক জিন তাঁদের নিজেদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ এগুলো তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের থেকে পেয়ে বহন করেছেন বটে কিন্তু নিজেরা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এরকম কোনটি কোনটির ক্ষেত্রে হয়েছে, কত প্রজন্ম সুপ্ত ছিল, তারও অনিশ্চয়তা অনেক। আরও বড় কথা বাবা-মার জনন কোষ যেখানে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ে শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ তৈরির সময় তার ক্রোমোজমের প্রত্যেকটি জোড়ার দুই ক্রোমোজোম পরস্পর মুখোমুখি হয় এবং উভয়ের মধ্যে জিনের অনেক ভাঙ্গা-গড়া ও বিনিময় হয়। তাসের একটি প্যাককে বার বার অনেকবার ইতস্তত শাফল করে তাস খেলুড়েদের মধ্যে বাটার সময় কে কী কী তাস পাবে তাতে যে

রকম নানা রকম বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, জিনের গঠনেও ওই ভাঙ্গাগড়ার ফলে অসংখ্য নানা রকম সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। এভাবে একই জনের এক এক ডিম্বকোষে থাকে এক এক গুচ্ছ বৈশিষ্ট, তেমনি প্রত্যেকটি শুক্রকোষের এক এক গুচ্ছ বৈশিষ্ট। সব মিলে এ যেন এক মহা-লটারি– কে কোনটি পাচ্ছে একেবারে দৈব ব্যাপার।

ওই মহা-লটারির আরও দুর্দান্ত সব ফলের কথা জানতে পারলাম যখন এই শতাব্দীর শুরু থেকে হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের উদ্ঘাটনগুলো ঘটতে লাগলো। দেখা গেলো প্রায় সব মানুষের মধ্যে জিন-সমগ্র বলতে গেলে প্রায় একই রকম। সব গোষ্ঠির সিংহভাগ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতা দুনিয়ার অন্য সব মানুষের মত স্বাভাবিক মাঝারি ধরণের। খুব আলাদা রকমের কিছু বেশি দেখা যায় না। কিন্তু সব জনসংখ্যায় স্বল্প ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এর কোন কোন দিক কমবেশি ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে– যেমন ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতা, প্রকাশের সুন্দর ক্ষমতা, গাণিতিক বিশ্লেষণের ব্যতিক্রমী ক্ষমতা, এমনকি গণিত সৃষ্টির অন্তর্দৃষ্টি, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, স্বভাবজাত সঙ্গীত প্রতিভা ইত্যাদি নানা কিছু। এগুলো আবার সামান্য ব্যতিক্রমী থেকে অনেক বেশি ব্যতিক্রমী হতে পারে। উল্টো দিকের জন্যও কথাটি সত্য– স্বল্প ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এসব স্বাভাবিকের থেকে কম থাকে, অল্প কম বা বেশি কম। লটারির মত ঘটা যে কোন ক্ষেত্রে এমনটিই হবার কথা, সম্ভাবনার নিয়মে নানা কিছু এভাবে বণ্টিত হওয়াটাকে বলা হয় স্বাভাবিক বণ্টন (নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন)।

এখন আমরা নিশ্চিত বলতে পারি ব্যক্তিত্ব, সক্ষমতা, মেধা, সৃজনশীলতা, গাণিতিক ক্ষমতা ইত্যাদি যে কোন দিক থেকে সব গোষ্ঠির সব সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থা একই– মাঝারি। তেমনি ওই বণ্টনে কমবেশি প্রতিভাশীলদের অনুপাত সব গোষ্ঠিতে একই রকম, পিছিয়ে থাকাদের অনুপাতও। তার মানে মানবতার মহা-লটারিতে পৃথিবীজোড়া মানুষ অতীতের একই মিশ্রণ থেকে এসেছে বলে এখানে লটারির গড়পড়তা বণ্টন সর্বত্র এক। ধনী উন্নত সমাজে, শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর সমাজে, দরিদ্র অনগ্রসর সমাজে, এমনকি একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা সুদূর কোন দুর্গম জায়গার মানুষের মধ্যেও এই বণ্টন এক। তা হলে আমরা সাহিত্যের বা বিজ্ঞানের চর্চায় প্রতিভাবানদের সংখ্যা সব জায়গায় সমানভাবে দেখি না কেন, বিশেষ ধরণের দেশেই কেন তাদের সংখ্যাধিক্য? এর উত্তর হলো জন্মগতভাবে সক্ষমতা থাকলেই তা বিকশিত হবে বা প্রকাশিত হবে এমন কোন কথা নেই। আধুনিক জেনেটিক্স গবেষণাই বলে দিচ্ছে এই বিকশিত

বা প্রকাশিত হবার জন্য প্রথমত কিছু ন্যূনতম শর্ত পালন প্রয়োজন, এবং তারপরও যে রকম প্রকাশ আমরা আশা করছি বিশ্বের যে কোন আঙ্গিনায়, তার উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে থাকতে হবে। তবে আশার কথা হলো ওই শর্তগুলো মারাত্মক কোন ব্যাপার নয়, অপেক্ষাকৃত সহজেই তা পূরণ হওয়া সম্ভব। আর পূরণ যদি হয় তাহলে সেই জেনেটিক লটারিতে পাওয়া ক্ষমতাগুলো যেন প্রকাশিত হবার জন্য শুধুই আঁকুপাঁকু করে, কেমন করে জানি তা সব প্রতিকূলতা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিবেশের কিছুটাও যদি পায়, অথবা যদি এক পরিবেশ থেকে আরেক ভালো পরিবেশে চলে যাওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে ওখানে সত্যিই ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

জেনোম প্রজেক্টের আগে যে অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রেও এভাবে ফুঁড়ে বেরুবার অনেক ঘটনা জানা ছিলনা তা নয়, অভিজ্ঞতা থেকে ঠিকই জানা ছিল। কিন্তু তখন অনেকেই তাকে কাকতালীয় বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো। নানা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির মধ্যে সহজাত উচ্চ সক্ষমতা দেখতে পেলে, এমনকি উচ্চ প্রতিভার সাক্ষাত পেলেও সেগুলোকে একটি 'দুর্ঘটনার' মত ভাবতে ভালোবাসতো অনেকে। ওই শর্তপূরণের অভাবে অথবা উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশের অভাবে এমনিতেই এসব অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল। তাই দুর্ঘটনা বলা সহজ হয়েছে। ওভাবেই সৃষ্টি হয়েছিলো বর্ণবাদ, লিঙ্গবাদ, হোয়াইট সুপ্রিমেসি ইত্যাদি। ওই বাস্তবে বিরল হবার ব্যাপারটি এখন আর সেভাবে সত্য নয়, ওই ন্যূনতম শর্তপূরণ ও পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারটি দুনিয়ার দেশে দেশে ক্রমাগত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জনগোষ্ঠির স্বাভাবিক জেনেটিক বণ্টনটি বাস্তবে বেরিয়ে আসতে পারছে বেশি। তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী সুবিধা-ভোগীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়েও দাঁড়াচ্ছে। তারপরও যে বর্ণবাদ ইত্যাদি যে কমেনি সেটি অভ্যাসের এবং সুযোগ-সন্ধানী চরিত্রের ব্যাপার। হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু সেই ন্যূনতম শর্তগুলো কী? উপযুক্ত পরিবেশটাই বা কী?

শিশুর সংকট-সময়ঃ

আধুনিক জেনেটিক্স গবেষণা একটি বিরাট কাজ করেছে যা এখনো সবাইকে যথেষ্ট পরিমাণে নাড়া দেয়নি, দেয়াটি খুবই আবশ্যক। এটি ওই ন্যূনতম শর্তগুলো খুঁজে বের করেছে, মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া সক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করতে পারার শর্ত। এটি হলো একেবারেই গোড়ায় শিশুর কিছু

সংকট-সময় ভালোভাবে পার হওয়া। আশ্চর্যজনক খবর হলো এই সংকট-সময়ের সবচেয়ে বড় সংকটটি থাকে জন্মের আগে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন পুরো সময়টিতে। এ সময় একটি কোষ থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হবার পালা, আর শিশু সম্পূর্ণভাবে বন্ধনে থাকে মায়ের সঙ্গে– মায়ের পুষ্টির থেকে তাকে নিজের বাড়ার সকল পুষ্টি উপদান তো সংগ্রহ করতেই হয়, আরও বড় কথা হলো মায়ের শারীরিক ও মানসিক ভালোমন্দের প্রত্যেকটি বিষয় নানা রাসায়নিক সিগন্যালের মাধ্যমে শিশুর কাছে চলে যায় এবং তার গঠনে, বিশেষ করে তার মস্তিষ্ক গঠনে, দারুণ প্রভাব রাখে। কাজেই মায়ের পরিস্থিতিটিই শিশুর সংকটে পরিণত হতে পারে। তবে মা যদি স্বাভাবিক পুষ্টি পায়, অন্তত তাকে অনাহারের মত অবস্থায় না থাকতে হয়, আর স্বাভাবিক জীবনে মোটামুটি হাসিখুশিতে থাকে তা হলে শিশু অনায়াসে এই সংকট অতিক্রম করে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার সকল জেনেটিক সম্ভাবনা অন্তত জন্মকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে।

মা ও শিশু এই দুটি শব্দ এক সঙ্গে শুনে, তাদের দৃশ্য এক সঙ্গে দেখে আমাদেরও সব সময়ের ধারণা তাদের মঙ্গল এক সূত্রে গাঁথা; তবে তা যে গর্ভকালীন সময়ে আরও বেশি সত্য এটি বোধ হয় আমরা বুঝতে পারতাম না। সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে গর্ভধারণ কালীন সময়ে মায়ের অনাহার অথবা তার শারীরিক ও মানসিক চাপের প্রভাব শিশুর ওপর গুরুতর হতে পারে। মায়ের নির্যাতন, আতঙ্ক, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি অথবা গুরুতর শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য ইত্যাদি গর্ভে শিশুর গঠন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সাধারণত গর্ভে শিশুর গঠন নিয়ন্ত্রিত হয় বাবা-মা থেকে পাওয়া, প্রোগ্রাম করা জিনের মাধ্যমে। ওতেই থাকে কীভাবে শিশু ধাপে ধাপে একটি কোষ থেকে, বহু কোষে ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণাঙ্গ হবে তার সব নির্ধারিত নির্দেশনা। সমস্যা দেখা দেয় যখন মায়ের ওই প্রতিকূল অবস্থাগুলো গর্ভের শিশুর স্বাভাবিক জিনের কোন প্রকাশকে থামিয়ে দেয় বা অন্য দিকে প্রবাহিত করে। মায়ের থেকে কিছু সিগন্যাল শিশুর প্রতি কোষের মধ্যে জিনের প্রতিবেশে কিছু কিছু বিষময় রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টি করে সেগুলোর প্রভাবে এই কাণ্ডগুলো ঘটায়। এই প্রভাব জেনেটিক নয়, তার অতিরিক্ত বাইরের কিছু; তাই একে বলা হয় এপিজেনেটিক। যে শিশুর মস্তিষ্ক গঠন এভাবে বাধাগ্রস্ত হলো তাতে ওখানে স্বাভাবিকভাবে থাকা স্নায়ু বর্তনীতে যে রদবদল ঘটে তার মধ্যে একটি সময়ও বেঁধে দেয়া থাকে। তাই রদবদলের বিরূপ ফলটি তাৎক্ষণিকভাবে নাও ঘটতে পারে, জন্মের পর বহুকাল পর্যন্ত তার সব কিছু স্বাভাবিকও থাকতে পারে। তারপর ওই বেঁধে

দেয়া সময়ে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ঘটা শুরু হয়– ওই শিশু বয়স্ক হওয়ার পর সেই নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তার মধ্যে শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

এই বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে এসেছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর শুরু হওয়া একটি গবেষণা থেকে। ১৯৪৪ সালের শীতে হল্যান্ডে মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে একদল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গর্ভবতী নারীদের ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে ছিলো এই গবেষণা। একজন গর্ভবতী নারীর পুষ্টি প্রয়োজনীয়তা সেখানে অন্তত ২০০০ কিলোক্যালোরি হওয়া উচিত সেখানে ওই নারীদের ক্ষেত্রে এটি গড়পড়তা ১০০০ কিলোক্যালোরিতে নেমে এসেছিল। যুদ্ধের পর এই দুর্ভিক্ষাবস্থা কেটে গিয়েছিলো, কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানদের ওপর ইতোমধ্যে যা ঘটে গেছে তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য জন্মের পর থেকে ওদের স্বাস্থ্যের পরিমাপ নিয়মিত করা হয়েছে। নানা বয়সে গিয়ে তাদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়ার মত বিভক্ত ব্যক্তিত্বের মানসিক অসুখ স্বাভাবিকের অন্তত দ্বিগুণ সংখ্যায় দেখা গেছে। গর্ভে থাকাকালীন মায়ের অনাহারজনিত শারীরিক ও মানসিক চাপের ফলেই এমনটি ঘটেছে এটি নিশ্চিত।

পরের আরও বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে শুধু অনাহার নয়, মায়ের মানসিক উৎকণ্ঠা, অতি বিষণ্নতা ইত্যাদি মানসিক অবস্থাও গর্ভস্থ শিশুর কাছে মায়ের রাসায়নিক সিগন্যালের সঙ্গে কিছু বিষময় দ্রব্য পাঠিয়ে দেয় যা পরে সন্তানের মধ্যে বৈকল্য সৃষ্টি করে। প্রাণি-গবেষণাতে প্রাণি-মায়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে গর্ভস্থ বাচ্চার মস্তিষ্কের ওপর তার প্রভাব লক্ষ্য করা হয়েছে, এবং সেভাবে ব্যাপারটিকে অনেক খুঁটিনাটিতে জানা গেছে। অন্যদিকে গর্ভাবস্থার মা'রা যখন ওরকম কোন অসুখ নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন, জন্মের পর তাঁদের সন্তানদের স্বাস্থ্য অনুসরণ করে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। যেমন প্রচণ্ড শোকজনিত কারণে, দুর্ঘটনা, অতি-বিষণ্নতা, মানসিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে ভোগা মায়েদের শিশুর বহু বিপত্তি দেখা দিতে পারে। তাদের অটিজম, বুদ্ধিতে পিছিয়ে থাকা; এবং পুরো বাল্য ও কৈশোর কাল জুড়ে মনোযোগহীনতা, অতি-সক্রিয়তা, বিভক্ত ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির ঘটনা সাধারণ জনসংখ্যায় যে হারে দেখা যায় তার থেকে অনেক বেশি দেখা গেছে। শারীরিক অসুখের প্রবণতাও বেড়েছে– যেমন হার্টের ও কিডনির রোগ।

আমাদের দেশের দিকে তাকালে দেখবো এমন ঘটনা অনেক মায়ের ক্ষেত্রে এটি নিত্যকার জীবনের অংশ। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কিশোরী

কর্মসূচির কাজ করতে গিয়ে যৌতুক ও অন্যান্য অজুহাতে গর্ভবতী মহিলাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অনেক ঘটনা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয়েছে। বাল্যবিবাহের শিকার এমন অনেক কিশোরী যখন গর্ভবতী হয়েছে তখন তার ওপর প্রচণ্ড চাপটি সহজে অনুমেয়। এমন কিশোরী বা অল্প বয়স্ক তরুণী যখন গর্ভের সন্তান নিয়ে বাবা-মার কাছে ফেরৎ আসে তখন তার অপমান, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা এসব চরম রূপ নেয়। পারিবারিক নির্যাতনের যেখানে আধিক্য সেখানে গর্ভবতীর ওপরও নির্যাতনের আধিক্য। তার ওপর অর্ধাহার ইত্যাদির চাপ থাকলে তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। এখন বোঝা যাচ্ছে অসংখ্য অনাগত শিশুর জন্যও এসব চরম দুঃসংবাদ বয়ে আনে। বাহ্যিক নির্যাতন না ঘটলেও অনেক গর্ভবতী মহিলা অবহেলা, দারিদ্র, সাংসারিক অশান্তি ইত্যাদিতে অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে থাকেন। সেগুলোও শিশুর জন্য ক্ষতিকর। আজকাল গর্ভবতী মা'দের শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রামগঞ্জেও মা ও শিশু কেন্দ্রে রয়েছে। এর সঙ্গে যেটি খুব দরকার তা হলো তারা কোন রকম মানসিক যাতনা বা চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কিনা উপযুক্ত জেণ্ডার-কর্মীর মাধ্যমে তাও দেখা এবং সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদেরকে পরামর্শ দেয়া। নইলে দুনিয়ার সব শিশুর মত লটারিতে পাওয়া শিশুর স্বাভাবিক জেনেটিক গুণগুলো বিকাশের পথে যে শর্তের কথা আমরা জানছি তার সব থেকে বড় শর্তটাই পূরণ হবে না।

বন্যরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে– এই কথাটি মায়ের কোলে শিশুর চিত্রটি সুন্দর শুধু এই অর্থে নিলেই চল্‌বে না, এর গুরুত্ব অনেক সুদূর-প্রসারী। কারণ আমরা শিশুর যে সংকট উত্তরণ সময়ের কথা বলেছি জন্ম গ্রহণের পরেই তা শেষ হয়ে যায় না, এর পর পর বেশ কিছু দিনও মায়ের অবস্থার সঙ্গে শিশুর বিকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে। জন্মের পর পর একেবারে শুরুতে শিশুকে মায়ের কোলে তো থাকতেই হবে, সেই সঙ্গে মাকে হতে হবে চাপহীন, যন্ত্রণাহীন, আনন্দোচ্ছল। গর্ভাবস্থার মত নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ না থাকলেও, ওই একই বিজ্ঞান বলছে শিশু তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে মায়ের কাছ থেকে এক রকম মানসিক সিগন্যালে তার সেই চাপ, সেই যন্ত্রণা গ্রহণ করে এবং এর প্রতিক্রিয়া তার ওপর হয়। তবে এখানে একটি ব্যতিক্রম হলো প্রয়োজনে অন্য কেউও সে সময় মায়ের ভূমিকায় আসতে পারে, বাবা অথবা অন্য যে কোন যত্নকারী যদি মায়ের মতই যত্নে সন্তানকে আগলে রাখেন। শিশু তখন তাঁর থেকেই সেই সিগন্যালগুলো গ্রহণ করে, তাঁর মধ্যে চাপ আছে কি নেই তারই সিগন্যাল।

গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ ভোগ করেছেন এমন মায়ের ক্ষেত্রে শিশু জন্মের পরও সেই চাপ যদি চল্‌তে থাকে তা হলে শিশুর মস্তিষ্কে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াটিও তখনো চলতে থাকে। ভবিষ্যতের জন্য শিশুর ঝুঁকি বাড়তে থাকে; মায়ের ভোগান্তি তার আগে শেষ হলে, এই বাড়াটি অন্তত আর হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু প্রযুক্তি এটি উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। আজকাল যেকোন উন্নত হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য যে এম আর আই যন্ত্র (ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং) সেটিই এ কাজ চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু এতে বাইরে থেকে মস্তিষ্ককে স্ক্যান করার ব্যবস্থা থাকে, ফলে ঘন ঘন এমন পরীক্ষায় এমনকি শিশু-মস্তিষ্কেরও কোন ক্ষতি হয় না। এভাবে বিষণ্নতায় বা এরকম ক্ষতিকর কোন বৈকল্যে ভোগা মায়ের নবজাতকের স্ক্যানে মস্তিষ্কের নিচের দিকে থাকা হোয়াইট ম্যাটারে ঘাটতি দেখা যায়। যদিও স্নায়ুবর্তনীগুলো ওপরের দিকের গ্রে ম্যাটারে গঠিত হয়, হোয়াইট ম্যাটারের ঘাটতি সেখানে গুরুতর সমস্যা ঘটাতে পারে। ঘুমন্ত শিশুর মাথার এমআরআই স্ক্যান করে এসব বোঝা গেছে; মাথাকে নড়াচড়া না করতে দেয়ার জন্যই ঘুমন্ত শিশুর স্ক্যান। দেখা গেছে যে সব মা গর্ভাবস্থার ২৮ থেকে ৩৫ সপ্তার মধ্যে অতি-বিষণ্নতায় ভূগছেন তাঁদের সন্তানের মস্তিষ্কের হোয়াইট ম্যাটারের গঠনে বেশ কিছুদিন ধরে ঘাটতি চলতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে মানব শিশুর মস্তিষ্ক জন্মের পরেও অনেকদিন ধরে গঠিত হতে থাকে। শিশু জন্মের পর দু মাস পর্যন্ত মায়ের বিষণ্নতার প্রভাব ওই গর্ভাবস্থার মতই হোয়াইট ও গ্রে ম্যাটার গঠনের ওপর চলতে থাকে যার প্রভাব শিশুর দশ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক গঠনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। কাজেই ওই দুই মাসও মাকে বিষণ্নতা, মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখা শিশুর ভবিষ্যতের জন্য খুব জরুরি। গর্ভাবস্থার পুরোটা সময় এবং জন্মের পর আরও অন্তত দুমাস মা ভালো থাকাটির প্রশ্ন শিশুর পরবর্তী পুরো জীবনের জন্য সব চাইতে সংকটের অবস্থা সৃষ্টি করে। এই সংকট থেকে উত্তরণ করে শিশুর সকল সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করতে পারার একটিই শর্ত, তা হলো মাকে ভালো থাকতে হবে। যে কোন জাতি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে যে বিনিয়োগ করতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বিনিয়োগ হলো মাকে শারীরিক-মানসিক সুরক্ষা দেয়া। সব রকম যন্ত্রণা থেকে এই সুরক্ষা দেয়াটি আর্থিক সহায়তা দেয়া থেকে শুরু করে যাতনাকারীকে বিরত রাখা পর্যন্ত অনেক কিছু হতে পারে।

দু মাস বয়সের পর থেকে এই একই বিষয় পুরো পরিবারে বিস্তৃত হয়, শিশুকে ঘিরে আছে তার এমন পরিবারের। মায়ের দিক থেকে শিশুর কোন

কিছুর অভাব ঘটলেও একটি হাসিখুশি পরিবার তখন সে অভাব অনেকটা পূরণ করতে পারে। আর যে উচ্ছল পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে একজন উচ্ছল মনে থাকা মা তার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। সর্বাধুনিক জেনেটিক্সও এই একই কথা বলছে। জেনেটিক লটারিতে পাওয়া শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও মেধাগুলো যে কোন বিরূপ পরিস্থিতিতেই ফুঁড়ে বেরুতে পারে যদি শিশুর জীবনের প্রথম বছর দশেক ন্যূনতম একটি পারিবারিক আবহের মধ্যে সে থাকতে পারে। পরিবারের প্রকৃত অবস্থার উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বয়সে শিশুর আত্মবিশ্বাস কতগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে মাপার ব্যবস্থা করে এ সম্পর্কে কিছু সাধারণ মডেল খাড়া করা হয়েছে। এগুলো বলে দিচ্ছে যে জীবনের প্রথম পাঁচ-ছয় বছরের পারিবারিক হাসিখুশি, আন্তরিক আদর-যত্ন, মা-বাবার স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক, খাওয়ার কষ্ট বা চরম দারিদ্রের অনুপস্থিতি, মায়ের বিষণ্নতা-মানসিক কষ্ট ইত্যাদির অনুপস্থিতি, এরকম ক'টা জিনিস নিশ্চিত হলে এমনকি সুবিধা-বঞ্চিত টানাটানির সংসারে বড় হয়েও কৈশোর এবং তারুণ্যে পৌঁছানোর পরও শিশুটির আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে। এই আত্মবিশ্বাসের জোরে জেনেটিক বণ্টনের লটারিতে পাওয়া ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতাকে ব্যবহারের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার থাকবে। কিন্তু ওই ক'বছরের জন্যও ওরকম একটি ন্যূনতম অবস্থার পরিবারেও বড় হবার সুযোগ যদি তার না থাকে, সে যদি অনিচ্ছুক ও হৃদয়হীন আত্মীয়ের মধ্যে বড় হয়, সে যদি পথশিশু হয়ে পড়ে, এমনকি কোন অনাথাশ্রমে তার মতো অনেকের সঙ্গে যত্নের মধ্যেও থাকে, এই সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতা সহজে ছন্দ তখন খুঁজে পাবে না। প্রয়োজন অন্তরঙ্গ পরিবারের, অন্য কিছুর নয়।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সরকার তার একটি ঐতিহাসিক অপরাধের জন্য সেদেশের আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। অপরাধটি হলো ওদেরকে 'আধুনিক' করার জন্য গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে আদিবাসীদের হাজার হাজার শিশুকে সরকারি তত্ত্বাবধানে নিয়ে গিয়েছিলো জোর করে তাদের পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে। সেই শিশুদের পরবর্তী অবস্থাই বলে দিয়েছিলো এমন কাজের ফল কখনো ভালো হয় না। অনেকটা একই রকম অপরাধের জন্য আরও সম্প্রতি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও সেখানকার ক্যাথোলিক চার্চ সে দেশের আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এই অপরাধও সংগঠিত হয়েছিলো প্রায় একই সময়ে একই ভাবে, যার উদ্ঘাটনটি হয়েছে আরও হৃদয়-বিদারকভাবে। নিজেদের পরিবার ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের অভাবে অতি-বিষণ্ন হয়ে এবং ক্যাথোলিক বোর্ডিং স্কুলের নির্মম শারীরিক ও

মানসিক নির্যাতনের ফলে তাদের অনেকে মারাও পড়ে। ওই বোর্ডিং স্কুলগুলোর মেঝের নিচে কবর দেয়া এই মৃত শিশুদের হাড় সম্প্রতি আবিষ্কার হওয়াতেই বিষয়টির ভয়াবহতা ধরা পড়েছে। নিজ পরিবারের ও অন্তরঙ্গতার সান্নিধ্য-হারা হলে ছোট শিশু কীভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে এ তারই দলবদ্ধ প্রমাণ।

সারা বাংলায় ব্যক্তিত্ব ও মেধাঃ

প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে যা অনেক সময় তার সাফল্য বা ব্যর্থতার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যক্তিত্ব এত নানা রকম হতে পারে বলে একে মনে করা হয় কয়েকটি মৌলিক উপাদানের নানা অনুপাতের মেশাল হিসেবে। খোলা কী বদ্ধমন, বিবেকের শাসন কতটা, অন্তর্মুখী না বহির্মুখী, অপরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং মানসিক স্থিতিশীলতা এই পাঁচটি উপাদানের কোনটি কম কোনটি বেশি নিয়ে গড়া একটি মিশ্রণ হিসেবে। উপাদানগুলো প্রত্যেকে স্বাধীন, কোনটি কোনটির ওপর নির্ভর করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মিশ্রণটি কতটা বংশগতভাবে জিনের মাধ্যমে ঠিক হয়, আর কতটা বাইরের প্রভাবে ঘটে। গবেষণায় যা বোঝা গেছে অন্যান্য অনেক কিছুর তুলনায় ব্যক্তিত্ব গঠনে জিনের প্রভাবটাই বেশি। কাজেই জিন-লটারির নিয়মে এই ব্যক্তিত্বের বণ্টনটিও একই রকম স্বাভাবিক বণ্টন হওয়ার কথা। অন্য সব জনগোষ্ঠির মত বাংলাদেশেও মানুষের মধ্যে ওই নানা ব্যক্তিত্ব দেখা যাবে। এরমধ্যে খোলা মন, বিবেক সংযত, বহির্মুখী, গ্রহণযোগ্য এবং মানসিক স্থিতিশীল মানুষ কার্যক্ষেত্রে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে, তার বিপরীত রকম মিশ্রণ হলে তা থাকবে না। এর সবই বংশগতভাবে সেই লটারির বণ্টনে নানাজন না ভাবে পায়, এই পাওয়াটাকে ইচ্ছে করলেই উড়িয়ে দেয়া যাবে না, এর একটি প্রভাব থাকেই। তবে তার ভালোমন্দ প্রকাশটি শৈশবে ওই সংকটকালীন সময়ের মায়ের ও পরিবারের পরিস্থিতির ওপরও খুবই নির্ভর করবে।

এখন জেনেটিক ও এপিজেনেটিক গবেষণা বল্‌ছে ওই পরিস্থিতি অন্তত ন্যূনতমভাবেও ইতিবাচক থাকলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক পথে এগুবে। ধরা যাক দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ ব্যক্তিত্বের বণ্টনের মধ্যে খারাপ দিকটাই বেশি পেয়েছে– মানসিক স্থিতিশীলতা, বিবেকের শাসন, অপরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার উপাদান সবই কম এসেছে। এই শিশুও যদি মায়ের স্বাচ্ছন্দ্য ও হাসিখুশি পরিবারের কারণে ওই সংকটকাল নির্বিঘ্নে পার হতে পারে তা হলে এমন অসুবিধাজনক ব্যক্তিত্বটিও তার অন্যান্য সক্ষমতাকে

বেশি আচ্ছন্ন করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাকে পরিবারচ্যুত হয়ে পথশিশুর পর্যায়ে চলে যেতে হয়, তাহলে সেখানকার পরিবার-স্নেহবিহীন, সুরক্ষাবিহীন, তীব্র টানাপোড়েনের পরিবেশে ওই একই বংশগত ব্যক্তিত্বই তাকে বিপদে ফেলতে পারে। যে কোন এক পর্যায়ে তার জীবন বিভক্ত ব্যক্তিত্ব, মানসিক বৈকল্য এমন কী অপরাধ-প্রবণতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। এটি না হবার জন্য শুরুতে পুরো বাল্যকালে পরিবার থাকাটি প্রয়োজন। এর জন্য ধনী, সুখী, বা শিক্ষিত পরিবারের প্রয়োজন নেই মোটামুটি আদর-যত্নের হাসিখুশি একটি পরিবার হলেই চল্‌বে, অন্তত জীবনের প্রথম বার-চৌদ্দ বছর।

অন্যদিকে যদি মেধাবী হবার বিষয়ে আসি, গবেষণায় দেখা পেয়ে যে এর ওপরেও বংশগত এই জেনেটিক লটারি অনেকটা কাজ করে, ব্যক্তিত্বের থেকে কিছুটা কম হলেও। বাকিটুকু আসে পরিবারে লেখাপড়া বা মেধা চর্চাটি কতখানি, এর প্রতি উৎসাহটি কতখানি, ওই চর্চার সুযোগ নিজের পরিবেশে ন্যূনতম কতখানি রয়েছে তার ওপর। কিন্তু ওই জেনেটিক বণ্টনটি এখানেও লটারির মত সর্বত্র মাঝারি মেধাবী, উচ্চ মেধাবী, অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী এ সবের স্বাভাবিক বণ্টনে দেখা দেয় বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ের শিশুদের মধ্যেও ওই একই পরিমাণে ও একই অনুপাতে, যে ভাবে সারা দুনিয়ার সর্বত্র সব শিশুদের মধ্যে বণ্টিত আছে। আজ যখন আমাদের দেশের সব জায়গায় লেখাপড়ার কদর বেড়েছে, এমনকি যে পরিবারে আগের প্রজন্মে কেউ লেখাপড়া করেনি তারাও সুযোগ পাচ্ছে, ও তা গ্রহণ করছে। তাই সেই স্বাভাবিক জেনেটিক মেধাগুলো আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত হওয়া শুরু করেছে, স্কুল ইত্যাদি কাছেই পাওয়াতে। যদি এই কদর ও এই পরিবেশ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সমানভাবে থাকতো তা হলে সব মেধাই এখানেও সেভাবেই প্রকাশিত হতে পারতো। এখনো আমাদের ঘাটতি ওখানেই, মেধায় নয়।

তবে আরও গোড়ার প্রশ্ন হলো আমাদের সেই শিশুটি তার সংকট কালীন সময়টি ভালোমতো উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা– গর্ভে থাকার সময়টি এবং তারপর হাসিখুশি যত্নের পরিবারে বাল্যকালটি কাটাবার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও ন্যূনতম ভালো হওয়াটাই জরুরি। গর্ভকালীন সময়ে মাকে বরাবরের মত খাটনির কাজ করতে হয়েছিলো কি না, তার ঘরটির সাধারণ বাঁশের বেড়ার তৈরি না ইটের তৈরি এসব এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, মা তিন বেলা পেট ভরে খেতে পেয়েছে, সুস্থ ছিল, পরিবারের সবাই এই গর্ভবতী মায়ের দিকে খেয়াল রেখেছে, কোন মানসিক অশান্তি ছিলনা– ওইটুকুই যথেষ্ট। এর

থেকে অনেক ভালো হলে সেটি সৌভাগ্যজনক, তবে তাতে বড় হয়ে শিশুর মেধা বিকাশের শর্ত পূরণে কিছু এসে যাবে না। কাজেই ন্যূনতম শর্ত পূরণের পর মা যদি বাড়তি ধনী বা সুখী হয় তাতে শিশুর মেধা বিকাশে বাড়তি তেমন কিছু হবে না, যদিও তাতে মা ও শিশুর জীবন অনেক সহজ হবে, শিক্ষার উপকরণ হয়তো ভালো হবে।

শিশু জন্মের পর অন্তত প্রথম চার পাঁচ বছর পরিবারে সবার মধ্যে হাসিখুশিতে ছিল কিনা সে প্রশ্নেও একই কথা। ধনী পরিবার হবার দরকার নেই, ন্যূনতম স্বচ্ছন্দ, শান্তির পরিবার হলেই হবে। তবে আমাদের দেশে এখনো অসংখ্য শিশুরওই সৌভাগ্যটুকুও হয় না। সর্বত্র পথশিশুদের দেখে, অসংখ্য শিশুকে পরিবারের সংস্পর্শহীন থেকে বিপজ্জনক শিশুশ্রম দিতে দেখে, শিশু নির্যাতনের নানা রূপ দেখে যে কেউ সেটি বুঝতে পারবেন। এর ফল একটিই– ওই শর্ত পূরণের অভাবে তাদের স্বাভাবিক মেধার বিকাশ ঘটতে পারে না। কোন না কোন শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য সূক্ষ্মভাবে হলেও কৈশোরে বা তারুণ্যে দেখা দিয়ে তাতে বাধ সাধে, এমনকি মোটামুটি শিক্ষার সুযোগের মধ্যেও থাকলেও। আর পরিস্থিতিগুলো এমন যে শিক্ষার সে সুযোগও এক্ষেত্রে সহজে আসেনা– বিশেষভাবে পথশিশু বা পরিবার সংস্পর্শহীন শিশুশ্রমের শিশু হলে। উন্নত অনেক দেশে প্রায় সব শিশুরই শুধু ন্যূনতম নয় বরং যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ, সমৃদ্ধ ও আরামদায়ক পারিবারিক পরিবেশ থাকে; কাজেই সেখানে যে জেনেটিক লটারিতে যেই মেধা পেয়েছে ঠিক সেটিই তার ক্ষেত্রে বাস্তবে দেখি। স্বাভাবিক বণ্টনটিই সেখানে ফুটে উঠে, যেটি আমাদের ক্ষেত্রে উঠে না।

শিশুকে অন্তত ছোটবেলায় একেবারে পথে নেমে এসে এরকম ভাগ্যের সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সেজন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন এসবের পক্ষ থেকে নেয়া হয়, কিছু সরকারিভাবেও নেয়া হয়। সেটি হলো কিছু পথশিশুদের জন্য হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে, পরিত্যক্ত শিশু বা অসহায় শিশুদেরকেও অনাথাশ্রমে রেখে, সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করে, যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বড় করে তোলা। এতে অনেকে যত্নকারী, বন্ধু, আশ্রয়, সবই হয়তো পায়; শিক্ষা ও কাজেরও এক রকম ব্যবস্থা হয়; কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয় না। শৈশবের ওই সংকটের সময়টিতে নিজের পরিবারের সুরক্ষায় ও হাসিখুশির নিশ্চিন্ত মানসিক অবস্থায় না থাকাতে ওই শর্ত তারা তখনো পূরণ করতে পারে না। ওই হোস্টেলের মত ব্যবস্থা, নিরানন্দ এমনকি অনিচ্ছুক আত্মীয়ের পরিবারে আশ্রয়, তার পরিবারের বিকল্প হতে পারে না। তাই বাহ্যত সবকিছুর মধ্য

দিয়ে গিয়েও, শিক্ষার ভেতরে থেকেও, তাদের জেনেটিক মেধা পুরো বিকশিত না হবার আশঙ্কা থেকে যায়। নারী ও শিশুদের দারিদ্র ও নির্যাতন কমার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটিও হয়তো একদিন কমে যাবে। কিন্তু ইতোমধ্যে যারা দারিদ্র সত্ত্বেও পরিবারের আদর-যত্ন-পরিবেশ পাচ্ছে তাদের পক্ষে শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পেলেই আশ্চর্য রকম মেধা প্রকাশের সুযোগ থাকছে, আবার অন্যদের এইটুকুর অভাবে অতটা সৌভাগ্য হচ্ছে না, মেধা থাকা সত্ত্বেও।

বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি; আমার কাছে মনে হয়েছে পরিবারহীন শিশুকে অন্য আগ্রহী ও আদরের পরিবারের অঙ্গাঙ্গিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নিলেই এর সব থেকে আদর্শ সমাধান হতে। এমন উদাহরণ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও কম নয়। একটি পরিত্যক্ত বাচ্চাকে, বিশেষ করে পরিত্যক্ত নবজাতককে, হাসপাতালে বা পুলিশের কাছে নেয়া হলে বহু সংখ্যক স্বামী-স্ত্রী তাকে পালক নেবার আগ্রহ প্রকাশ করে। এটিই মানুষের স্বাভাবিক আকুতি কারো কারো নিজের পরিবারে আরও বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও। অনেক সময় দেখি হাসপাতালেই ডাক্তার-নার্স কিংবা পুলিশ অফিসের অনেকেই মায়া ভরে বাচ্চাটিকে পালক নিতে চান। আমি নিজে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে বহু শিশুকে নতুন পরিবারে দারুণ আদরে চমৎকারভাবে বেড়ে উঠতে দেখেছি। অনেক বাংলাদেশী ছেলেমেয়ে বিদেশি পরিবারে পালক নেবার ফলে ওখানে একেবারে অঙ্গীভূত হয়ে বড় হয়েছে। এরকম কারো কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে নানা দেশে, কখনো ঘটনাচক্রে, আবার কখনো পরিবারের আগ্রহে। মনে হয়েছে কত সুন্দরভাবে পরিবারহীনতার সমস্যার সমাধান হতে পারে, এতে শিশুটি যেমন পরিবার পেয়েছে, বিকাশের সুযোগ পেয়েছে, তেমনি পালক নেয়া পরিবারটিও নিজেদেরকে আরও সুখী অনুভব করেছে। সারা দুনিয়ার এরকম বহু পরিবারহীন শিশুর জন্যই এটিই হতে পারে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে, নিজস্ব মেধায় সিক্ত হয়ে এগুবার একটি ভালো বিকল্প।

কিন্তু এর পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক পাচার চক্র (ট্রাফিকিং) এবং আধুনিক দাস-প্রথা যা আগেকার দিনের মত প্রকাশ্যে নয়, অতি সুকৌশলে মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখে, অনেককে বহু বছর ধরে হয়তো জীবনভর। এগুলোর হোতারা প্রভাব, সম্পদ ও প্রযুক্তির দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী। মানব পাচারের একটি বড় অংশই হচ্ছে শিশুপাচার, এবং তা প্রায়ই পালক নেবার নাম করেই ঘটে থাকে। এতে পালক নেবার পুরো ব্যাপারটিতে দারুণ সন্দেহ সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি

ভারতে যখন কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও মৃত্যু ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তখন বাবা ও মা উভয়কে হারিয়ে অনেক শিশু হঠাৎ এতিম হয়ে পড়েছিলো। তাদেরকে পালক নেবার জন্য অনেক মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু পাচারকারীদের অনুপ্রবেশের ভয়ে এই ক্ষেত্রে পালক নেয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। পুরো বিশ্বকে একযোগে এর সমাধান করতে হবে, মানব পাচারকারী ও আধুনিক দাস-প্রথার হোতাদেরকে পরাজিত করতে হবে। এরকম একটি বড় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে জড়িত হতে পেরে খুব সম্প্রতি আমি বুঝতে পেরেছি সমস্যাটি কত ব্যাপক। চেষ্টাটি করা হয়েছিলো দুনিয়ার বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে যাঁরা ওই শক্তিশালী হোতাদের হাতে অসহায়ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অত্যন্ত বিব্রত। দুনিয়ার কয়েকটি বড় বড় শহরে গিয়ে আন্তর্জাতিক টিমের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ জগতের কিছুটা জেনেছি। ওই হোতারা বড় বড় ব্যবসা কোম্পানি সেজে কাজ করে এবং প্রায়শ সম্পূর্ণ বৈধ অতি বড় ও বিখ্যাত আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো ওদের অবৈধ ওই দাস-প্রথার ও পাচারের সহায়ক হয়ে পড়ে– যেমন সস্তায় আমদানি সামগ্রী পাওয়ার জন্য ওই দাসদের তৈরি সামগ্রী আমদানি করে। এসব এই কোম্পানিগুলোর জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উভয় ভাবে ঘটে থাকে। এর অন্ধিসন্ধি বের করে সবাইকে সচেতন করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে। ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সুকৌশলে এসবকে উদ্ঘাটন করে তাদেরকে এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাটি ওই চক্রকে দমন করার একটি উপায় হতে পারে। প্রত্যেকটি শিশুকে পরিবারে রেখে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকা সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বে ও মেধায় অভিষিক্ত করতে গেলে এরকম বাধাগুলোকে অতিক্রম করে গিয়েই তা করতে হবে। অন্তত আমরা এখন জানি ওভাবে অভিষিক্ত করার মানে কী, এবং তার মৌলিক শর্তগুলো কী। শর্তপূরণে অনেক সমস্যার সমাধান গোড়াতেই করে ফেলা যায়– যেমন মায়ের প্রতি, পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিয়ে। আবার অনেক কিছুর জন্য বিশ্বজোড়া সমঝোতায় একযোগে কাজ করারও প্রয়োজন রয়েছে।

আনন্দ শিক্ষা

খেলতে খেলতে কল্পনাঃ

আমরা যখন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে বেশ কিছু গ্রামে মৌলিক বিদ্যালয় স্থাপন করলাম, তখন উদ্দেশ্য ছিল স্কুলের বয়স হয়ে যাওয়ার

পরও যারা নানা কারণে স্কুলের লেখাপড়ায় নেই তাদের জন্য বিকল্প একটি স্কুলের ব্যবস্থা করা। যে সব কারণে ওরা স্কুলে নেই যে কারণগুলো ওখানে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো– যেমন যে সব জিনিসে তাদের আনন্দ ও উৎসাহ সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের জীবনের সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে, ইত্যাদি। ওরাতো এই স্কুলে আসলোই, কিন্তু একই সঙ্গে একেবারে চার পাঁচ বছরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও চলে এলো- যাদের জন্য আমরা পরিকল্পনা করিনি। ওদের বাড়ির কাছেই আমাদের স্কুল, ওখানে যা যা হচ্ছিলো সে সবের মধ্যে ওরা আনন্দ পাচ্ছিলো, তাই চলে এসেছিলো; যথারীতি দলবলে বসেও গিয়েছিলো বড় ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। শুরুতে যথারীতি এসেম্বলিতে সারিতে দাঁড়িয়ে যাওয়া, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, ব্যায়াম করা এসবে ওরাই আগে অভ্যস্ত হলো উৎসাহের চোটে। ক্লাসের ভেতরে বড়দের যা হচ্ছে তাতেও তাদের উৎসাহ আর বাইরে চুম্বক, আয়না ইত্যাদি নিয়ে খেলতে খেলতে যে বিজ্ঞান শেখা চলে তাতে তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে মায়েরা এসে দেখে যেতো, তাতে তারা আরও উৎসাহ পেত। শেষ পর্যন্ত ওদেরকে আমাদের স্কুলে নিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে হয়েছে, আলাদা ব্যবস্থা করে। ওরাই বুঝিয়ে দিল শিক্ষার শুরু এখান থেকেই করতে হবে, আর আনন্দই হতে হবে শিক্ষার একেবারে মৌলিক উপাদান। শিক্ষাকে যে আনন্দ হতে হবে সেই মূলমন্ত্রটি পরে বড় ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরও সমান ভাবে কাজ করল।

ছোট শিশুর জন্য আনন্দ ও শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ করতে চাওয়া একেবারেই নিরর্থক। ওই যে দেখেছি পরিবার হাসিখুশি থাকাটি শিশুর স্বাভাবিক জেনেটিক ক্ষমতাগুলো বিকশিত হবার শর্ত, সেই আনন্দই কিন্তু তার প্রতিটি প্রথম শেখার প্রেরণা। শিশুর এসময় কাজই হলো আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখে সবকিছু স্পঞ্জের মত শুষে নেয়া–ওভাবেই শিখে মনোযোগ দিতে, অন্যের কথা শুনতে, অন্যকে অনুকরণ করতে, অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তাদের সঙ্গে কিছু ভাগ করে নিতে, অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কার করতে। তা ছাড়া তারা ভালোবাসে নানা জিনিস নানা ক্রমে সাজাতে, একই রকম জিনিস এক একটি দলভুক্ত করতে, নানা কিছু নাম ধরে চিনতে, এমন কি আঁকতে, লিখতে, পড়তে– এ সবই শুধু খেলা আর খেলা, অথচ সবই আবার শেখা আর শেখা। এসব পরিবারেই ঘটতে থাকে একভাবে বাবা মা ভাই বোনদের সহায়তায়। তবে ওই আমাদের মৌলিক বিদ্যালয়ের মত আয়োজন থাকলে সেটি আরও সুন্দরভাবে হতে পারে।

বড়দের অনুকরণ করাটা একেবারে ছোট শিশুর মজারই অংশ, ভাবখানা যেন আমিও এটি করতে পারি– বড়দের ওই ভঙ্গিতে হাঁটা, বই পড়া, কম্পিউটারে কাজ করা, নামাজ পড়া; যা কিছু দেখে তাই সে হুবহু করতে চায়। তিন চার বছর পর্যন্ত নিজের শরীরকে এবং ঘরে-বাইরের যা কিছুতে হাত দেয়া যায় তাকে ব্যবহার করেই চলে তার খেলা অর্থাৎ শেখা– খেলনা, চিরুণি, কলম, বই, আকর্ষণীয় ফল বা সব্জি সবকিছু। সে এগুলোর ব্যবহার বড়দের কাছে দেখেছে, ওরকম একটি ব্যবহার নিজেও করতে চায়, নিজের কাছে নিয়ে এসে। কিন্তু মোটামুটি বছর তিনেক বয়সের পর পর এই খেলায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এখন খেলার যে কোন জিনিসকে সে অন্য জিনিসের রূপ দিতে পারে তার কল্পনায়, কোন কিছুকে আসল জিনিস হতে হয় না, হঠাৎ করে খুলে যায় তার কল্পনা রাজ্য। আগের মত সত্যিকার জগতে যেমন থাকতে পারে তেমনি সে অনেকটা সময় কল্পনা রাজ্যেও বিচরণ করতে পারে। আমার ছেলে কুশলের ক্ষেত্রে আমি এটি দীর্ঘদিন লক্ষ্য করেছি। আমাদের বাসার সামনে মাঠে একটি ট্রাক প্রায়ই আসা যাওয়া করতো, বাসার সামনেও দাঁড়াতো। নানা রকম শব্দ করে ট্রাকটি যেভাবে স্টার্ট নিতো, চলতো, ব্রেইক কষতো এসব তার মাথার মধ্যে ঢুকে ছিলো। তাই ওটি যতক্ষণ থাকতোনা তখন সে যে কোন একটা কিছুকে মেঝেতে ঠেলে ঠেলে ওই রকম শব্দ মুখে করতো আর জিনিসটার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতো– ওই সময় ওটিই তার ট্রাক। তার হাতে আরও সুন্দর হতো প্রায়ই যে আমরা ট্রেনে চট্টগ্রাম যাওয়া আসা করতাম সেই ট্রেনটি। এ ভ্রমণ থেকে বাড়িতে ফিরেই সে লম্বা একটি ট্রেন বানিয়ে তাকে জিগ জিগ শব্দ তুলে ঠেলে চালাবার চেষ্টা করতো– যতটা লম্বা করলে চালানো অসম্ভব হয়ে উঠতোনা ততটাই লম্বা করার চেষ্টা করতো; এ জন্য ট্রেনের বগি হিসেবে তাকে একের পেছনে আরেক সম্ভাব্য সব জিনিসই ব্যবহার করতে হতো– স্যান্ডেলের বা জুতার পাটি, ছোট বাক্স, তার খেলনা, হাতের কাছে সুবিধামত যাই পেতো। এগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটির যে কোন মিল নেই তাতে তার কিছু এসে যেতো না। একবার তৈরির পর দীর্ঘ সময় সে এর পেছনে লেগে থাকতো। এ বয়সের সব শিশু এমনিভাবে কল্পনায় সাহায্য নিয়ে খেলতে পারে, উপভোগ করতে পারে। বাইরের দিকে তাকাবার এবং সে সবকে নিজের মধ্যে আনার ক্ষেত্রে এটি তার একটি নতুন সক্ষমতা।

এর সামান্য কিছু পর আরও একটি পরিবর্তন আসে খেলায়– এখন সে এসব খেলার একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি পছন্দ করে। কোন একটি

জায়গাকে সে কল্পনায় অন্যভাবে ব্যবহার কতে চায় যেমন একটি দোকান, একটি চলন্ত বাস, একটি রান্নাঘর, একটি ক্লাস, বা নাচা গাওয়ার একটি রঙ্গমঞ্চই। এ যেন তার একটি খেলাঘর, সেটি অবশ্য মাঝে মাঝে তার চরিত্র বদলাতে পারে। যতক্ষণ এটি একটি দোকান ততক্ষণ তাতে বিকিকিনি, যতক্ষণ একটি রান্নাঘর ততক্ষণ রান্না বান্না চলে। ও সময় যদি যে কোন রকম নার্সারি জাতীয় স্কুলে যায় তা হলে স্কুলটাও হতে পারে তার স্থায়ী মঞ্চ। এসব কিছুর মধ্যে বাড়িতে ভাই-বোন, বাবা-মা, খেলার সঙ্গীরা আর স্কুলে সহপাঠীরা, শিক্ষকরা তাকে অন্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সুযোগ দেয়, যাদেরকেও তার কল্পনার ও রঙ্গমঞ্চের ভাগীদার করতে পারে।

এই সব কিছুর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়– খেলা, অনুকরণ, কল্পনা, যাই করুক না কেন কোন ধরাছোঁয়ার মত বস্তু তার সামনে থাকতে হয় যার মাধ্যমে সে তা করে। কিন্তু ছয় সাত বছর বয়সের পর একটি সময় এসে ওরকম কিছু সামনে না থাকলেও সে তা কল্পনা করতে পারে। তখন কল্পনার জন্য একটি জিনিসের বদলে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজনই হয় না, শুধু মাথার মধ্যে একটি চিন্তাই সেই একই কাজ করতে পারে। সে ওটি মনশ্চক্ষে দেখতে পায়। এভাবে মনশ্চক্ষে দেখার ক্ষমতা এবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষারও দুয়ার খুলে দেয়। ওই মনশ্চক্ষে আনন্দের জিনিসগুলো দেখার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা থাকলে শিক্ষাটি ওভাবেই শিশুর কাছে আসে। কবিতার কথা, গল্পের কথা, দেশ-বিদেশের কথা, বিজ্ঞানের কথা এ সবের মধ্যে যে এখন বিচরণ করতে পারে। এতদিন যা হয়েছে এটি তারই ধারাবাহিকতার আরেকটি পদক্ষেপ মাত্র। আগেরগুলো যেমন খেলা, যেমন আনন্দ, যেমন নিজের ভেতর থেকে উৎসারিত, এও তেমনি, আলাদা কিছু নয়। কাজেই সে যখন পড়ছে, শুনছে, ছবি দেখছে, অংক করছে প্রত্যেকটি চিন্তার মধ্যে তাকে একটি পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায়। আগের ওই আনন্দ শিক্ষার মূল প্রেরণাই তাকে এখানেও চালিত করার কথা। আগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক সেভাবে সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতা হিসেবে ছিলেন, এখনো তিনি সেভাবে থাকার কথা। কিন্তু তার বদলে যদি শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা নিয়ে আসেন, নির্দেশনা দিয়ে দিয়ে শেখান, মুখস্থ করান, পদে পদে পরীক্ষা নেন তা হলে ওই আনন্দ শিক্ষার ছন্দ-পতন হয়, ওটি এখন আর বরাবরের মত নিজের থেকে উৎসারিত হয় না।

আনন্দের স্কুল, অগ্নি-পরীক্ষার নয়ঃ

এক ভাবে চিন্তা করলে পুরো স্কুল শিক্ষাটাই শৈশব কৈশোরের আনন্দ শিক্ষার অংশ, নিজের কল্পনা-আশ্রয়ী নিরবিচ্ছিন্ন খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করা– সাহিত্যে, অংকে, বিজ্ঞানে। তার ফলশ্রুতিতে আনন্দ সৃষ্টি হওয়াটি বড় কথা, প্রচুর আনন্দ– লিখে আনন্দ, পড়ে আনন্দ, অংক করে আনন্দ, জেনে আনন্দ, জ্ঞানকে মনে মনে সাজিয়ে আনন্দ। অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা একে শুধু ব্যাহতই করে, অতিরিক্ত সেনাসদৃশ শৃঙ্খলাও। কিন্তু আমাদের সিস্টেমের বড় কথাই হলো এই আনুষ্ঠানিকতা ও এই শৃঙ্খলাকে অতিরিক্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং মনে করা হয় যে তার মধ্যেই দ্রুত উচ্চ জ্ঞান অর্জিত হবে, জীবনের নানা বিষয়ে অনেকটা অগ্নি-পরীক্ষার মত কঠিন দীক্ষা হবে। যাকে যত ভালো স্কুল বলি, আনুষ্ঠানিকতা ও শৃঙ্খলা তাতে তত বেশি। কিন্তু প্রাথমিক ছাড়িয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদির দিকে তারা যতই এগুতে থাকে কিশোর-কিশোরীর সহায়তাও পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে, তবে ওই অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা ও মন্ত্র পাঠের মত শৃঙ্খলা নয়। ওরা একই ভাবে আনন্দ-প্রেরণাতে এগুবে সেটিই তাদেরকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করবে।

এ বিষয়ে আমাদের সীমিত সম্পদকে কিন্তু আমরা সঠিক দিকে কেন্দ্রীভূত করিনি, আনন্দ-শিক্ষাকে উৎসাহিত করার দিকেই তা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গেছে শিক্ষার কেতাবি ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। উন্নত দেশে ওরকমই ছিল, কিন্তু তারা এর থেকে সরে এসে আনন্দের ভাগটি অক্ষুণ্ন রেখেই এখন বাকি কাজ করেছে। যেহেতু তাদের সম্পদ বেশি তারা ওটি করেও বাইরে এক ধরণের আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে পেরেছে– যেমন কেতাদুরস্ত বিদ্যালয় ভবন, বিদ্যালয়ের ব্যয়বহুল বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, ল্যাবোরেটরি, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। আমরা বহিরঙ্গনের এই আনুষ্ঠানিকতাকে অনুকরণের চেষ্টা করছি, কিন্তু এর অন্তরঙ্গনের মূল শক্তি সেই স্বতস্ফূর্ত আনন্দে শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার দিকটি বাদ দিয়ে গেছি। যখন এসব উন্নত দেশের পরামর্শদাতারা এসে আমাদের স্কুল ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে পরামর্শ দেন, অনেক কিছুই দেন যা তাঁদের দেশের স্কুলে এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদির থেকে ধার করার জন্য বরাদ্দ টাকা তাঁরা ভবন, উপকরণ, আনুষ্ঠানিক নানা বিষয়ে বেশি ব্যয়ের পরামর্শ দেন এবং অন্তরঙ্গনের জন্য কম। শিক্ষকের বড় ডিগ্রির অপরিহার্যতা, তাদের জন্য বহু শিক্ষক-প্রশিক্ষণ গুরুত্ব পায়, যাও খুবই আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ– আনন্দ শিক্ষায় ইন্ধন যোগানোটি যার প্রধান

লক্ষ্য নয়। আমাদের সব কিছু পরীক্ষা-কেন্দ্রিক, আনন্দ ও প্রেরণা কেন্দ্রীক নয়। শিক্ষায় পরীক্ষার দরকার আছে, তবে সেটি স্বতস্ফুর্তভাবে ছাত্র যেভাবে এগুচ্ছে তাতে 'ফীডব্যাক' দেয়ার জন্য, যেটি দেখে সে পরের পদক্ষেপটি কোন্‌দিকে নেবে বুঝতে পারে– পড়িমরি করে তার পুরো জীবন নিয়ে বাজি ধরার জন্য পরীক্ষা নয়। বাজি ধরতে হয় বলেই ওটি পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হয়েছে, শিক্ষা কোচিং-এ গিয়ে ঠেকেছে, আনন্দ ও প্রেরণা পালিয়ে গেছে। একবার ভেবে দেখি টলস্টয়ের গল্প নাটকের মত করে শুনতে শুনতে যে ছোট ছেলেটি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে গল্পের কাতিয়ার উদ্বেগে শামিল হচ্ছে 'পেয়েছিস, পেলি?', ওই ছেলেকে যদি বিড়ালছানার জন্য নয়, বরং এর পর এই গল্পের ওপর যে পরীক্ষা নেয়া হবে সেজন্য উদ্বিগ্ন হতে হতো, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতো? তাহলে ওই গল্প শোনার মধ্যে কি কোন প্রাণ থাকতো? এভাবে পরীক্ষা-কেন্দ্রীক শিক্ষা সর্বত্র শিক্ষার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।

পরীক্ষা যতক্ষণ ক্লাসে শিক্ষক-ছাত্রের ব্যাপার হয় তখন তার একটি ভূমিকা থাকে- ওই ফীডব্যাক দেওয়ার মত; কিন্তু এটি যখন শূন্যে ঢিল ছোঁড়ার মত বিশাল অজানা পাবলিক পরীক্ষা হয়, তখনই ওই পরীক্ষার সাধনায় শিক্ষার পুরোটাকে নিয়োজিত করতে হয়। আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে পর পর এরকম পাবলিক পরীক্ষা দেবার সাধনায় ছাত্র-শিক্ষক সবার মনোযোগ নিয়ে নেয়; এবং অভিভাবকরাও ছাত্র যাতে পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় আরও প্রস্তুতি নিতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য বাড়তি ব্যবস্থা করেন– গৃহ-শিক্ষক, দলে পড়ানো, কোচিং ইত্যাদি নানাভাবে। পরীক্ষা নিয়ে এত উদ্বেগের মধ্যে বিষয়ের স্বাদ নেবার অবকাশ কোথায়? এই স্বাদ নেয়ার একটি ভালো ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিলো দেশের স্কুল ব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি আসার পর। পদ্ধতিটিতে শেখাটা অনেকটা ছাত্রের হাতে থাকে– তাকে কিছু বিষয়ে সূত্র দিয়ে দেয়া হয়। ওই সূত্রে থাকা তথ্যগুলো জানতে হয়, তা ছাড়া তা হৃদয়ঙ্গম করার, প্রয়োগ করার, তাকে উচ্চতর চিন্তায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। আমার মনে হয়েছে স্কুল শিক্ষার বিনিয়োগটি এই সৃজনশীল চর্চায় ছাত্র ও শিক্ষকের সক্ষমতা বাড়াতে কেন্দ্রীভূত করলে আমরা অগ্নি-পরীক্ষার স্কুলের বদলে সর্বত্র আনন্দের স্কুল পেতে পারতাম।

আমাদের ওই পরীক্ষা-কেন্দ্রীক স্কুল শিক্ষা, পাবলিক পরীক্ষার অত্যাচার, এবং বিজ্ঞানের মত বিষয় পড়ানো যাবে বা যাবে না তা স্কুলের সামর্থের ওপর নির্ভর করা, ইত্যাদি ঐতিহ্য আমরা এক সময়ে বৃটিশ পদ্ধতি থেকেই পেয়েছিলাম। ইতোমধ্যে জনসংখ্যা, স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র বাড়ায়

আমাদের ক্ষেত্রে ওই অবস্থাটি আরও গুরুতর হয়েছে;আর বৃটেন নিজের দেশে তা অনেক আগেই বদলে ফেলেছে। এই বদলে ফেলাটি ধীরে ধীরে ঘটলেও তার সবচেয়ে নাটকীয় অংশটি কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে– সে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও আগে। তখন সেখানে সরকারি হাইস্কুল ছিল দু'রকমের– গ্রামার স্কুল ও সেকেন্ডারি মডার্ন স্কুল। প্রথমগুলো কুলীন, ঐতিহাসিকভাবে ল্যাটিন ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শুরু হয়েছিলো, তখনো বেছে বেছে পরীক্ষা নিয়ে শুধু মেধাবী ছাত্র ভর্তি করতো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও উচ্চতর পেশায় যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করতো। আশা করা হতো এখানকার সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা সরাসরি উচ্চ পেশায় যাবে। দ্বিতীয়গুলো বাকি সব ছাত্রকে ভর্তি করতো– সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মত বিষয় পড়ানো হতো, তবে বেশির ভাগের জন্য কারিগরি ও সাধারণ পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। ফলে যুগে যুগে যা দাঁড়িয়েছিলো গ্রামার স্কুলে কঠিন ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে শুধু ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই ঢুকতে পারতো। সেকেন্ডারি মডার্নে বাকিরা যেতো, বেশির ভাগই শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার থেকে।

বৃটেনে সে সময় মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যটি অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যেতো। সব দিক থেকে এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিভক্তি হতে পারার একটি বড় অস্ত্র ছিল ১১ বছর বয়সের পরপর সব শিশুকে একটি পাবলিক পরীক্ষা দিতে হওয়া, অনেকটা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পাবলিক পরীক্ষার মত, যেটিকে বলা হতো 'ইলেভেন প্লাস' পরীক্ষা। যারা এতে ভালো করতো তারাই গ্রামার স্কুলে যেতো, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর যারা খারাপ করতো তারা সেকেন্ডারি মডার্নে, তাদের গতি সাধারণত হতো কারিগরি শিক্ষায় অথবা স্কুল পাশ করে সরাসরি পেশায় চলে যাওয়া– অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হতো পরিবারের বড়দের অনুসরণ করে খনিতে বা কারখানায় শ্রমিক-কারিগর হিসেবে। ফলে চিরকাল যা হয়েছে মোটামুটি তাই বজায় থাকতো– ধনী-মধ্যবিত্তরা উচ্চ শিক্ষা; শ্রমিক শ্রেণি শ্রমিকের কাজ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। মাত্র ১১ বছরের একটি ছোট্ট শিশুকে তার সহজাত মেধাগুলো বিকশিত হবার সুযোগ পাওয়ার আগেই এমন একটি পাবলিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে যা তার পুরো ভবিষ্যৎ অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে– একদিকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, অন্যদিকে শ্রমিকের জীবন। প্রবল সমালোচনার মুখে এর সংস্কারের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল।

১৯৬৮ তে আমি যখন ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে গিয়ে এই স্কুলগুলো, এই পরীক্ষা ও এই সমালোচনার বিষয়ে কাছে থেকে খুঁটিনাটিতে জানতে পেরেছি তখন বহুকাল পর হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক দলীয় সরকার কয়েক বছর আগে ক্ষমতায় এসেছে। ফলে অবশেষে ইলেভেন প্লাস পরীক্ষা তখনই উঠে যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব ছাত্র– যার যার এলাকার কমপ্রেহেনসিভ স্কুলে (সব কিছুর সমন্বয়ের স্কুলে) চলে যেতে পারলো কোন ভর্তি পরীক্ষা দেয়া ছাড়াই। গ্রামার স্কুল বা সেকেন্ডারি মডার্ন নামের কোন আলাদা আলাদা স্কুল থাকালোনা– বলতে গেলে সবারই একই সুযোগ, যেদিকে পছন্দ ও সক্ষমতা দেখাবে সেদিকের উচ্চতর শিক্ষা নিতে পারে, বা নাও নিতে পারে। আরও বড় কথা আগেরমত সরকারি অর্থ সুবিধাভোগীদের স্কুল ওই গ্রামার স্কুলে প্রচুর খরচ করা আর মামুলিদের সেকেন্ডারি মডার্নে অনেক কম খরচের সুযোগ রইলোনা; কিছু নাম করা 'ভালো স্কুলের' জন্য, আবাসিক স্কুলের জন্য আমাদের দেশে যা এখনো করা হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী আমরাও আমাদের শহরে গ্রামে সর্বত্র সম্ভাব্য সব একই সুযোগ রেখে মিতব্যয়িতার মধ্যেই সব আয়োজন করতে পারি। তা হলে ওই লটারি বণ্টনে সব জায়গায় সব প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে তারা সবাই উঠে আসতে পারতো।

এটি করতে গেলে যা সবার কাছে স্পষ্ট করতে হবে যে আগাগোড়া স্কুলে চর্চার বিষয়গুলো আসলে খুবই আনন্দের– বিষয়ের নিজের সৌন্দর্যে এগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা। গণিতের মজা যে একবার পেয়েছে সে জানে এর সৌন্দর্যটি কোথায়, ইতিহাসের পাতায় অতীতের এক এক জগতে চলে যাওয়া তো রীতিমত একটি রোমান্স। আর বিজ্ঞান তো আগাগোড়াই মজা, সব কিছুর পেছনে রহস্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার মজা। কোন কোন বিষয়ে যদি বেশি মনোযোগী চিন্তার কসরৎ করতে হয়, তবে সেটিও নিরানন্দ কসরৎ হবে না, তাও ওই বিষয়ের সৌন্দর্যের টানেই হবে। অবশ্য একজন ছাত্রের সহজাত ঝোঁকের ওপর নির্ভর করে কোনটির সৌন্দর্য তার কাছে সহজে ধরা পড়বে, কোনটির হয়তো তত সহজে নয়। সেক্ষেত্রে তাকে যথাসম্ভব সহায়তা দিতে হবে নতুন বিষয়কে আপন করে নিতে। আমি নিজে একাজ করেছি, সাফল্যই আমাকে বলে দিয়েছে এটি খুবই সম্ভব। বাল্যকালের ওই সংকটে তাকে কোনভাবে এগিয়ে নিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারলে এর পর সে নিজের মধ্যে থাকা মেধাতেই এগিয়ে যেতে পারবে, যত প্রতিকূলতাই থাক্।

জীবন শিক্ষা

আপন ভুবনেঃ

শিক্ষাকে ছাত্রের আপন ভুবনে নিয়ে যাওয়া দরকার; ওটাকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাইরের জিনিস হিসেবে রেখে দিলে তা জীবনে প্রতিফলিত হবে না। এটি নির্ভর করে বইয়ের পাতায়, ক্লাসের চর্চায়, যত কিছু আনন্দ-রোমান্স উঠে আসছে তাকে শিক্ষার্থীর আপন ভুবনের চিন্তা ও কাজে আনা যাচ্ছে কিনা তার ওপর। এটি ভেবেই বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের সুবিধা-বঞ্চিত কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দ্বিতীয় সুযোগ দিতে গিয়ে আমরা 'আপন ভুবনের' লক্ষটিকে সামনে এনেছিলাম। সেখানে এর অর্থ হলো যা কিছু পড়ছি, যা কিছু জানছি তাকে নিজের জীবনে টেনে এনে তার আলোকে বিষয়টিকে চিন্তা করা। যেমন পরিবেশ বিজ্ঞানে আমাজন বা কঙ্গোর বাদল বনে (রেইন ফরেস্ট) জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হবার কথা যখন ছাত্ররা পড়ছে তখন নিজেদের গ্রামে কী কী প্রাণী বা উদ্ভিদ এখন আর বেশি দেখা যাচ্ছেনা তা নিয়ে অনুসন্ধান করছে, আলাপ করছে, এ নিয়ে একটি বাস্তব প্রতিবেদন লিখছে। নানা মহাদেশের ভূগোল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ এলাকার ভূগোলটি তারা যদ্দূর পারে খোঁজ খবর করছে, এমনকি একেবারেই নিজ গ্রামের ভূগোল, ইতিহাস অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রাম-বই ওরা রচনা করেছিলো।

শিক্ষার মধ্যে দুটি বিষয়কে আমরা গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলাম যা উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাভাবে রয়েছে, যেগুলো ছাড়া শিক্ষাটি জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রাখতে পারে না। এর একটি হলো শুধু পড়ার নয়, করার ব্যবস্থাও থাকা। আর অন্যটি হলো এর মধ্য থেকে জীবন-দক্ষতাগুলো অর্জন করা। করার কাজগুলো এক এক বিষয়ে এক এক ভাবে আসবে– আপন ভুবনে আনতে গিয়েই তার অনেকগুলো অর্জিত হতে পারে। বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি দিকেই এটি সম্ভব– কিছু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জিনিস দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটি করে দেখা যায় যেমন চুম্বকের আচরণ, বিদ্যুতের আচরণ দেখার কাজ সামান্য ব্যাটারি, চুম্বক, কম্পাস ইত্যাদি দিয়েই হতে পারে। কেমিস্ট্রির কাজ রান্নাঘরে ব্যবহৃত একেবারেই নিরাপদ উপাদান দিয়েই অনেকখানি হতে পারে। স্কুলের বা বাড়ির এলাকাতেই খুঁজে খুঁজে চিনে চিনে বিভিন্ন উদ্ভিদ, যেমন ভেষজ উদ্ভিদ বের করতে পারে, তা একটি জায়গায় লাগিয়ে লতাগুল্মের 'বোটানিক্যাল গার্ডেনও' গড়তে পারে। মূলধারার আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়ও একটি স্কুলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যতখানি পাওয়া যায় তার অতিরিক্ত এভাবে

স্থানীয়ভাবে স্কুল নিজেই সংগ্রহ করতে পারে, যেমন ছাত্রদের কাজের দ্বারা গড়ে তুলতে পারে। অন্যান্য বিষয়েও আমাদের 'আপন ভূবনের' মত কাজ ছাত্রকে তার দেশ, তার সমাজ, তার জীবনকে ওই বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করবে। তাই সাহিত্যের বই থেকে বা অন্যান্য ভালো রচনা থেকে পড়া তার জন্য শিক্ষণীয় হবে বটে, কিন্তু সে যখন নিজের কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের ভাষায় লিখবে, নিজে নানা উপমা বা নানা উদাহরণ উল্লেখ করবে, তখন তার করাটাই মুখ্য হয়ে উঠবে।

ওভাবে করতে করতেই জীবন-দক্ষতাগুলো গড়ে উঠবে। ভাষার ওপর দক্ষতা এমনি একটি জরুরি জীবন-দক্ষতা। যেমন ইংরেজি শিক্ষার অর্থ সীমিত কিছু বিষয়ে যেমন পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে কে কদ্দূর পারে তাই দেখা নয়। বরং ভাষাটি সে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারছে কি না, ইচ্ছেমত এ ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে পারছে কি না, নানা রকম বিষয় পড়ে বুঝতে পারে কি না, তাও চর্চার এবং পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় ইংরেজি পরীক্ষায় খুব ভালো করে আসা ছাত্রকেও বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার একেবারে না করতে পারার উদাহরণ প্রচুর; যেমন উচ্চ শিক্ষার ইংরেজি মাধ্যমে গিয়ে একেবারে বিকল হয়ে পড়তেও দেখা যাচ্ছে। বিষয়টিতে জীবন-দক্ষতা হিসেবে না নেয়ারই ফল এটি। এই বিষয়ে একটি অন্যরকম উদাহরণ দেয়া যায়। ঢাকার বঙ্গবাজারে অল্প বয়সী 'মিনতি' কয়েকজন ছেলেমেয়ের কথা জেনেছি যাদের কেউ ইংরেজি, কেউ রাশিয়ান, কেউ পোলিশ বা আরও অন্য ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো– এক এক গোষ্ঠির ক্রেতার নিয়মিত মিনতি হিসেবে কাজ করতে করতে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। ক্রেতাদেরকে তারা এমনভাবে 'গাইড' করতে পারতো যেন দোকানদাররা না বুঝে। ওই বয়সের কারণে স্কুলে না যাওয়া এই দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পক্ষেও সরাসরি যে কোন ভাষা কিছুটা বলা আর বোঝা সম্ভব হয়েছে; শুধু আপন ভূবনে আগ্রহী চর্চার ফলে। ভাষা শেখার জেনেটিক ক্ষমতাটি যে তাদের বেশ ভালোই আছে সেটিও স্পষ্ট।

আজকাল শিক্ষার বিষয়ে উন্নত অনেক দেশে ছাত্রছাত্রীদের কাজকে অনেকটা এক একটি লক্ষ্য নিয়ে প্রজেক্টের মত করে নেয়া হয়। ওতেও জীবন-দক্ষতাগুলো অর্জন করতে সুবিধা হয়– যেমন কীভাবে পরিকল্পনা করতে হয়, কীভাবে প্রজেক্টের কাজে জড়িত বিভিন্ন জনের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, এক সঙ্গে কাজ করা যায়, এসব খুব জরুরি দক্ষতা। বেশির ভাগ প্রজেক্টই হবে আপন ভূবনকে নিয়েই, কারণ এখানেই

তার নিজস্ব বিচরণ। এক এক জায়গায় এক ধরণের সমস্যা-সমাধানের, এক এক ধরণের প্রকল্প হতে পারে। ওই যে গ্রাম-বইয়ের জন্য গ্রামের ইতিহাস রচনা ওটি একটি প্রজেক্ট হতে পারে। গ্রামের বয়োজেষ্ঠদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ও নানা পেশার মানুষের থেকে তথ্য নিয়ে সেটি হতে পারে। দুটি জায়গার উর্বরতা মাপতে পারে সেখানে একই ফসলের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে– মাটির কোন্ কারণে উর্বরতার এই পার্থক্য, তাও আন্দাজ করতে পারে এ সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করে। প্রশ্ন হলো এসব কাজের জন্য তাদেরকে সময় দেয়া হবে কি না, সহযোগিতা ও পরামর্শ দেয়া হবে কি না, তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া হবে কিনা পরীক্ষায়?

জীবন-দক্ষতাকে গুরুত্ব দেবার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়কে শিক্ষায় আনা দরকার যেটিও উন্নত দেশে যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু আমাদের নেই। হাতের যে কোন কুশলতার প্রশ্ন উঠলে আমরা তাকে কারিগরি শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থার দিকে পাঠিয়ে দিই যেখানে সাধারণত মূলধারায় কিছুটা অসফল ছাত্ররাই যেতে বাধ্য হয়; আনন্দের বা ঝোঁকের কারণে কতটা যায় তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু জীবন-দক্ষতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য শৈশব থেকে তারুণ্য পর্যন্ত সবারই হাতে কলমে কাজের কিছু না কিছু কুশলতা অর্জন করা উচিত এবং তার মধ্যে যে আনন্দ ও অর্জনের তৃপ্তি রয়েছে সেটি জীবনের অংশ করতে পারা উচিত। কেউ কারিগরি বিষয়ক ছাত্র হোক বা না হোক প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে এই কুশলতা ও এই আনন্দের একটি ছাপ থাকা প্রয়োজন। এটি করতে গিয়ে কে নিজেই তার বাড়ির বা গাড়ির ছোটখাট যন্ত্র ও মেরামতে দক্ষ হলো, কে ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বোর্ড ডিজাইন ও গড়াতে দক্ষ হলো, কে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে মজা পেয়ে তাতে ঢুকে গেলো, কে বাগান ও কৃষির ভেতরে ঢুকে গেলো, সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হলো হাতের কাজকে তার একটি আনন্দময় আর্টে পরিণত করা যা যা শিশুর মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের কুশল চালনার সম্পর্ককে বিকশিত করবে। সব দক্ষতার মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা; বিশেষ করে যখন এর সঙ্গে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাও যুক্ত হয়। সব স্কুলে এর ব্যবস্থা থাকা দরকার যতটা সম্ভব। প্রয়োজনীয় কিছু ন্যূনতম যন্ত্রপাতি ও কুশলী ওস্তাদ কারিগরের শিক্ষকতা সব স্কুলে ব্যবস্থা করা খুব কঠিন হবে না। যেগুলোর ব্যবস্থা সে ভাবে করা যাবেনা সেগুলোর শিক্ষার জন্য সত্যিকার কর্মস্থলের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

কর্মস্থলে কিছু কিছু নবিশিঃ

কর্মস্থলের সাহায্য লাগবে শুধু কারিগরি কাজের জন্যই নয়। আমার মতে জ্ঞান, দক্ষতা, জীবনের ভঙ্গি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরও স্কুল শিক্ষা উন্নত দেশের মত নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত– সাধারণভাবে শিক্ষিত ও কার্যকর নাগরিক গড়ার দায়িত্বটি স্কুলেই। এ জন্য এতে কর্মস্থলে শিক্ষারও একটি উপাদান থাকা উচিত যাতে সত্যিকার জীবন-জীবিকার জগতের মধ্যেই শিক্ষার্থী হিসেবে তার কিছুটা প্রবেশ ঘটতে পারে– শিক্ষার জগত ও বাস্তব জীবনের জগত অন্তত অল্প করে হলেও মিলিত হতে পারে। স্কুল শিক্ষার শেষ চার বছরের সময়, অর্থাৎ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি বছর অল্প কিছু সময় কিছুটা বাস্তব কাজের হালকা শিক্ষানবিশিতে ব্যয় করলে ওই লক্ষ্যটি পূরণ হতে পারে। ভাষা, সাহিত্য, গণিত, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান নানা বিষয়ের যে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যগুলো ইতোমধ্যে ছাত্রের আওতায় এসেছে ওখানে তার সম্ভাব্য ব্যবহারগুলো সে দেখতে পাবে, যে ব্যবহারের ভালো-মন্দ সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু ধারণা গড়ে উঠবে। এর সঙ্গে তার নিজের জীবিকা ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে তার সম্পর্ক থাকার দরকার নেই। তবে আপাতত যেসব দিকে তার উৎসাহ বেশি সেসবের কর্মস্থলে কাজ করার সুযোগ পেলে ভালো হবে। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় যেসব কর্মস্থল রয়েছে তার যে কোন ক্ষেত্রে গিয়ে ওখানকার কাজকর্ম কীভাবে চলে তার সঙ্গে নানা ভাবে পরিচিত হওয়া এবং তার কোন কোন অংশে নিজেও কাজ করার মাধ্যমে এই শিক্ষানবিশি করা যেতে পারে। কর্মস্থল কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এটি সাধারণ বিপণন প্রতিষ্ঠান বা কুটির শিল্প থেকে শুরু করে বড় শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক, কারিগরি, বিভিন্ন সার্ভিসমুখী, জনকল্যাণমূলক, হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সংবাদপত্র, আইনি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদি যে কোন কর্মস্থল হতে পারে। যে কোন স্কুলের কাছে এগুলো কোন না কোন রূপে থাকার কথা। এগুলো বড় ছোট প্রতিষ্ঠান যেমন হতে পারে তেমনি ছোট পারিবারিক, দু'একজনের বা একক ব্যবসা বা দপ্তরও হতে পারে– যেমন একজন চিকিৎসকের বা আইনজীবীর।

শিক্ষাটিই এখানে বড় উদ্দেশ্য, এবং এজন্যই কর্মস্থল কর্তৃপক্ষ এতে সহায়ক হবার জন্যই স্বতস্ফূর্তভাবে একে স্বাগত জানাবে; এটি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবে। কিন্তু অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই নানাভাবে কর্ম প্রতিষ্ঠানটির জন্য কিছু অবদানও রাখতে পারবে, কোন কোন কাজের মাধ্যমে, তাদের মতামত দেবার মাধ্যমে, এবং অন্যান্য নানা

ভাবেও। প্রতিষ্ঠানের মানুষরা যা নিজেরা ধরতে পারেনি এমন কিছু বিষয় হয়তো ওদের চোখে ধরা পড়বে। তাতে কোন কোন সমস্যা সমাধানেরও ব্যবস্থা হতে পারে। স্কুল, শিক্ষার্থী, কর্ম-প্রতিষ্ঠান সবাই যে ক্ষেত্রে যেভাবে সব থেকে সুবিধাজনক মনে করবে সে রকম নমনীয়ভাবেই এর সময়, স্থান, কাজ ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারবে। কর্মস্থলে থেকে কাজ করতে না পারলে, সেখান থেকে কাজ এনে, আসা যাওয়া করে, মূল কাজ বাড়িতেই করা যায়; তবুও সত্যিকার জীবনের শিক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। হাতের কাজ থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ, লেখালেখি, গণসংযাগ নানারকম কাজের সঙ্গে পরিচয়, উদ্যোগের সঙ্গে পরিচয় এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এতে যা অর্জিত হয়েছে ছাত্র তার প্রমাণাদি সহ যে প্রতিবেদন স্কুলে পেশ করবে সেই অনুযায়ী এই বিশেষ দিকেও তাকে যাচাই করা ও স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হবে।

কম্পিউটারে শিক্ষা:

বহিরঙ্গনের কিছু আতিশয্যকে কাটছাঁট করতে পারলে স্কুলের পেছনে অনেক ব্যয় কমানো যেতে পারে, কিন্তু একটি ব্যয়ের বিষয়ে কোন আপোষ নেই তা হলো স্কুলের কম্পিউটার কেন্দ্রের। ছাত্রের নিজের কম্পিউটার অথবা স্মার্টফোন থাকুক বা না থাকুক, অন্তত কিছুটা সময় প্রত্যেকে যেন কোন কম্পিউটারে কাটাতে পারে, ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত কম্পিউটারের সঙ্গে। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট এখন তার সক্ষমতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তার ব্যয় কমে এমন অবস্থায় এসেছে যে সারাদেশের প্রত্যেকটি স্কুল এর সুযোগ নেয়াটাই হবে শিক্ষার আয়োজনে সব থেকে কার্যকর ও সহজ ব্যবস্থা। আপন ভুবনের শিক্ষা যে রকম বিশ্বকে নিজের পরিচিত জগতের সঙ্গে মেলাবে, তেমনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ব ভূবনে নিয়ে যেতে পারে, সেখানে বিচরণ করতে পারে। এটি নিজের শিক্ষাকে নিজে এগিয়ে নিতে পারার ও একই সঙ্গে নিজেকে যাচাই করতে পারার সুযোগ দেবে। এই বিচরণ করার মত এবং নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত প্রেরণা শিক্ষার আয়োজনের মধ্যে থাকবে– দলেবলে কোচিং করার প্রেরণা নয়, যা এখন আছে। বিশেষ করে ভাষা শেখা, অংক শেখার মত বিষয়ের জন্য নিজে স্বতস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করাটা খুব কাজে আসে।

আরেকটি বড় সুযোগ হলো বিজ্ঞানের অনেক নিজে দেখা, নিজে করার বিষয় যা বাস্তবে সম্ভব হয়না তা কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে করা ও ওভাবেই তাকে আত্মস্থ করা। আজকাল এভাবে বিজ্ঞানের ও অন্যান্য

বিষয়ের যে কোন এক্সপেরিমেন্ট বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপযুক্ত সফ্টওয়্যার পাওয়া যায়। এতে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে ছাত্রের যে কাজগুলো করতে হতো এখন সে মাউজ দিয়ে তা কম্পিউটার এনিমেশনে করতে পারে; তাতেই কম্পিউটারের পর্দায় সে এক্সপেরিমেন্টটি বাস্তবের মতই এগিয়ে যেতে দেখবে ও ফলাফল পাবে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ যদি ছাত্র করে তবেই সেটি সঠিক দিকে যাবে, নইলে ওতে ভুল হবে– তা ছাত্র নিজেই দেখতে পারবে। এ ধরণের ক্ষেত্রে ছাত্ররা কম্পিউটারে কাজ করার সময় শিক্ষক ক্লাসটি পরিচালনাও করতে পারেন। আজকাল এ ধরণের সিম্যুলেশন প্রচুর তৈরি হয়েছে। এগুলো যেমন সহজলভ্য তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের খুঁটিনাটি ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেয়া একেবারে বিনে পয়সার চমৎকার শিক্ষকতাও এতে রয়েছে। ইন্টারনেটেও নানা ভাষাতেই এগুলো রয়েছে; আরও ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, এগুলোর অনুবাদও এখন কম্পিউটারের অনুবাদ সফ্টওয়্যার করে দিতে পারে। সবকিছুতে যেভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমে বেশি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সেগুলো ছাত্রকে সহজে তার ভুল কোথায় হচ্ছে দেখিয়ে দিতে পারে, শুদ্ধতর উত্তরের দিকে ইশারা দিতে পারে– ইত্যাদি। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিষয়ের ওপর উপযুক্ত আরও নানা বই, তথ্য, ভিডিয়ো ইত্যাদি ছাত্র খুঁজে নিতে পারে। প্রায় পুরো স্কুল জীবনে কম্পিউটারের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে করতে একদিকে কার্যকরভাবে এর ব্যবহারে শিক্ষার্থী যেমন ক্রমে অধিক সক্ষম হবে, তেমনি এভাবে নিজের স্বতস্ফূর্ত উৎসাহে অনুসন্ধান করে এগিয়ে নেয়ায় শিক্ষাটি চাপিয়ে দেয়া কিছু বলে মনে হবে না।

আসলে এই যে হাতে কলমে কাজের শিক্ষা, কর্মস্থলে করতে করতে শিক্ষা, এবং ইন্টারনেট সংযুক্ত কম্পিউটারে নিজের অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলছি তার সব কিছুকে একযোগে বলতে পারি– 'মুক্ত লেখাপড়া'। শিক্ষার উৎস শুধু ক্লাস, শিক্ষক, ও পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে যতটা পারা যায় মুক্ত করে দেয়া। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের বিকল্প শিক্ষার পদ্ধতিতে যে দুটি বড় লক্ষ্য আমরা রেখেছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল 'আপন ভূবনে' শিক্ষাকে আনা, আর অন্যটি এই 'মুক্ত লেখাপড়া'। উভয়টি চমৎকার কাজ করেছে, মূলধারার স্কুল শিক্ষাতেও করবে। জীবনের প্রথম চার বছরের মত সময় বাদ দিয়ে একেবারে শৈশবে খেলাচ্ছলে শেখার ক্ষেত্রেও কম্পিউটার বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা-মা বা পরিবারের অন্যদের কাছে শেখার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের থেকে শেখাও শিশুর জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক হতে পারে।

গান, ছড়া ইত্যাদি শেখা থেকে শুরু করে গল্প শোনা, ছবি ও শিক্ষণীয় ভিডিয়ো দেখে আনন্দের মধ্য দিয়ে সঠিক আচরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্যদের সঙ্গে একত্র কাজ ইত্যাদি একেবারে অংশগ্রহণমূলকভাবে কম্পিউটারের সঙ্গে করা আজকাল সম্ভব। বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এর কোন তুলনা হয় না।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা শেখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো চার পাঁচ বয়সে স্বাভাবিকভাবে শুনতে শুনতে বলতে বলতে তা শেখা– এভাবে আলাদা আলাদা মানুষের সঙ্গে ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করলে বা কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রামেও আলাদা মানুষের সঙ্গে আলাদা পরিস্থিতে তা করলে, একটি ভাষার সঙ্গে অন্যটি গুলিয়ে ফেলার কোন ভয় থাকে না, মাতৃভাষারতো নয়ই। এক্ষেত্রে চট্‌পট্‌ সেই ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন পরিস্থতি সৃষ্টি করতে কম্পিউটারের সুবিধাটি বেশ স্পষ্ট। চার পাঁচ বছর থেকে বারো তেরো বছর পর্যন্ত বয়সের অনেক শিশুকে দেখেছি শুধু নিয়মিত টেলিভিশনের বিদেশি প্রোগ্রামগুলো দেখে চমৎকার ইংরেজি বলতে বা হিন্দি বলতে শিখে গেছে (টেলিভিশনে এই দুই ভাষা রয়েছে বলে) কোন রকম চেষ্টা ছাড়াই। কাম্য ক্ষেত্রে এই শেখাকে ভুলতে না দিয়ে, তাকে যদি কথাবার্তা বলে আরও জোরদার করা হয় তা হলে অতি কম কষ্টে স্বাভাবিকভাবেই তার ভাষা শিক্ষা হবে যার উচ্চারণ ইত্যাদিও যথেষ্ট স্বাভাবিক হবে, এবং স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে ঢুকে যাবে।

তবে ভাষা শিক্ষাই হোক এবং অন্য সব কিছু শেখাই হোক কম্পিউটার এবং সত্যিকার মানুষ উভয়ের ভূমিকা এক সঙ্গে বজায় রাখা উচিত– কখনোই একা শুধু কম্পিউটারের ওপর নির্ভর না করে। তাছাড়া শৈশবে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় অভিভাবকের একইভাবে একই রকম আগ্রহ নিয়ে সঙ্গ দেয়া উচিত তা হলে ওটি উদ্দেশ্যচ্যুত হবার সম্ভাবনা কমবে– শিশু শুধু তার অতি পছন্দের জিনিসটাই বার বার দেখতে থাকবে না, বা অবাঞ্ছিত কিছুতে মনোযোগ দেবে না। তবে কম্পিউটারে শিশুর নিজস্ব আগ্রহ ও অনুসন্ধানে যথাসম্ভব উৎসাহ দেয়াই উচিত; অংক ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া ছাড়া নিজের ইচ্ছাটি বেশি চাপিয়ে না দিয়ে। শিশুর কম্পিউটার ব্যবহারে আবশ্যকীয় শর্ত হলো একে শুধু একটি বাড়তি শিক্ষা ও বিনোদনের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করা যাবে, একমাত্র উপকরণ হিসেবে নয়। সত্যিকার শিক্ষক, সত্যিকার বন্ধু, সত্যিকার খেলার সাথী, সত্যিকার বই, খাতা, শিক্ষা-উপকরণ ইত্যাদিকেই প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে; সত্যিকার মানুষের সঙ্গে কথা বলা, গল্প করা, একযোগে

কাজ করা, শেখা, দল বেঁধে বাইরে খেলা, বেড়ানো, অনুসন্ধানী অভিযান চালানো ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

শিশুর কাছে সত্যিকার জগতটিই জগত হবে, ছবিতে, টেলিভিশনে, কম্পিউটারে যা দেখবে প্রথম থেকেই সে জানবে এগুলো সত্যিকার জগতের যান্ত্রিক প্রতিফলন বা ইমেজ মাত্র– ওটি বাস্তব জগত নয়, তবে বাস্তব জগতের ভালো অনুকরণ। সত্যিকার জগতের এই প্রাধান্য– পরিবার, প্রিয়জন, বন্ধুরা, খেলার মাঠ, খেলনা, প্রকৃতি, ফুল-ফল-বাগান-প্রাণী এসবের সঙ্গে একাত্ম হবার গুরুত্বের পর কম্পিউটারের গুরুত্ব হবে। তার উল্টোটা হলে শিক্ষা অস্বাভাবিক মোড় নেবে, কম্পিউটার নেশায় পরিণত হবে।

এই একই কারণে শিশুর অন্তত প্রথম চার বছর কম্পিউটার একবারেই বর্জন করতে হবে। ওই সময়ের প্রথম পরিচিতি যেহেতু মস্তিষ্কে বেশি স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে তখন পুরোটাই হওয়া উচিত সত্যিকার জগত; আশপাশে শুধুই সত্যিকার মানুষ, সত্যিকার প্রকৃতি, সত্যিকার খেলনা ও খেলাধূলা এবং ওই সত্যিকার জগত থেকেই সব কিছু শেখা। তারপর চার বছর বয়সের পর ওই মিশ্র ব্যবস্থায় গেলে কম্পিউটারে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে, বাস্তব আর কম্পিউটারকে গুলিয়ে ফেলারও। তবে স্কুল জীবনের আগাগোড়া সময় কম্পিউটার ব্যবহার একটি খোলামেলা পরিবেশে আংশিক সময় ব্যবহার করার জন্যই তোলা থাকবে, যথাসম্ভব অন্যদের সহ একত্র ব্যবহারের। আজকাল আগেকার দিনের চুষনির মত ছোট্ট শিশুকে ব্যস্ত রাখার জন্য, বা তারা যেন বিরক্ত না করে সে জন্য, তার হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট কম্পিউটার দিয়ে রাখার যেই প্রবণতা দেখা যায়– সেটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর। ওই ছোট্ট শিশু কম্পিউটারে নিজে নিজে ঢুকছে, প্রোগ্রাম বদলাচ্ছে, সেখান থেকে এটি সেটি শিখে ফেলছে তা দেখে গর্বিত বা খুশি হবার কিছু নেই– শিশুর জন্য সেটিই স্বাভাবিক। বরং বাইরের জগতেই সে তার স্বাভাবিক উন্নতিগুলো দেখালে, নানা সক্ষমতা পেলে সেটিই হবে অন্তত চার বছর পর্যন্ত তার জন্য উপযুক্ত। প্রিয়জনের পক্ষে শিশুকে সময় দেবার কোন বিকল্প নেই। যত বেশিক্ষণ এবং বেশিদিন পারা যায় তা দেয়াটাই হলো শিশুর সম্ভাবনাকে বের করে আনার সবচেয়ে বড় মূলমন্ত্র।

বিশ্বদৃষ্টির বিদ্যালয়

শিক্ষার বিশ্বযাত্রা

ধীর অথবা দ্রুত লয়েঃ

বিশ্ববিদ্যালয় জিনিসটি বড়দের, এর সঙ্গে স্কুলের সাদৃশ্য যত কম হয় তত ভালো। এখানে এসে একজন তরুণ বা তরুণীর কী আশা করা উচিত এটি সর্বত্র একটি চিরন্তন প্রশ্ন। আমি যখন এখানে আসি তখন আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক রহস্য ভরা বিশ্ব, যার সম্পর্কে আধো আধো অনেক কথা শুনলেও তার বিশ্বময়তাটি কতখানি নিজে অনুভব করবো এই প্রশ্নটি মাথায় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে নিরাশ করেনি। কিন্তু পরে দুনিয়ার নানা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে যতটুকু দেখেছি এবং আমার নিজের ওই মাতৃ-বিশ্ববিদ্যালয়কে কালের যাত্রায় যেভাবে পরিবর্তিত হতে দেখেছি ওই প্রশ্নটি এতদিন পরে আবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্নটির একটি বিশ্বজনীন রূপও দেখতে পাচ্ছি, কেউ কেউ এমনও বলছেন যে আজ তথ্য, জ্ঞান ও বিশ্বচিন্তা যেখানে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সর্বত্র বিস্তৃত ও নানাবিধ চর্চার সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে সে অবস্থায় সনাতন অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না। চরম মতের কেউ কেউ একে স্বীকৃতির একটি সীলমোহর বৈ অন্য কিছু ভাবতে রাজি নন। সে কথা উড়িয়ে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবার অবকাশ যে আছে সেটি নিসন্দেহ।

একটি কথা খুব পরিষ্কার, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ের কোন উচ্চতর রূপ নয়, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দুনিয়ার একেবারেই প্রাচীনতম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয় দুইটা তখন থেকে আজ পর্যন্ত স্পষ্ট রেখেছে। একশ'বছর আগে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তখন কিছু কিছু বিষয়ে ওই দুই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই গঠিত হয়েছিলো। ১৯৬২ সালে আমি যখন এখানে ভর্তি হই তখনো সেই রেশ বেশ কিছুটা ছিল। একেবারে বাস্তবে হাতেনাতে না থাকলেও অন্তত সব কিছুর মধ্যে জড়ানো আইডিয়া হিসেবে ছিল। আমাদের হল সিস্টেমটি এসেছিলো

ওখানকার 'কলেজ' সিস্টেমকে অনুসরণ করে। অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের কলেজ হলো ছাত্রদের থাকার জায়গা, বেশ কিছু শিক্ষকেরও; সেখানেও দৈনন্দিন জ্ঞান চর্চা চলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম ছাড়াও। সেই ষাটের দশকেও আমাদের হলের ওই চরিত্রটি খানিকটা হলেও বজায় ছিল, এখানকার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, 'হাউজ টিউটরদের' সঙ্গে ছাত্রদের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আদান প্রদান, এবং এখানকার সভা, বিতর্ক, বিশ্ব-সচেতনতা ইত্যাদির বিবেচনা করলে। বলতে গেলে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অর্জন যতটা কার্জন হলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা থেকে এসেছে প্রায় ততটাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থেকে এসেছে। এই অর্জন দুটির প্রকৃতি আলাদা ছিল– প্রথমটি ছিল বিজ্ঞান জগতের ব্যাপার, দ্বিতীয়টি ছিল বহুতরো বিষয়ের আলোচনা-সমালোচনায় শরিক হয়ে একটি সামাজিক মননের গঠনে। অবশ্য অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের কলেজে বাস করা ছাত্ররা খাওয়ার টেবিল থেকে শুরু করে দিনে-রাতের বড় সময় তাদের টিউটরদের সান্নিধ্যে থাকতো। প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটি ও অনুসন্ধান শেষে লেখা এক একটি জ্ঞানগর্ভ রচনা হাউজ টিউটরের সামনে পড়া ও তাঁর সমালোচনা আত্মস্ত করার যে নিয়ম তা আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে কখনো আসেনি। তা সত্ত্বেও হলে বা ক্লাসে জ্ঞানের বিষয়গুলোর সঙ্গে সর্বক্ষণ বসবাসের একটি ঐতিহ্যের কিছুটা হলেও এখানেও বজায় ছিলো। মনে হতো সবাই যার যার একাডেমিক জগতের কোন না কোন সমস্যা নিয়ে সব সময় কথা বল্‌ছে। হল থেকে যা পেয়েছি তা এভাবেই পেয়েছি– কারণ সলিমুল্লাহ হলে ছিল প্রধানত অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, ইংরেজি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের বাস। তাদের আড্ডার আলোচনা শোনা এবং মাঝে মাঝে ফোড়েন কাটা ছিল এসব বিষয়ে আমার একটি খোলা জানালার মতো। বিজ্ঞানের বিতর্কগুলো কার্জন হলে বা তার সামনে ঘাসের ওপর আড্ডায় হতো বেশির ভাগ। এমনি স্বতস্ফূর্তভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের জন্য একটি বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া ছিলো। এটিই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে সব সময় আগের সব শিক্ষার থেকে আলাদা করে রেখেছিলো।

এই স্বতস্ফূর্ততাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যই হয়তো ওই অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজ ঐতিহ্যের আরও একটি জিনিস আমার সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে বজায় ছিলো তা হলো তিন বছর ছাত্রকে তার প্রধান বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দেয়ার থেকে মুক্ত রাখা। অনার্স স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার জন্য পরীক্ষাটি দিতে হতো একটানা তিন বছর পর এক সঙ্গে পুরোটা সিলেবাসের। এর অর্থ হলো নিজের মত করে সময় দিয়ে

পড়াশোনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে বিদ্যা অর্জনের স্বাধীনতা লাভ; আর এর মধ্যে শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ার তাড়া অনুভব না করা। ইতোমধ্যে সাবসিডিয়ারি বা সাহায্যকারী বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগও ঘটতো, কারণ ওই বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দুই বছরের শেষেই দিয়ে দিতে হতো। যেন বুঝিয়ে দেয়া হতো যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাটি শেখা নয়; বরং এটি চর্চা; চর্চা করতে হয় সময় নিয়ে স্বাধীনতা নিয়ে। অধিকাংশ শিক্ষকও যতটা না বিদ্যার কুশলী হিসেবে পরিচিত হতে চাইতেন, তার থেকেও বেশি চাইতেন বিদ্যার দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হতে চাইতে। সারাক্ষণ ছাত্রদেরকে পরীক্ষার জন্য তৈরি না করতে হওয়াতে এটি সম্ভব হতো।

প্রত্যেকটি সহায়ক বিষয়কে একটি আলাদা চর্চার জায়গা হিসেবে দেখারও একটি সুযোগ এতে ঘটতো। যেমন আমার একটি সহায়ক বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি– সেটি আমরা একটু দূরে কেমিস্ট্রি ভবনে গিয়েই শিখেছি। ওখানে গেলে সংস্কৃতি বদলে যেতো, ইতিহাস বদলে যেতো, এমনকি গন্ধও বদলে যেতো। ওই পরিবেশে না গিয়ে, ওখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে না এসে, ওই সংস্কৃতিতে কিছুটা হলেও অবগাহন না করে যদি কেমিস্ট্রির পাঠ শেষ করতাম তা হলে যে অনেক কিছু থেকে যে বঞ্চিত হতাম তা আমরা তখনই বুঝতে পেরেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন নেহাৎ উচ্চতর বিদ্যালয় নয় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করেছি। একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি বিষয়টিকে ভালো না লাগিয়ে কিছুটা একনিষ্ঠ না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। তিন বছর পর ওই পুরো বিষয়ের সামগ্রিকতার ওপর ন্যূনতম দখলের পরিচয় দেয়াটাও ভালো না লাগার বিষয়ে সম্ভব ছিল না। এটি আরও অনেক বেশি দেখেছি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে এমনি ভালো লাগার এবং এর মধ্যে ডুবে থাকার আগ্রহের অভাব থাকলে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটার কথা চিন্তাই করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও তাদের করার এবং শিক্ষার অনেক ক্ষেত্র আছে। কাজেই যে কোন সময়ে আগ্রহের অভাব হলেই তারা অন্য দিকে সরে গেছে।

আমেরিকান প্রথা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার ফলে ওই সামগ্রিক দখল অর্জনের যে চ্যালেঞ্জটি ছিল তা কিছুটা হালকা হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের বদলে এখন এক বছর পর পর পরীক্ষা দিয়ে ফেলার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি কোর্স শেষ করে তাতে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে দেয়ার মেয়াদটি আরও কমে

তিন মাসে নেমে এসেছে। সেটি পুরো বিষয়ের ওপর সামগ্রিক দখলের সম্ভাবনা আরও কিছু কমিয়ে দিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই তার মূল লক্ষ্যটি থেকে সরতে পারেনা– তা হলো নিজের 'বিশ্বদৃষ্টি' অর্জন। আমার অস্থিত্ব ও আমার সত্ত্বাকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা এটি। যুগে যুগে মানব-উদ্যোগ আমাদেরকে যেই জায়গায় এনে দিয়েছে তার বিভিন্ন দিকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলে আজকের খোলা চোখে আমি বিশ্বকে কীভাবে দেখছি, বিশ্বের মানব জাতিকে কীভাবে দেখছি, প্রকৃতি জগতকে কীভাবে দেখছি, এসবে আমি কোন্ জায়গাটি নেবো, আমার কী চিহ্ন রাখবো– সেটিই আমার বিশ্বদৃষ্টি। আমাকে সেই বিশ্বদৃষ্টি পেতে সাহায্য করবে বলেই সেটি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর বিদ্যালয় মাত্র নয়। এটি যদি শুধু কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে কাজের কাজী করার জন্য হতো, বা আমাকে শুধু কিছু জীবন-দক্ষতা দিয়ে বাজারে টিকে থাকার উপযুক্ত করে তুল্‌তো, তা হলে সেটি আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় হতো না। কাজেই এই বিশ্বদৃষ্টিটিই ওখানে আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হয়েছে। খুব দুঃখ অনুভব করি যখন আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, এমনকি দুনিয়াজোড়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ওই বিশেষজ্ঞ হবার ও জীবন-দক্ষতা নিয়ে বাজারে নামার আশ্বাসটি দিয়েই হবু ছাত্রকে কাছে টানার চেষ্টা করে, বিশ্বদৃষ্টি দেবার আশ্বাস দিয়ে নয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বদৃষ্টি দেবার আশ্বাসটিই বেশি দিতো।

অবশ্য বিশ্বদৃষ্টি এক ভাবে সবারই থাকে, এটি পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার হয় না। হাজার হলেও এ তো নিজের দৃষ্টির ব্যাপার– সামনে যে দৃশ্য দেখতে পাই সেটি মস্তিষ্কে গিয়ে নতুন 'আমিকে' তৈরি করে। এই দৃশ্যকে সম্প্রসারিত করাটাই কথা। নানাভাবে তা সম্প্রসারিত করে আমরা নিজের বিশ্ব গড়ি, আমরা সবাই গড়ি; সেটিই এক ভাবে আমাদের প্রত্যেকের বড় পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয় একে উত্তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয়– 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের' মত 'শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব' এমনি দারুণ সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি। সেই অভিজ্ঞতা যতখানি হয় ততখানিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা। আমি বরাবর ওটিকেই গুরুত্ব দিতে শিখেছি।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই তিন বছর তার মেলে রাখা মনন বিশ্বের চারণ ভূমিতে চরেবরে খাওয়ার যে সুযোগটি দিয়েছিলো সেটি খুব উপভোগ করেছি। বার বার বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে– এ শুধু শেখা নয়, এ বিশ্বদৃষ্টি

গঠন। ওই চারণ ভূমি কার্জন হলে লাল দালানে যেমন ছিল, কার্জন হল গ্রিন নামে পরিচিত সামনের গাছে-ঢাকা ঘাসের ওপর আড্ডাতে ছিল, সলিমুল্লাহ হলের কামরায় কামরায় ও প্রশস্ত বারান্দায় ছিল, আর হলের চত্বরগুলোতে ছাত্র রাজনীতির প্ল্যাটফরম মিটিং-এ-ও ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মত কিছু কিছু দেশে যে 'কোর্স সিষ্টেম' চালু রয়েছে আমাদের পদার্থবিদ্যা বিভাগে সেটি চালু করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অগ্রপথিক হতে হবে– এক সময় এমন একটি সিদ্ধান্ত সব কিছু বদলে দিয়েছিলো। তখন অবশ্য আমি আর ছাত্র নেই, ওখানেই শিক্ষক। ব্যাপারটিতে আমার মনের সায় ছিল না। ক'দিন পর পর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দেয়া, এবং তারপর বছরের মাথায় ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ফেলে একটি কোর্সের ইতি ঘটানো। আগে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরণের ছাত্র-পদার্থবিদের মত করে দেখা হতো। কিন্তু এখন এই কোর্স সিস্টেমে এসে মনে হলো অধিকাংশ ছাত্রের জন্য ব্যাপারটি কোন একটি বিষয়ের গভীরে গিয়ে আত্মবিশ্বাস পাওয়ায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এমন ধারণা জন্মালো যে একটি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে দেয়ার পর ওটাকে ভালো করে হাত ধুয়ে মুছে ফেলা যায়। আগের চরেবরে খাওয়ার সুযোগের বিপরীতে এই হাত ধুয়ে ফেলার সুযোগ ছাত্রদের বড় একাংশের জন্য আমি পদার্থবিদ্যা বিষয়টির অন্তর্দৃষ্টি লাভের পথে বাধা হয়ে উঠতে দেখেছি। যে কোন বিদ্যা, বিশেষ করে বিজ্ঞান একের ওপর এক পুঞ্জীভূত জ্ঞানের ব্যাপার। গোড়া থেকে এভাবে পুঞ্জীভূত তার সামগ্রিকতাটি ধরে রাখাটি খুব প্রয়োজন। কিছুদিনে যা জমলো তার বিসর্জন দিয়ে দিয়ে এগুনো সেদিক থেকে সুবিধার কথা নয়, সব ক্ষেত্রে এটি করলে বিশ্বদৃষ্টির সংকোচন অনিবার্য হয়। এ প্রসঙ্গে অনার্স পরীক্ষা শেষে প্রত্যেক ছাত্রকে যে ঘণ্টাব্যাপী সামগ্রিক মৌখিক পরীক্ষা (কম্প্রেহেনসিভ ভাইভা) দিতে হতো তার কথা উল্লেখ করা যায়- যাতে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একটি সম্মিলিত পরীক্ষক প্যানেলের সামনে এতো সময় কাটানো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু এটিই ছিল বিষয়টিতে ছাত্রের দীক্ষা লাভ, এর উদ্‌যাপন। কোর্স সিস্টেমে এসেও সব কোর্স শেষ করার পর সেটি এক ভাবে বজায় ছিলো, এইটুকুই সামগ্রিকতাকে কিছুটা ধরে রেখেছিলো।

উত্তর আমেরিকার যে বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম থেকে এখানে কোর্স সিস্টেমটি এসেছে সেখানে স্নাতক হবার উদ্দেশ্যটাই ভিন্ন। সেখানে স্নাতক ডিগ্রি দেয়ার মানে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি মোটেই নয়। মানববিদ্যা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য

বিভিন্ন দিক থেকে নানা কোর্স নেবার সুযোগ থাকে, সবাই নেয়ও তাই; শুধু একটির ওপর মেজর বিষয় হিসেবে একটু বেশি গুরুত্ব থাকে এই যা পার্থক্য। উদ্দেশ্য হলো একটি চতুর্মুখী সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, এবং তার মাধ্যমে সব কিছুকে পরিশীলিতভাবে দেখার অভ্যাস। কিন্তু আমাদের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য থাকে প্রত্যেককে কোন না কোন একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখানো। বাইরের সবাই যেন তাকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবেই চাকরি ইত্যাদিতে নিয়োগ করে– প্রকৌশলী, সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, ব্যবসা বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ইত্যাদি নানা কিছুতে। যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় তা হয় না, চতুর্মুখী শিক্ষা নিয়ে স্নাতক যে কোন কাজে ঢুকতে পারবে এটিই মনে করা হয়– বিশেষ করে যে সব বিষয়ে সে লেখাপড়া করেছে তার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত সাধারণ নানা কাজ। বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা যদি করতে হয় তা হলে সেটি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, তাও সাধারণত বেশ কিছু দিন ওই বিষয়ে কাজ করার পর। ওখানে তাই মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে গেলে বৃটিশ সিস্টেমের মত (অন্তত আগেকার দিনের) চর্চাকারী বিজ্ঞানী মনে করা হয় না, বরং বিষয়ের ওপর সত্যিকার বিশেষজ্ঞের লেখাপড়াটি সেখানেই শুরুতে করতে হয়, গবেষণার চর্চা আরও পরে। এমনকি সাধারণ চিকিৎসক বা আইনজীবী হতে হলেও প্রথমে ওই চতুর্মুখী স্নাতক হয়ে পরে সেই 'মেডিক্যাল স্কুল' বা 'ল' স্কুলে' স্নাতকোত্তরে গিয়ে তা হতে হয়। আমাদের দেশে ওই উভয়েই স্নাতকের মধ্যেই হয়। বিশেষজ্ঞ হতে হলে সামগ্রিকতা প্রয়োজন হয়, চতুর্মুখী স্নাতক হবার জন্য তা লাগে না। অথচ আমরা সামগ্রিকতার ওপর জোর না দিয়েই বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির চেষ্টা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা যেতে পেরেছে:

এখন সারা দুনিয়ায় সব দেশে প্রবণতা হচ্ছে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ১২ বছরের স্কুল শিক্ষা থাকা এবং এরপর যথাসম্ভব সিংহভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু এমনটি আগে ছিল না, বলতে গেলে কোথাও ছিলনা; পঞ্চাশ বছর আগে তো ছিলইনা এরপরও বহু বছর ছিল না। স্কুল থেকে পাশ করে যারা বের হতো তাদের ছোট একটি অংশই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতো। অনেকেই স্কুল-পরবর্তী অন্যান্য নানা শিক্ষা লাভ করতো। দেশে দেশে তাই ব্যবস্থাগুলোও তার উপযুক্ত করেই গড়ে তোলা হয়েছিলো। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র হাতে গোণা কয়েকটি, এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে। স্কুলের পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষার

মাধ্যমে বাছাই করে অল্প কিছু ছাত্রছাত্রী এতে আসতো। বাকি সবাই বিভিন্ন ধরণের কলেজে স্কুল-পরবর্তী শিক্ষা লাভ করতো। আর অধিকাংশরাই উচ্চতর কোন শিক্ষাতেই আসতো না। পরবর্তী সময়ে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, অনেকে বিদেশে গিয়েও লেখাপড়া করেছে। অতীতে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে তাদের সবার জন্য ছিল শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়– যাতে আবাসিক ব্যবস্থাসহ সবই ছিল অতি স্বল্পব্যয়ের। পরে যারা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে বা দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে, তাদেরকে প্রচুর ব্যয় এর জন্য করতে হয়েছে। কাজেই এই সুযোগ শুধু আর্থিকভাবে সমর্থদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখনো তাই আছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমরা বৃটেন, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি দেখতে পারি।

পঞ্চাশ বছর আগে বৃটেনে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো মেধা ভিত্তিতে স্কুল-পাশদের একটি অংশই শুধু। যারা এই বাছাইতে আসতো পারতো তাদেরো সবাই যে আসতে চাইতো তাও নয়; অনেকেই বিভিন্ন পেশায় শিক্ষানবিশি করতে চলে যেতো। যেমন ব্যাংকারদের দেখেছি অনেকেই স্কুলের পরে পরেই এই পেশায় ঢুকে এর সর্বোচ্চ পদেও চলে যেতো। অনেক রকম মধ্যবিত্ত পেশাতেই এমনটি হতো, শ্রমিকের পেশায় তো বটেই। অনেকেই নিজের স্কুলের ধরণ ও সেখানে নিজের ফলাফলের কারণে ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারতো না। গ্রামার স্কুল এবং সেকেন্ডারী মডার্নের বিভাজনগুলো ওভাবেই করা ছিল। শ্রমজীবী পরিবার থেকে বেশি শিশুরা যেহেতু ইলেভেন প্লাস পরীক্ষায় ভালো করে গ্রামার স্কুলে যেতে পারতোনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটাও বিরল ঘটনা ছিল। স্কুল শিক্ষায় এসব বিভাজনের অবসান হবার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পথে কোন বাধা কারো জন্য ছিলনা যদি স্কুল শেষের মেধার পরীক্ষায় এগিয়ে থাকতে পারতো। গোড়া থেকেই নামমাত্র ব্যয়েই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা লাভ সম্ভব হতো। এখন ব্যয় বেশ কিছু বেড়েছে বটে কিন্তু তাতে সবার সমান সুযোগে ইতরবিশেষ হয়নি। ব্যয়ের দিক থেকে একই কথা ইউরোপের দেশগুলো সম্পর্কে বলা যায়। কিন্তু সেখানে বছর বিশেক আগেও শতকরা ৩০-৪০ ভাগের বেশি ছাত্র স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতোনা– বাছাই পরীক্ষাগুলো সে ভাবেই হতো। বাকিরা নানা পেশার শিক্ষানবিশিতে চলে যেতো। এরপর থেকে এই সংখ্যা অবশ্য বেড়েছে। আমার নিজের কিছু সুযোগ হয়েছে কাছে থেকে সুইজারল্যান্ডের অবস্থাটি দেখার– যেখানে স্কুল শেষে একটি বিরাট সংখ্যক

ছাত্রের জন্য ডুয়্যাল সিস্টেম (দ্বৈত ব্যবস্থা) নামক ব্যবস্থা রয়েছে। এর মানে ছাত্ররা কিছু সময় কারিগরি উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবং বাকি সময় সত্যিকার কারখানায় হাতে কলমে শিক্ষানবিশি করে। ওরা অধিকাংশ নানা কুশলীর পেশায় চলে যায় এবং তাদের লক্ষ্য থাকে যার যার ক্ষেত্রে ওস্তাদ কারিগর হওয়া (মাস্টার ক্র্যাফটসম্যান)। একই ব্যবস্থা জার্মানিতেও চালু ছিল, এখনো আছে। তবে ইউরোপে সর্বত্র বিশ্বদ্যিালয়ের জনপ্রিয়তা ও সুযোগ দ্রুত বেড়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে– এবং বরাবরের মত এই শিক্ষাও সম্পূর্ণ সরকারি খরচেই সম্পন্ন করা যায়।

শুধু বৃটেন বা ইউরোপ নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে ও শৃঙ্খলাপূর্ণ উচ্চ শিক্ষা রয়েছে এমন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াটি নির্ভর করে বিশেষ ধরণের মেধার পরীক্ষায়। এই ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার পরীক্ষাটি সব থেকে বেশি আলোচিত; মনে করা হয় এটি এ ধরণের পরীক্ষার মধ্যে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন। বারো বছরের স্কুল শিক্ষার পর এটিতে উত্তীর্ণ হবার ওপরেই ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া নির্ভর করে– এর জন্য যে কঠিন ও রাতদিন লেগে থাকা প্রস্তুতি সে ব্যাপারে বিশ্ব মিডিয়াতে অনেক কথা শুনেছি, অনেক ছবি দেখেছি। একবার ওই দিনটিতেই দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে ছিলাম, ওখানকার পত্রিকা টেলিভিশন জুড়ে শুধু এর খবর– এক দিকে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা-কেন্দ্রের ছবি, অন্য দিকে যতক্ষণ পরীক্ষা চলছে বাইরে মাঠে বাবা-মাদের একটানা প্রার্থনার ছবি। ভারতের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের কথাও অনেক শুনেছি। ওখানকার অনেক বন্ধুদেরকে দেখেছি সন্তান কখন এই পরীক্ষাটি দেবে সেই হিসেবে আগের বহু মাস নিজের জীবনকেও একেবারে নিয়ন্ত্রিত নিয়মে নিয়ে এসেছে– ওর প্রস্তুতি পর্বে সঙ্গে থাকার জন্য। এটিও স্কুল-কলেজ শেষে প্রকৌশল ও অন্যান্য কারিগরি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রয়োজনীয় শর্ত– একই পরীক্ষায় ভারতের সর্বত্র ভর্তি। এর একটি অগ্রসর রূপ আছে যেটি বিখ্যাত ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অব টেকনোলজি ও অনুরূপ কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার শর্ত। এতে এ পর্যন্ত ২ শতাংশের বেশি ছাত্র কখনো উত্তীর্ণ হয়নি। ভালো কথা হলো উত্তীর্ণ হলে যে কোন আয়ের পরিবারে সন্তান তার পছন্দমত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে। শুনেছি যে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুনিয়ার নামকরা বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এটিতে উত্তীর্ণ হওয়াকে তাদের ভর্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হলে মেধার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজন হতো, এখনো হয়। সত্তর সালের আগে পর্যন্ত এই অর্থ যোগানোর ভার পুরোপুরিই বাবা-মা অথবা ছাত্রের নিজের ওপরেই বর্তাতো। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত কম হলেও, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়– বিশেষ করে নাম করা উঁচু দরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যয় অসম্ভব রকম বেশি হতো যদি না উচ্চ মেধাবী হিসেবে কিছু রেয়াত ও বৃত্তি পাওয়া যেতো। আগ্রহ, মেধা ইত্যাদির কথা যদি বাদও দিই শুধু অর্থব্যয়ের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাধারণ অনেক পরিবারের সাধ্যের বাইরে ছিল; স্বল্প আয়ের মানুষের তো বটেই। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষ– আফ্রিকান আমেরিকান, ল্যাটিনো (মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ থেকে আসা অভিবাসী), এবং অন্য দরিদ্র অভিবাসীরা এর থেকে বঞ্চিত হতো বেশি, কারণ তাদের অধিকাংশই ছিল স্বল্প আয়ের মানুষ। সিনেমায় দেখেছি, বইয়ে পড়েছি আগের কোন স্বচ্ছল, সফল পরিবারের বর্ণনা দেবার সময় প্রায়ই কতগুলো জিনিসকে এক সঙ্গে বলা হতো– তাঁরা মধ্যবিত্ত শহরতলীতে বাড়ি কিনতে পেরেছেন, প্রতি বছর সাগরতীরে ছুটি কাটাতে পেরেছেন, তাঁদের দুই সন্তানকে কলেজে পাঠাতে পেরেছে... ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমেরিকার সাধারণ কথাবার্তায় কলেজ বলা হয়, আর সেখানে কোন ছেলে বা মেয়েকে পাঠানো বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল, এবং গর্বের ব্যাপারও ছিল। প্রধানত ব্যয়বহুলতার কারণে এটি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের সাধ্যের এমনকি চিন্তার বাইরে থেকে যেতো। এর কিছু সুরাহা হয়েছে ছাত্র-ঋণের মাধ্যমে। সত্তরের দশক থেকে ব্যাপকভাবে ছাত্র-ঋণ ব্যবস্থা চালু হয়, এবং আগ্রহী সব ছাত্র নিজেরাই সরকার থেকে ঋণ নিয়ে ভর্তির বাছাইয়ে টেকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, পরে ধীরে ধীরে চাকরির বেতন থেকে তা শোধ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু তাতে ছাত্রদের ওপর চাপ থেকেই যায়– কারণ অনেকের ক্ষেত্রে ঋণ শোধ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় এত বেড়েছে যে অনেকে তাদের পেশাজীবনের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেও ছাত্র-ঋণের দায় থেকে এখনো মুক্ত হতে পারছে না। তবে এতে একটি বড় অর্জন হয়েছে– পরিবারের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাই আগ্রহ থাকলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাছাই হলে এই শিক্ষা লাভ করতে পারে। অবশ্য এই আগ্রহ সবার থাকে না, আর কাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই ভর্তি হবার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে না।

নানা দেশের আগের ও আজকের এই পরিস্থিতিগুলো দেখলাম এ কারণে যে আমাদের দেশের সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সফলতাকামী যে কারো জন্য একমাত্র পথ। কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্তত কোন কলেজ থেকে একই নামের ডিগ্রিগুলো অর্জন না করতে পারলে যে কারো জন্য সেটি ব্যর্থতা বলে গণ্য হয়। প্রায় সব ধরণের পেশা, চাকরি, সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাওয়া হয় মাস্টার্স ডিগ্রি! এই শিক্ষায় ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ-অনাগ্রহ, অথবা অন্য তেমন কোন দিক থেকে কোন প্রশ্ন নাই। কলেজগুলোর শিক্ষা মোটেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের নয়, তবুও সেগুলোর সব কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণেই করতে হয়– অনার্স চালু করা, মাস্টার্স চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয় নামের সংস্থার অধীনে থাকা ইত্যাদি। এই ভাবে সার্থকতার কথা চিন্তা না করে, প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা না করে, বিকল্পের কথা চিন্তা না করে সব কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে একাকার করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও এই একক চাহিদা মেটাবার জন্য ক্রমাগত বাড়ছে, যার অধিকাংশকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মানের দিকে মোটেই লক্ষ্য না করে অর্থের বিনিময়ে চাহিদা মেটাতে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে বাবা-মা'র আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করার ব্যাপারটি এখন এখানে চলে এসেছে। সব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, সেটি তাদের স্কুল শিক্ষা ও সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নের কারণেই ঘটছে। সেখানে অনেক বিকল্প, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলেই আসে। আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার কারণ হলো এ ছাড়া উপায় নেই বলে। ফলে সবাই এতে সমান মনোযোগ দিতে পারে না, এত বিনিয়োগ এত আয়োজন অনেকের জীবনে সেভাবে রেখাপাত করে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির অদ্ভুত অভাবনীয় নেতিবাচক রূপান্তর এতে অবদান রেখেছে। কোভিডের দীর্ঘ সময় তাদের অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি চালাবার চেষ্টা না করা– যা দেশে-বিদেশে অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় করেছে– তারই একটি লক্ষণ। কোথায় যেন গরজের অভাব। আমাদের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রও এর জন্য অভিভাবকের অর্থ দিতে রাজি থাকলেও, সহশিক্ষা ক্রম এবং নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন ইত্যাদিতে মনোযোগ দিলেও, এর আসল উদ্দেশ্যের প্রতি তেমন গরজ করতে দেখা যায় না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃতিটি এমন যে, এতে আগ্রহ ও আত্মনিয়োগের প্রয়োজনটি এত বেশি যে, এই গরজ না থাকলে এ শিক্ষা থেকে বেশি কিছু অর্জন অসম্ভব। এর মধ্যেই অবশ্য সরকারি ও

বেসরকারি কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত অনেক উজ্জ্বল স্নাতক উপহার দিয়েছে, যাদের কেউ কেউ রীতিমত প্রতিভা দেখিয়েছে। স্পষ্টত তাদের ক্ষেত্রে বিশ্বদৃষ্টি অর্জন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ধ্রুবতারার মত কাজ করেছে।

প্রশস্ত এক দৃষ্টিমঞ্চ

এক বিষয় বনাম বহু বিষয়ঃ

সব ধরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি চতুর্মুখী স্নাতক ব্যবস্থা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চের আয়োজন করেছে। ওখানে অনেকদিন ধরে যে নিয়ম চালু রয়েছে তাতে চার বছরের মধ্যে প্রথম দু'বছর আর্টস-সায়েন্স-বিজনেস সবদিক থেকে কিছু কিছু কোর্স বাছাই করতে হয় সব কিছুর ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে। তার মধ্যে অবশ্য মেজর বা প্রধান বিষয়ের সহযোগী হিসেবে দু'একটি কোর্স অবশ্যই নিতে হয়। যেমন মাইক্রোবায়োলজি যদি মেজর হয় তা হলে কেমিস্ট্রি ওভাবে নিতেই হয়। এছাড়া বাকি সবে বিভিন্ন দিক থেকে পছন্দের বিষয়। পরের দু'বছর অবশ্য মেজর বিষয়টির নানা দিক নিয়ে কাটাতে হয় যাতে ওই বিষয়ে ভালো একটি দখল চলে আসে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য মেজরের ওপর গুরুত্ব বাড়ার কিছু প্রবণতা দেখা যাচ্ছে– কিছুটা বাজারমুখী ও পেশামুখী হবার চাপের কারণে। এই প্রবণতা আমেরিকা ছাড়া বৃটেন ও ইউরোপেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তারপরও প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চের ব্যাপারটিকে কখনোই ত্যাগ করা হয়নি।

পঞ্চাশ বছরেরও আগে আমাদের ছাত্রজীবন এবং তারো অনেক আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান বিষয় (অনার্স বিষয়) অনার্স নামক স্নাতক ডিগ্রিতে মুখ্য ভূমিকা দখল করে ছিলো। সাবসিডিয়ারি বা সহযোগী বিষয় যে দুটি নিতে হয় তাও ওই প্রধান বিষয়কে সহায়তা দেয়ার জন্য, অন্য কিছু নয়। যেমন পদার্থবিদ্যা যদি প্রধান বিষয় হয় তা হলে সহযোগী বিষয়কে সেটির প্রয়োজনে গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, কেমিস্ট্রি এরকম কয়েকটি বিষয় থেকেই দুটি বেছে নিতে হয় যার মধ্যে গণিত অবশ্যই থাকে। জোরটি দেয়া হচ্ছে প্রধান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করার ওপরে; যা আগেও ছিল, এখন বেড়েছে। সহযোগী বিষয়গুলো সম্ভবমত এই মূল বিভাগেই পড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আরেকটি প্রবণতা চতুর্মুখী শিক্ষার বিপরীতে এবং সার্বিক বিশ্বদৃষ্টির বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার বিপরীতে কাজ করছে তা হলো নানা কারণে, বিশেষ করে নানা স্বার্থে প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণের জন্য মৌলিক জ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোর সঙ্গে

আরও অনেক বেশি পরিমাণে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন বিভাগ যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও খুব সীমিত ও কেন্দ্রীভূত বিশেষজ্ঞের বিষয়ের ওপর। স্নাতকোত্তর বিষয় হিসেবে এগুলো চমৎকার অবদান রাখতে পারে, বিভাগ খোলার সময় সেভাবেই তাদের খোলা হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খা এতেও চলে আসে, এবং তাকে সাধারণ স্নাতক বিভাগে পরিণত করা হয়। অভিনবত্বের এবং সীমাবদ্ধ আওতার কারণে এগুলোর জনপ্রিয়তাও কম হয় না, কিন্তু তাতে যেটুকু প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চ আগে ছিল তাও আর থাকে না, মৌলিক বিষয়ের ভিত্ ছাড়াই বিশেষজ্ঞ গড়ার চেষ্টা হয়।

প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চের একেবারে বিপরীত মেরু যদি কিছু থাকে তাহলে সেটি হবে আমাদের দেশের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়– প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় দুনিয়াতে বিরল নয়, তবে আমাদেরগুলোর বিশেষত্ব হলো এখানে অন্য বিষয়গুলোর পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা থাকে না, নেহাৎ সাহায্যকারী কিছু বিভাগ হিসেবে থাকলেও– সেটি বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার সঙ্গে যায় না। দিগন্তকে বড় করতে হলে নানা বিষয়ের উচ্চ চর্চা সঙ্গেই থাকা দরকার, অন্তত সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে তো বটেই। নিউইয়র্কের র‍্যান্সলার পলিটেকনিক বিখ্যাত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ওখান থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করতে পারলে যে কোন পদার্থবিদ ধন্য হোন। তাতে প্রকৌশল ছাত্রদের দিগন্তও অনেক বিস্তৃত হয়। আমাদের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মানের নৃতত্ত্ব বিভাগ থাকলে বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মলেক্যুলার বায়োলজি বিভাগ দেশের সেরা ডিএনএ বিষয়ক বিভাগ হলে সেটিই মানানসই হতো।

আমরা যেই বৃটিশ শিক্ষার ঐতিহ্য থেকে আমাদের স্নাতক নীতি গোড়া থেকে প্রবর্তন করেছি সেই গোড়াতেই বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছিল একটু দেখা যাক। যে সময় বিশেষ করে অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজে দুটি একেবারে ভিন্ন সংস্কৃতির বিষয় নিয়ে এক সঙ্গে স্নাতক পড়াশোনা করা যেতো, যদিও প্রায়শ এর মধ্যে একটি প্রধান থাকতো। যেমন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তাঁর নিজের শিক্ষা জীবনের আলোচনায় বলেছেন ক্যাম্ব্রিজে স্নাতক পর্যায়ে পড়ার সময় অর্থনীতি যদিও তাঁর প্রধান বিষয় ছিল তিনি সেখানে গণিতের দর্শনের উপরও পড়াশোনা করেছেন এবং সেই সুবাদে শিক্ষক হিসেবে বার্ট্রান্ড রাসেল ও আলফ্রেড হোয়াইটহেডের মতো ওই বিষয়টির সৃষ্টিকারদের সান্নিধ্যেও আসার সুযোগ পেয়েছেন। রাসেলের

আত্মজীবনীতে আমি নিজেও পড়েছি ক্যাম্ব্রিজে কলেজের (ছাত্রাবাসের) হাউজ টিউটর হিসেবে কীভাবে দর্শনের নানা বিষয়ে এক এক জন ছাত্রের দীর্ঘ রচনা তাঁকে পড়তে হতো, ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করতে হতো, পরামর্শ দিতে হতো। আজকাল আমেরিকান স্নাতকের বহুবিষয় পড়ার সুযোগের বিপরীতে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটি, দুটি, বা কয়েকটি বিষয় মিলিয়ে পড়ার সুযোগ রেখে ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প স্নাতক ডিগ্রির ব্যবস্থা রেখেছে।

নানা বিদ্যার 'উদার' সম্পর্কঃ

আমেরিকার লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চ দেবার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে। চট্ করে লিবারেল আর্টস শব্দটি শুনলে ভুল ধারণা হতে পারে লিবারেল ও আর্টস উভয় শব্দের কারণেই। 'আর্টস' এখানে বিদ্যা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে সুকুমার কলা হিসেবে নয়। আর 'লিবারেল' শব্দটির এখানকার অর্থ ঐতিহাসিকভাবে এসেছে, 'রক্ষণশীলের' বিপরীতে যেভাবে 'উদারনৈতিক কথাটি ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে নয়। পুরো ব্যাপারটি আসলে প্রাচীন গ্রিক, বিশেষ করে এরিস্টোটলীয় সর্ববিদ্যার ধারণা থেকে এসেছে। সে সময় গ্রিসে এবং এর বহু পরে মধ্যযুগের ইউরোপে সব বিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করার রীতি ছিল– একটি হলো মেক্যানিকাল আর্ট (কুশলীর বিদ্যা) আর লিবারাল আর্ট (মুক্ত বিদ্যা)। মেকানিক্যাল আর্টের কারবার নানা হাতেকলমে শিল্প নিয়ে, যার ভেতর ছিল কৃষি, ব্যবসা, ইমারত নির্মাণ, ধাতু-কাঠ ইতাদির শিল্প, যেগুলো প্রধানত শিল্পী-সংস্থা (গিল্ড) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ওস্তাদ-কারিগরদের দ্বারা গঠিত গিল্ডের কথা মতো এগুলোর শিক্ষাকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষানবিশের কাছে প্রাপ্য করতো, আবার অন্যদের কাছে দুষ্প্রাপ্য করতো।

এর বিপরীতে দর্শন, গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন (বিজ্ঞান), জ্যোতির্বিদ্যা (বা সে সময় জ্যোতিষ শাস্ত্রও), সাহিত্য, সঙ্গীত, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, নন্দন বিদ্যা এগুলো ছিল লিবারেল আর্ট। লিবারেল এখানে মুক্ত অর্থে অর্থাৎ কিনা পেশা-নির্ভর বাধনে না থেকে স্বাধীন মুক্তবুদ্ধির চর্চা। আধুনিক আমেরিকান লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানববিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের একটি ভারসাম্যমূলক দখল স্নাতক পর্যায়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাতে তাদের মতে একটি চতুর্মুখী বহুমাত্রিক বিশ্বদৃষ্টি ছাত্র অর্জন করতে পারে। সেখানকার সত্যিকার লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় আমার সাম্প্রতিক কালেই হয়েছে। কিন্তু ওই বহুমাত্রিক

বিশ্বদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাটি বহু আগে নিজের ছাত্রজীবন থেকেই অনুভব করেছি। ওরকম একটি মিশ্রণের মধ্যে বাস করতে আমার সব সময়েই লোভ ছিল, এখনো যেটি মোটেই কমেনি।

প্রশস্ত দৃষ্টিমঞ্চ সম্ভব হয় প্রতিটি বিষয় একেবারে আলাদা না থাকার কারণে– এক বিষয় অন্য বিষয়ের ওপর নানাভাবে প্রভাব রাখে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি এখন অনেক বেড়েছে, অন্যান্য নানা বিষয়কে এটি বিভিন্ন ভাবে স্পর্শ করে। আগে যেগুলোকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-স্পর্শহীন বলে মনে করা হতো। ইতিহাসকে, সমাজবিদ্যাকে, মনোবিদ্যাকে এখন খুবই বিজ্ঞান-নির্ভর প্রত্নতত্ত্ব, জীব বিবর্তন তত্ত্ব, মস্তিষ্ক বিদ্যা ইত্যাদির আলোকে দেখতে হয়। এমনকি সঙ্গীতের মৌলিক বিশ্লেষণও এর মধ্যে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি চিকিৎসাবদ্যার রোগ নির্ণয়ে বহুল ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এমআরআই দিয়ে মস্তিষ্ক স্ক্যান করে চমৎকার প্রমাণিত হয়েছে যে সঙ্গীত কীভাবে মানুষের কগ্‌নিটিভ ক্ষমতা অর্থাৎ অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। বিজ্ঞানকে ওসব মানববিদ্যার থেকে দূরে রাখার সুযোগ এখন কম। অন্যদিকে মানববিদ্যাগুলোর মধ্যে এমন একটি ঝিলিক দেয়া সৃজনশীলতার সুযোগ আছে, যা বেশি বেশি করে বিজ্ঞানীর আচরণে, তারও মস্তিষ্কে ঝিলিক দেয়া তত্ত্বের জন্মকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির কাছে হৃদয়গ্রাহী করে বিজ্ঞানের পরিবেশনে ও ব্যাখ্যায় মানব বিদ্যার উপলব্ধি ও উপমাগুলো অত্যন্ত সহায়ক হয়, এমনকি বিজ্ঞানীর নিজের উপলব্ধির জন্যও। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, এক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করতে পারে। এটিই নানাবিদ্যার উদার সম্পর্ক– তার সবটুকু দিয়ে দেখার বিশ্বদৃষ্টি।

এর আগে দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স সিস্টেম চালু হওয়ার আগে পদার্থবিদ্যা বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে সেটি শুরু করেছিলো। যে ক'জন নবীন শিক্ষককে এটি প্রবর্তনে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তার মধ্যে আমিও একজন। ওটি আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার বহুদিন পর নব্বই এর দশকে মাঝামাঝি সময়ে আমি উদ্যোগী হয়ে আমার পছন্দের কিছু পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা পদার্থবিদ্যা বিভাগে চালু করতে পেরেছিলাম সহকর্মীদের সমর্থন পেয়েছিলাম বলে। তা হলো বহুদিনের ঐতিহ্য ভেঙ্গে এবার মানববিদ্যা বা সমাজবিদ্যা থেকে কোন একটি বিষয়কে সহযোগী বিষয় হিসেবে নিতে পারা। সেই সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞান উন্নত করার জন্যও একে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। পদার্থবিদ্যার নিজের ভেতরেও আমার অতি প্রিয় দুটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম–

পদার্থবিদ্যার ইতিহাস এবং পদার্থবিদ্যার দর্শন। আমার সব সময় মনে হয়েছে এই দুটি ছাড়া পদার্থবিদ্যার পটভূমিটি যেমন বোঝা যায় না তেমনি তার জ্ঞানকে সত্যিকার বিশ্লেষণের সম্মুখীন করা যায় না। সেটি করতে হলে বিষয়ের থেকে একটু সরে একটু দূর থেকে তাকে দেখতে হয়। ইচ্ছে ছিল পদার্থবিদ্যা বিভাগে এর সার্থকতা সৃষ্টি করে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা। কিন্তু আমাদের সেই আশা পূরণ হয়নি, পদার্থবিদ্যা বিভাগ নিজেও এটি বেশিদিন বজায় রাখেনি।

বিভিন্ন বিষয়ে পছন্দমত বেশ কিছু কোর্স করার ব্যাপারটি আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন কোনটিতে রয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি সেখানেও প্রধান বিষয়টির বিশেষজ্ঞ হবার দিকেই লক্ষ্য থাকাতে বাকি বিষয়গুলো সহজেই অতীতে পরিণত হবার সম্ভাবনায় থাকে ওই মাত্র তিন-চার মাসের কোর্সটি শেষ হবার পরে পরেই। সব পক্ষের জোর দেয়াটি বিশেষজ্ঞ হবার দিকে, এবং স্মার্ট হয়ে চাকরির বাজারে মূল্য পাওয়ার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যেটি মর্মকথা সেই বিশ্বদৃষ্টির আকাঙ্খা সেটি সর্বত্রই গৌণ।

শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাটি কোথায়?

বিশেষ বুদ্ধিতে নয়, মুক্ত বুদ্ধিতেঃ

নানা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উচ্চ-শিক্ষার বহু বিকল্প রয়েছে যেখানে স্কুল-উত্তীর্ণ ছাত্ররা যেতে পারে। এগুলোর প্রত্যেকটি জীবন-জীবিকার উন্নত অর্জনে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। দেশে-বিদেশে এরকম বহু উচ্চতর শিক্ষা-আয়োজন দেখেছি, তার কোন কোনটির সঙ্গে নানা ভাবে জড়িতও হয়েছি। এগুলোর মধ্যে আছে পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল উচ্চতর স্কুল (যেমন জার্মান হখশ্যুলে), কম্যুনিটি কলেজ, কলেজ অব ফারদার এডুকেশন, ডুয়াল সিস্টেম এডুকেশন ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে, আবার এগুলোর কোন কোনটি ওই শর্তপূরণ করে কালক্রমে নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে, বেশ কিছু হয়েছেও। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ওই আগ্রহ প্রকাশ করেনা কারণ ওদের এই বিকল্প উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেই তাদেরকে তাদের লক্ষ্যে ভালোভাবে নিয়ে যেতে পারে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে মানানসই পদ্ধতিতে। আর ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশও নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে চায় না, কারণ নিজ ভূমিকাতেই তারা দেশে বিরাট অবদান রাখে এবং খুবই নামকরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের যারা এই প্রতিষ্ঠান থেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের অনেকে অন্যভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ওই বিশ্বদৃষ্টিটি অর্জনের চেষ্টা করে কর্ম জীবনে, এমনকি অবসর গ্রহণেরও পর। এটি তাঁরা করেন নিজের উদ্যোগে, নানা উন্মুক্ত কোর্সের সুযোগ নিয়ে, অথবা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে। কাজেই কিছুর দরজা কোথাও বন্ধ হবার প্রয়োজন নেই।

আজকাল অবশ্য অনেক দেশে (আমাদের দেশ সহ) ওই উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু কিছু ভূমিকাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সবাই সবকিছু বিশ্ববিদ্যালয় নামের বাতাবরণেই পেতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে বলেই এমনটি হচ্ছে। যেমন নানা পেশাগত শিক্ষা, বাস্তব জীবন দক্ষতা অর্জন– যেমন ব্যবসা কৌশল, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, নিজেকে উপস্থাপনা, ভাষা-শিক্ষা, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় যদি এসব দক্ষতাকেও সার্থকভাবে তার কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তাহলে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু নেই। কারণ যে তরুণ-তরুণী উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তারও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন থাকে, এবং তা বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতার ওপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে। কিন্তু সমস্যা হয় যখন সেটি বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার সেই প্রাথমিক শর্ত পূরণের বিনিময়ে (যাকে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-ভূমিকা)। এই শর্ত পূরণে জ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জনের ব্যাপারটি আছে, একটি উচ্চতর বুদ্ধিভিত্তিক সৃষ্টির আনন্দ-অনুভূতির ব্যাপার আছে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন যে সব মৌলিক বিদ্যায় সেগুলোকে ভিত্তি করার ব্যাপার আছে। মানুষের যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও তার মধ্যে মৌলিক বুদ্ধিভিত্তিক ঐক্য আছে, এসবের আত্মীকরণের মাধ্যমে ভেদ-বুদ্ধির উর্ধে উঠে বিশ্ব-নাগরিক হয়ে ওঠার ব্যাপারও আছে। এসবের ব্যবস্থা করাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব।

আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক হয়ে ওঠার পথে এই শর্ত গ্রহণের দু ধরণের দুটি চিত্রকল্প রয়েছে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে আবার কিছুটা নানা ভাবে জানতে পেরে। একটির উৎস বৃটেনে, যার কিছু রেশ সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি– নেহাতই রেশ মাত্র। তাতে ক্যাম্ব্রিজের কলেজে ছাত্র-শিক্ষকে হরদম আলাপ হচ্ছে, ওটি ছাত্রাবাস হলেও যেন জ্ঞানের সঙ্গেই বসবাস। এটি যেন নিমজ্জনের একটি ধীর গতির ব্যবস্থা, অনেক স্বাধীনতা দেয়া আছে, পরীক্ষার ঘনঘটা কম, কিন্তু দায়িত্ব অনেক বেশি; অনেকদিন জমিয়ে জমিয়ে পুরো বিদ্যার একটি সার্থক জবাবদিহিতা

করতেই হবে। অন্য চিত্রকল্পটি আমেরিকার, আগের চিত্রকল্পটির ঠিক বিপরীত। ওটিকে বলতে পারি দ্রুতগতির নিমজ্জন। প্রথম দিন থেকেই সুনির্দিষ্ট পাঠ্য বই ধরে পড়াবার বিরাম নেই। তখন থেকেই ক্লাসে প্রতিদিন প্রশ্ন, দিন দিন কুইজ, ক'দিন পরপর এসাইনমেন্ট একেবারে তটস্ত ভাব, বিষয়বস্তু থেকে এক দন্ডের জন্যও পালাবার উপায় নেই। এও জ্ঞানের সঙ্গে অন্য রকম বসবাস। চোখা চোখা প্রশ্ন–স্পষ্ট উত্তর চাই। এমনকি পুরো প্রশ্নোত্তরকে বহু-নির্বাচনী পদ্ধতিতেই নিয়ে যাওয়া হয় প্রায়শ– উত্তর চার রকমের দিয়েই দিয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে বেছে নিতে হবে কোনটি ঠিক। মাথার মধ্যে উত্তর ঝিলিক দিয়ে না গেলে চলবে না, ভাবনা-চিন্তা করে নানা উত্তর তুলনা করে, কিছুটা আন্দাজ করে উত্তর দেবো সে উপায় নেই– সে সময় দেয়া হয় না। ওখানকার এক ছাত্র আমাকে বলেছিলো উত্তর মাথায় রাখলেও হবে না, মাথা থেকে হাতের কলমে আনার সময়ও দেয়া হয় না, উত্তর যেন হাতের আগায় রাখতে হয়। এর অর্থ সারাক্ষণ বিদ্যাটির মধ্যে থাকা, একে নানা দিক থেকে দেখা, এর সঙ্গে সুগভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। যেহেতু প্রশ্ন আর উত্তরগুলোর সব শুধু তথ্য নিয়ে নয়, বিশ্লেষণ নিয়েই বেশি, তাই মুখস্থ করে রাখবো তার উপায় নেই। কিন্তু হায় আমাদের বর্তমান চলতি পরিস্থিতিকে এই দুই চিত্রকল্পের কোনটার সঙ্গেই মেলাতে পারছি না।

উভয় চিত্রকল্পেরই একটি উচ্চ আকাঙ্খা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এমনি উচ্চ আকাঙ্খার জায়গা তরুণ-তরুণীদের জন্য, তার জন্য ওরা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এভাবে উদ্ভ্রান্তের মত চার বছর বিদ্যার রাজ্যে কাটিয়ে গেলে সাধারণ চাকরি দাতারা কেন তাদেরকে মূল্য দেবে? চাকরিতে যা প্রয়োজন সেই দক্ষতাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য নানা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন থেকেও আসতে পারে। যেমন ভাষা, উপস্থাপন, গণসংযোগ, যোগাযোগ, বিশ্লেষণ, ব্যবসা-কৌশল, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি যে সব দক্ষতা নানা চাকরিতে প্রয়োজন হয় তার জন্য স্কুলের পর নানা রকম উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি যেগুলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কম সময়, কম ব্যয়, এবং কম অন্যান্য বিনিয়োগে সম্ভব হয়। তা ছাড়া ওসবের অনেকগুলোতে সরাসরি পেশা সংশ্লিষ্ট হাতে কলমে কাজের ও শিক্ষানবিশীরও অনেক সুযোগ থাকে যতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ততটা থাকে না। আরও বড় কথা বহু চাকরির ক্ষেত্রে সব থেকে বড় শিক্ষা হলো চাকরিতে কাজ করতে করতে শিক্ষা। ভালো একটি স্কুল-কলেজ শিক্ষার পর সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থী-চাকরিজীবী হিসেবে আসল কাজে যোগদান করে

ফেললেই বরং বেশি এগিয়ে যাওয়া যায়। এটি আমাদের দেশে খুব বেশি সম্ভব হয়না কারণ এখানে বহু চাকরির জন্যই দরখাস্ত করতে ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স ইত্যাদি ডিগ্রি চাওয়া হয়। উন্নত দেশসহ বেশির ভাগ দেশে তা হয় না, যেখানে চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোই চাওয়া হয়; তা ছাড়া সেখানে স্কুল শিক্ষার ওপর আর একটু বেশি আস্থা থাকে।

কিন্তু তারপরও দেখা যায় চাকরি দাতাই হোক আর তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই হোক– সবার বেশি পছন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। প্রায়শ দেখা যায় যে চাকরির প্রথম দিকে দক্ষতার দিক থেকে পিছিয়ে থাক্‌লে সেটি কাজ করতে করতে অনেকটা অর্জন করা যায়, কিন্তু ওই বিশ্বদৃষ্টি অমূল্য, ওটি ওভাবে অর্জন করা যায় না। এটিই পছন্দের বড় কারণ হবার কথা। তাছাড়া চাকরি দাতাদের মনে আরও একটি বিষয় কাজ করে। চার বছর ধরে ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞানের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে যাচাইয়ের পর যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে (যেখানে তা হয়) যে টিকে এসেছে, চাকরিতে সত্যিকারের সমস্যা সমাধানেও সে এমনিভাবেই লেগে থাকতে পারবে। যা কারো আশা করা উচিত নয় যে ছাত্ররা হুবহু চাকরির বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনে আসবে, শিখে আসবে। অধিকাংশ চাকরির কাজের সঙ্গে পাশ করে আসা বিভিন্ন বিদ্যার সরাসরি সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা কম– দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোনটাই নয়; এমনকি বিশেষায়িত ধরণের কাজ না হলে পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি বা জীববিজ্ঞানও নয়। তারপরও যে মানব উদযাপনের এই এক একটি পথের সার্থক পথিক সে আপাতত সামনের তাৎক্ষণিক কাজের পথটুকুও সানন্দে চলতে পারবে এটি আশা করা যায়। এমনি একটি জ্ঞানের বিষয়ের গভীরে যখন কেউ যায়– সেটি সাহিত্য, গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা যেটিই হোক– তার ভেতরে সে মনন, যুক্তি, বিশ্লেষণের সৌকর্য আত্মস্থ হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই তখন সে অন্য যে কোন সমস্যার ভেতর তার সেই অর্জিত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করতে পারে। এটি ট্রেনিং পাওয়া বিশেষ বুদ্ধি নয়, এটি মুক্তবুদ্ধি। যে কোন সমস্যাকে চারদিক থেকে দেখার সুযোগ দিয়ে এটি মত-বৈচিত্রকে সম্মান করতে শেখায়, নতুনকে আবাহন করতেও।

দেশে-বিদেশে এর একটি বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে সরাসরি চাকরির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক করার জন্য। এজন্য ফলিত ও সীমিত গণ্ডির নতুন নতুন বিষয়ে স্নাতক হবার ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন আগে যেটি পদার্থবিদ্যা ছিল এখন তা ফলিত পদার্থবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এভাবে আরও ফলিত বিষয়ে বিভক্ত হয়ে

চলেছে। আগে যা সাংবাদিকতা ছিল এখন তা মিডিয়া স্টাডিজ, কম্যুনিকেশন্স, ব্রডকাস্টিং ইত্যাদি আরও ফলিত বিভাগে বিভক্ত হচ্ছে– এরকম প্রায় প্রতিটি বিষয়। উদ্দেশ্য একটিই– সেই বিশেষজ্ঞ সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে চাকরি পাওয়াটি নিশ্চিত করা, বা অন্তত করার আশ্বাস অনুভব করা। মৌলিক বিষয়গুলো– যেমন গণিত পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি, ইতিহাস, দর্শন, এগুলো জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে অর্থাৎ মৌলিকের বদলে শাখা-প্রশাখারা গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। এটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে– শুরু থেকেই বিশেষায়িত হবার চাপে চতুর্মুখী বিশ্বদৃষ্টি লাভ আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। একইভাবে ব্যবসা প্রশাসন এখন প্রবলভাবে স্নাতক শ্রেণীতে চলে এসেছে; আগে যা মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর স্নাতকোত্তর পর্যায়েই বেশি ছিল। কিন্তু আধুনিক যেই বাস্তব ব্যবসা প্রশাসন তাতে শুধু ব্যবসা নিয়েই পড়লেই চলে না, ব্যবসার বিভিন্ন দিক ও কলাকৌশল জানলেই চলে না। এখানেও কার্যক্ষেত্রে ভালো করার উপায় হলো বিশ্বদর্শন, আধুনিক বিশ্ব-নাগরিকত্ব লাভ করা। ব্যবসা প্রশাসনের স্নাতক হবার সময় দু'একটি অন্য বিষয়ের কোর্স কয়েক মাসের জন্য করলে সেই নাগরিকত্ব লাভ করা যায়না– সেগুলোর কোন কোনটিতে রীতিমত নিমজ্জন প্রয়োজন।

আধুনিক বড় বড় ব্যবসাগুলোর পরিচালনায় যে কর্ণধাররা সফল হয়েছেন তাঁদের অনেকে ব্যবসা-বহির্ভূত বিষয়ে এমনি নিমজ্জনের ভালো উদাহরণ। একেবারে সাম্প্রতিক কালের এরকম কিছু কর্ণধারদেরকে দেখা যাক; বিখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা ডেল এর প্রধানের বিশ্ববিদ্যালয় বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার ক্ষেত্রে শুরু থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইবিএম এর সাম্প্রতিক প্রধান নির্বাহীর বিষয় ছিল ইতিহাস, ব্যাংকিং-খ্যাত আমেরিকান এক্সপ্রেসের প্রধানেরও শিক্ষা ইতিহাসে। বিখ্যাত বিউটি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্যের কোম্পানি প্রক্টর ও গ্যাম্বলের প্রধান ইতিহাস ও ফরাসি ভাষায় স্নাতক। জে পি মরগ্যানের দুই প্রধানের একজনের বিষয় অর্থনীতি, আরেক জনের মনোবিদ্যা। ডিজনির প্রধানের বিষয় ছিল সাহিত্য ও নাট্যবিদ্যা। ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার সংক্রান্ত অনন্য কোম্পানি হিউলেট প্যাকার্ডের প্রধান নির্বাহীর শিক্ষার বিষয় ইতিহাস ও দর্শন; এবং ফাইনানশিয়াল টাইমসের সম্পাদকের বিষয় নৃতত্ত্ব। ব্যবসা প্রশাসনের বাস্তবতায় ধাপে ধাপে উঠেই তাঁরা উচ্চতম জায়গাটিতে যেতে পেরেছেন, আর এই যাওয়াতে সহায়ক হয়েছে মৌলিক জ্ঞানের অন্তত একটি শাখায় নিমজ্জন।

আরও উন্মুক্ত হবার হাতছানিঃ

যুক্তরাষ্ট্রের মত কিছু কিছু দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল। ছাত্ররা প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ঋণ অবশ্য সবাই পেতে পারে, কিন্তু সেই ঋণের বোঝা অনেককে সারা জীবন বহন করতে হয়। ওখানে সনাতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠছে। খুব সাম্প্রতিককালে এ প্রশ্ন জোরদার হবার দুটি প্রধান কারণ দেখতে পাচ্ছি। এর একটি হলো প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির কারণে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ভবনে শিক্ষাস্থলকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা এখন দ্রুত কমে যাচ্ছে। অন্যটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ওই বিশ্বদৃষ্টির বিদ্যালয় হিসেবে দেখার বদলে নানা সুনির্দিষ্ট পেশায় চাকরি লাভের বাহন হিসেবেই বেশি বেশি দেখা হচ্ছে, যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কম সময় ও কম ব্যয়ের বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধাজনক হতে পারে। ইন্টারনেট, নানা শিক্ষা সফ্‌টওয়্যারের উন্নয়ন, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতি এখন দূর-শিক্ষণকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ শিক্ষণে পরিণত করেছে। এটি স্বল্পব্যয়ে সম্ভব, সবার জন্য খুবই সুবিধাজনক, অথচ শিক্ষার নানা উৎসে অবগাহনের জন্য খুবই যুৎসই। বলতে গেলে শিক্ষাকে এখানে একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসের অবয়ব থেকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রধানত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে এটি ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পর কাছাকাছি না থাকার ঘাটতিটুকুও অনেকাংশে মিটিয়ে দিতে পারবে মনে করা হচ্ছে। যেমন শিক্ষক সামনে থেকে যেভাবে ছাত্রের বলাতে বা লেখাতে তাদের যে ভুল ধারণা, বা অনুধাবনের ভঙ্গি ইত্যাদি বুঝতে পারেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও তা পারবে। আজকাল স্বাধীনভাবে এরকম যে কোন বিশেষায়িত বিষয়ের ওপর কোর্স করা যায়, যে কোন পর্যায়ে–তাতে ক্লাস, বই, চর্চা, পরীক্ষা, সনদ সবকিছু থাকে। উচ্চ মান সম্পন্ন এরকম যে কোন ব্যবস্থা থেকেই সেই জ্ঞান ও দক্ষতার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সপক্ষে একটি বড় যুক্তি দেখানো হয় সেটি হলো সতীর্থ ও জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে চার বছর কাটানোর ফলে যা অর্জিত হয় সেটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের একটি অত্যন্ত বড় অর্জন। স্নাতক হিসেবে পরবর্তীতে তারা যে মূল্য লাভ করে তার অনেকটা আসে সেখানে থেকে। ছাত্রাবাসে, ক্লাসে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক নানা কাজে সতীর্থরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে, সারাক্ষণ একসঙ্গে চর্চা, মতবিনিময়, পরস্পরের সম্পূরক ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যমেই ওই বিশেষ অর্জনটি আসে। একই কথা ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পর সান্নিধ্যে থাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় যত সার্থক, যত নামকরা এই অর্জনটিও তত বেশি হয়– সেখানে ছাত্র-শিক্ষকের উচ্চ মানের কারণে। খেলার দলে, নানা বিষয়ক ক্লাবে, নানা উদ্যোগে নিজেদের নেতৃত্ব সক্ষমতার বিকাশেও এই অভিজ্ঞতা অমূল্য। সতীর্থ ও শিক্ষকের দীর্ঘকালীন সান্নিধ্যের এই প্রভাবের দাবিতে যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে তা আমার নিজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। বছরের পর বছর একত্রে ক্লাস করতে গিয়ে কার্জন হলের নানা ভবনে এবং তারো চেয়ে বেশি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বিভিন্ন বর্ষের যাদের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়েছি, তাদের ও আমার আগ্রহের নানা বিষয়ে গভীর আলাপ করেছি, প্রশস্ত দিগন্তের ছাত্র-রাজনীতি করেছি, তাদের অনেকের সঙ্গে বন্ধন সারা জীবনেও কখনো কাটেনি। সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সপক্ষে এটি একটি বড় যুক্তি; কিন্তু হায়, সারা দুনিয়াতেই নানা টানাপোড়েনে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঘনিষ্ঠতা কমে যাচ্ছে। আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন ছাত্রাবাস ও ছাত্র রাজনীতির পরিস্থিতিটি ভিন্ন রূপ ধারণ করার কারণে সেটি বদলে গেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওরকম ঘনিষ্ঠতার সুযোগ বরাবরই কম। এতো আনন্দ-স্ফূর্তিতে মামুলি সময় এক সঙ্গে কাটানো নয়, এ জ্ঞানের বিষয়ে পরস্পরের বিক্রিয়ার, পরস্পরের দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়াটির, মেধাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব ঘটার ব্যাপার। সেটি কতখানি আছে?

আবার যদি শুধু আমেরিকার কথায় ফেরৎ যাই, বা আরও নির্দিষ্ট করে উত্তর আমেরিকার যে দুটি দেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সারা দুনিয়ার ঈর্ষা সেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কথায়, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি দিন দিন জটিল হচ্ছে। এত ব্যয়ের এসবের বিনিময়ে যা পাচ্ছি তা কি যথেষ্ট? প্রবণতা হচ্ছে পাশ করার পর কত বড় চাকরি পাব তা দেখিয়ে আকৃষ্ট করা, এখন তার ওপর অনেকে ভরসা করতে পারছে না। সাধারণ ছাত্রদের প্রশ্ন আমাদেরকে অত্যন্ত উচ্চ মেধা প্রমাণ করে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে হয়েছে, অথচ যারা উচ্চ অর্থ অনুদান দিচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে এবং নামকরা তারকাদের ছেলেমেয়েদেরকে অন্যায়ভাবে সব গুণের যুক্তি দেখিয়ে কম মেধায়ও ভর্তি করার প্রমাণ মিলছে; আবার নানা খেলাধূলায় পারদর্শী হলে কোন মেধাই লাগেনা ভর্তি হতে– খেলাধূলার এতই গুরুত্ব! তাহলে এত ব্যয়, এত পরিশ্রম কবুল করে যে ছাত্ররা এখানে এলো তারা কী ধরণের শিক্ষার জন্য গর্ব করবে। লেখাপড়া সর্বত্র একই রকমের– মূলত চাকরিমুখী। সতীর্থদের সেই বন্ধনও এখন দুর্লভ। বহু নোবেল বিজয়ী সহ অত্যন্ত নামকরা জ্ঞানী-গুণীরা এখানে

অধ্যাপক হিসেবে আছেন একথা সত্যি। তবে তাঁদের সঙ্গে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের কোন যোগাযোগ নেই– তাহলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব হতে পারেন, আমার গর্ব হবেন কেন? সবকিছু ভেবে, কিছুটা নিরাশ হয়েই এখন অনেকে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এও বলছেন যে এরা শুধু এদের নাম বিক্রয় করছে– যেটি এক সময় তারা সঙ্গতভাবেই অর্জন করেছিলো সেই নাম। ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত এখান থেকে বাড়তি যা পাচ্ছে তা হলো নিজের শিক্ষা সনদের ওপর এদের সেই নাম করা সীল। এই সীলটুকুর জন্যই এত অসম্ভব বাড়তি ব্যয়, এত অসম্ভব মেধার পরীক্ষা! তবে সর্বত্র এই সীলকে দাম দেয়া হয়– চাকরিদাতা থেকে শুরু করে সামাজিক মূল্য যাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁরা সবাই। বিশ্ববিদ্যালয় অন্য কী কতটা দিয়েছে তা নয়, শুধু ওই সীলটুকুরই মূল্য। হয়তো এটি অতিরঞ্জিত কথা, নিরাশাবাদীদের মতামত, কিন্তু তবুও দুঃখজনক; কারণ এরাই সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বসেরা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি দেখলাম ওখানকার সেরা বিশ্ববিদ্যালগুলোর ওপর বিরক্ত হয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে প্রচুর চিন্তা করেন এমন কিছু উদ্যোগী মানুষ ইউনিভার্সিটি অফ অস্টিন নামের একটি নতুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হার্ভার্ডের প্রফেসর ও বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক স্টিভেন পিঙ্কারের মনোবিদ্যা ও বিবর্তন সংক্রান্ত লেখাগুলোর এবং জ্ঞানচিন্তার আমি একজন দারুণ ভক্ত। প্রধানত এ কারণেই তাঁদের বক্তব্যগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কে তাঁদের বড় সমালোচনা হলো এগুলো নিজেকে নানা অতি বিশেষায়িত কিছু বিভাগের ভেতরের কাজে আবদ্ধ করে ফেলেছে– তাও আবার নানা প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ম নিগড়ে খুবই অন্তর্মুখী। বিংশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা বিষয়ের মধ্যে অবাধ সংলাপ সম্ভব ছিলো। এখানকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ের হাজার গুণীর সমন্বয় মানহাটান প্রজেক্ট (নিউক্লিয়ার শক্তি ও নাৎসীদের আগে পরমাণু বোমা তৈরির লক্ষ্যে), সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লব, হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের মত আকাশচুম্বি অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলো– এখন তা সম্ভব হচ্ছে না। আরও বড় কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মুক্ত বুদ্ধির বা উন্মুক্ত বিতর্কের চর্চা থেকে অসহিষ্ণুভাবে চাপিয়ে দেয়া নির্দিষ্ট খাতের বিদ্যা চর্চাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে– যেখানে বেসুরো মতকে দমন করা বা তাড়িয়ে দেয়াটাই নীতি। ফলে ব্যতিক্রমী মেধাবী তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে থাকছে; এখানে বরং পেশা নিয়ে

চিন্তিতদের ভীড়। সাহসিকতার সঙ্গে এগুলো পরিহার করে নতুন যুগের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনা এই নতুন উদ্যোক্তদের লক্ষ্য। সমমনাদেরকে একত্র করা ছাড়া ঠিক কীভাবে যে তাঁরা এটি করবেন, তা এখনো স্পষ্ট করেননি।

এবার কোভিড-১৯-এর কারণে সারা দুনিয়ায় সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশ ধাক্কা খেয়েছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি-নির্ভর বিকল্পগুলো আরও বিকশিত হয়েছে। এটি হয়তো কোভিডের পর ঠিক আগের জায়গায় আর ফিরে যাবে না। তাছাড়া এমনিতে এই পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, যাতে একটি প্রধান ভূমিকা নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এর মধ্যে মনে মনে আমার একটি কামনা রয়েছে। যত কিছুই পরিবর্তিত হোক ছাত্রের বিশ্বদৃষ্টির উৎস হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রটি অক্ষুণ্ন থাকুক; যেখানে সে চরিত্রের হানি হয়েছে সেটির পুনরুদ্ধার হোক। পাছে সেটি সবার ক্ষেত্রে না হয় এজন্য একটি বিকল্প চিন্তাও মনের মধ্যে আছে, যাও ভিন দেশে বাস্তবায়িত হওয়া একটি পুরানো ধারণা, আজ নতুনভাবে প্রয়োজন অনুভব করছি– সত্যিকারভাবে উন্মুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি যখন বৃটেনে পড়াশোনা করতে যাই সেই ১৯৬৮ সনে সেখানে ওপেন ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়ে তাকে ঘিরে আশা-আকাঙ্খা খুবই তুঙ্গে উঠেছিলো। তখনই আমি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম– পঁই পঁই করে এর সব খবর রাখছিলাম। তখন এর উন্মুক্ত অংশটির প্রযুক্তি খুব সীমাবদ্ধ ছিল– শুধু ডাক বিভাগ আর রেডিও-টেলিভিশন। আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আমার প্রিয় বিষয়গুলোর ক্লাস যে ক'টি পারি টেলিভিশনে দেখতাম। আমার কাছে এর ধারণাটাই দারুণ লেগেছিলো। বৃটেনে অধিকাংশ মানুষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতোনা; কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকের আকাঙ্খা ছিল নিজের দিগন্তটিকে কোন এক সময় ধীরে ধীরে হলেও প্রসারিত করতে নিজের চলমান জীবন-জীবিকার মধ্যেই সময় করে নিয়ে, আবার ছাত্র হয়ে। এমনকি তাও না পারলে অবসর গ্রহণের পর অনেকে তা করতে চেয়েছে। তাদের জন্যই শুরু হয়েছিলো ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রচুর তোড়জোড় করে। এখনো তার সুফল আরও ভালোভাবে বৃটেনবাসী পাচ্ছে।

আমার বর্তমান চিন্তাটিও সে রকমেরই, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত। আজ এমনি একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আরও অনেক সহজ, প্রযুক্তির কল্যাণে। এমনকি ভাষাও কোন সমস্যা নয়, প্রযুক্তিই যার যার ভাষায় এর সব কিছুকে অনুবাদ করে দেবে,

বলতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে। যে যেখানে থাকি, যেই শিক্ষাই মূলধারায় পাই, যে কাজই করি; কখনো না কখনো সুযোগ করে এমনি একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো। আমার পছন্দের বিষয়ে, আমার ইচ্ছেমত গতিতে, একেবারে নিয়ম মাফিকই তার ছাত্রত্বের সব স্বাদ নেবো, তার চতুর্মুখী দৃষ্টিদানের সুযোগ নেবো, তার সনদও গ্রহণ করবো। এটি যদি আমার বর্তমান পেশায় (যদি থাকে) কোন কাজে লাগে, তাতে কোন উন্নতি হয় সে তো ভালোকথা; যদি না হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। দৃষ্টি প্রসারিত করাটাই, আনন্দ লাভটাই হবে আমার আসল উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ এরকম সুযোগকে স্বাগত জানাবে। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একে খুব সুলভে, এমনকি অনেকের জন্য বিনা ব্যয়ে, সবার বাড়িতে এনে যে দিতে পারবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করতে, তার মধ্যে বিদ্যাচর্চা করতে, তার পরীক্ষা দিতে, তার জন্য রচনা বা এসাইনমেন্ট লিখতে, তার এক্সপেরিমেন্টগুলো কম্পিউটার সিম্যুলেশনে করতে, তারা উপভোগ করবে; অধ্যাপকদের সঙ্গে, সতীর্থদের সঙ্গে অন্‌লাইনে আলাপ করতেও। শুধু সিম্যুলেশন হিসেবে কম্পিউটারে এক্সপেরিমেন্ট কেন, সেই পঞ্চাশ বছর আগে বৃটিশ ওপেন ইউনিভর্সিটি তার ছাত্রদের জন্য বুক-পকেটে রাখার মত যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ উদ্ভাবন করেছিলো, যে কেমিস্ট্রি কিট ঘরে কাজ করার জন্য অদ্ভুত সৌকর্যে তৈরি করেছিলো, তা আমাকে তখনই দারুণ মুগ্ধ করেছিলো। এখন যা করা যাবে এমনি বাস্তব সুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তার তো কোন সীমা নেই; আর তার উপকারভোগী হবে সারা দুনিয়ার মানুষ, কাজেই এগুলোর উন্নয়নের পেছনে প্রণোদনা থাকবে অনেক বেশি। বর্তমানে যেমনটি চলছে, তাতে মনে হয় যারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় একবার পাশ করে গেছেন তাঁদের অনেকেও পরে এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ভর্তি হবেন এবার নিজের মত করে শিক্ষা পেতে। বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ছাত্রের কথা চিন্তা করলে ও এতে মূল অধ্যাপকদের জ্ঞান ও পরিশ্রমের ব্যবহারের সম্ভাব্য দক্ষতার কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এমনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কাজ এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস। যে জিনিসটির ওপর একই সঙ্গে কাজ করতে হবে তা হলো সব মানুষের মধ্যে এর একটি চাহিদা বোধ জাগিয়ে তোলা– বিশ্বদৃষ্টির চাহিদা, সে যেই বয়সেই হোক না কেন। পুরো বিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতেও এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো সহায়ক হবে।

জ্ঞানের সৃষ্টির যেখানে শুরু

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমের একটি পুরানো দুর্বলতা হলো স্নাতক, স্নাতকোত্তর সব ডিগ্রিকে একাকার করে দেখা। মনে হয় সব থেকে বড় ডিগ্রি যেটি সেটি ছাড়া কারোই চলবে না। এক সময় পাস ডিগ্রি সব কলেজগুলোতে দেয়া হতো। সেখানে ওভাবেই সবাই স্নাতক হতো এবং সব কাজে সেই স্নাতকের চাহিদা ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেলো প্রথমে কিছু কলেজের এবং শিগগির অন্যান্য অনেক কলেজেরও অনার্স ডিগ্রি ছাড়া চল্‌ছে না। এরপর একই কলেজগুলোতে দিব্যি মাস্টার্স ডিগ্রি দানও চালু হয়ে গেলো। এতে যে সবাই উচ্চতর কাজ করতে গেলো তা নয়; সব রকম চাকরিতে শুধু ডিগ্রির চাহিদাটি বাড়িয়ে দেয়া হলো– মাস্টার্স না করলে দরখাস্তও করা যাবে না। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার পরও সবাই ভাবতে লাগলেন ন্যূনতম ডিগ্রি হিসেবে আগের মতই মাস্টার্স না করলে মান থাকে না। কাজেই সবার জন্য মাস্টার্স করাটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো– না করলে আত্মীয়স্বজন ভ্রু কুঁচকাবেন। চাকরি দাতারাও এখনো মাস্টার্সই ন্যূনতম চাইলেন– অর্থাৎ সবার জন্য ছয় বছরের বিশ্ববিদ্যালয়, অন্তত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অথচ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এক জিনিস হবার কথা নয়। স্নাতক জ্ঞান অর্জনের ডিগ্রি– সবার জন্য দৃষ্টিমঞ্চটি তৈরি করে। স্নাতকোত্তর শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, জ্ঞানের সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের জন্যও; তাছাড়া এর আগে-পরে সরাসরি এটি নিয়ে বাস্তবে কাজ করার জন্যও। স্বাভাবিকভাবেই এটি সব ধরণের কাজের জন্য আবশ্যকীয় হবার কথা নয়, দুনিয়ার কোথাও তা নয়। স্নাতকোত্তর সেখানে যারা করে কোন বিষয়ের গবেষণায় ও চর্চায় তাদের আকাঙ্খা থাকে– সম্ভবমত তাতে অভিজ্ঞতাওসঞ্চয় করে নেয় আগেইবেশ কয়েক বছর। আসলে আমাদেরও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম অনেকটা স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ওপরে নির্ভর করেই গড়ে উঠতো, এখনো তা করে। কিন্তু বরাবরই গবেষণা না করা স্নাতকোত্তর ছাত্রের সংখ্যাই অনেক বেশি। অথচ গবেষণা ও একাডেমিক আগ্রহ ছাড়া স্নাতকোত্তরের কোন অর্থ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মূল কথাটি হলো অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রের সরাসরি সংযোগে জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা। এটি মাস্টার্সে শুরু হয়– অনেকেই সেই গবেষণা-অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণাধর্মী বা চর্চাধর্মী বাস্তব কাজে চলে যায়। সেখানে ওই গবেষণা অভিজ্ঞতাটিই তার কাজকে সাধারণ কাজ থেকে আলাদা করে; তাই মাস্টার্স

নেহাৎ আরও কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে আরও কিছু জ্ঞান অর্জন করা নয়– এটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। স্নাতকোত্তরে যাওয়াদের মধ্যে কেউ কেউ গবেষণার পরবর্তী পর্যায়ে যেতে চায়; তাদের আকাঙ্খা আরও বহুদিন ওই জ্ঞান সৃষ্টির জগতে ছাত্র হিসেবে একটি সমস্য নিয়ে থেকে তাতে নিজের নতুন অবদান রাখা– তারা ডক্টরাল ছাত্র। তারা তখন একজন পরিপক্ক গবেষকের তত্ত্বাবধানে থাকলেও নিজেও গবেষক বৈ নয়। পিএইচডি লাভের পরও অনেকের এই ধারাবাহিকতা শেষ হয় না– এই রাজ্যে শুধুই গবেষণা নিয়ে তারা থেকে যায় পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চে, এবং তারপরও নানাভাবে জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান প্রসারের কাজে। অন্তত উন্নত দেশে এরকম অনিশ্চিত ও যথেষ্ট অর্থ-উপার্জনহীন পরিশ্রমের কাজ অধিকাংশের কাছে কাম্য নয়। পুরো ব্যাপারটি ঘটে নিজের ভালো লাগার বিষয়ে মগ্ন হয়ে থাকার আগ্রহে এবং তাতে কিছু যোগ করার আকাঙ্খায়; আর পরে নিজেও এতে পরিপক্ক গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আশায়।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইত্যাদি দেশে চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসা প্রশাসক, এরকম কিছু পেশাগত শিক্ষার ব্যাপারটিও স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের। যথারীতি স্নাতক হবার পর মেডিক্যাল স্কুল, ল' স্কুল, বিজনেস স্কুল ইত্যাদিতে ওই পেশাগত শিক্ষা শুরু হয়; মেডিক্যালে এর জন্য হাসপাতালে শিক্ষানবিশীসহ প্রায় ১০ বছর এবং আইন পেশার জন্য অন্তত ৩-৪ বছর পড়াশোনা করতে হয়। কাজেই যেদিক থেকেই দেখিনা কেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়– একে সবার জন্য সাধারণভাবে অবশ্যকরণীয় করে তোলা মানে অনাবশ্যকভাবে সত্যিকার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তাকে দূরে রাখা। শিক্ষার জগত এবং কাজের ও জ্ঞান সৃষ্টির জগতের মিলন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে, কিন্তু গুরুত্বটি থাকে জ্ঞান সৃষ্টির ও পেশাদার কাজের দিকেই।

অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের স্নাতক চালু হবার পর পর মাস্টার্স নিয়ে কী করা হবে না হবে তা নিয়ে অধ্যাপকদের নীতিনির্ধারণী সভায় যখন বিতর্ক চলেছে তখন আমি মাস্টার্সকে গবেষণাধর্মী কোর্স হিসেবে শুধু সেদিকে আগ্রহীদের জন্য রাখার পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু অধিকাংশদের মত ছিল স্নাতক পর্যায়ে কাউকেই যেন পড়াশোনা শেষ না করতে হয় সেই ব্যবস্থা করা। সে জন্য স্নাতক শ্রেণীর বদলে মাস্টার্সকেই সবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। এমন ঘোষণার পর মাস্টার্স পাশ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাওয়া কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য থাকেনি– না অভিভাবকের কাছে সন্তুষ্ট হবার জন্য, না

চাকরি দাতার কাছে চাকরি দেয়ার জন্য, না সমাজের কাছে সামাজিক মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে। তাও ভাগ্য ভালো যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর স্নাতককেই বহু বেসরকারি ও বাণিজ্যিক চাকরিদাতারা গুরুত্ব সহকারেই নিয়োগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব বিকল্প রয়েছে– কলেজ, পলিটেকনিক ইত্যাদি সেখানেও সমান গুরুত্ব না দিলে, তাদের সমৃদ্ধ অবদানের সুযোগ করে না দিলে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো কখনোই প্রয়োজনীয় মূল্য ও সামাজিক মর্যাদা পাবেনা– শুধু বৈষম্যই সৃষ্টি করবে, নিজেদের কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে পারবেনা– তরুণদের মধ্যে চাহিদাও সৃষ্টি করতে পারবে না। উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি তাদেরো অনেক গুরুত্ব, তাই সব পর্যায় থেকে সবাই জীবন গড়তে পারছে, দেশও গড়তে পারছে। তার থেকেও বেশি গুরুত্ব ও বিনিয়োগ দরকার স্কুল শিক্ষার ওপর। কারণ এটিই দেশের জন সম্পদের ভিত্তি। যে সব জীবন-দক্ষতার কথা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা থেকে আশা করি তার মূল ভিত্তি ও কাঠামো তৈরির সময় স্কুলেই পার হয়ে গেছে। ভাষা, গণিত, ও অন্যান্য সব বিষয়ের মৌলিক দক্ষতা এসব স্কুলে তৈরি হয়ে না গেলে এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু করার থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রচেষ্টা, অনেক বিনিয়োগ অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে স্কুলে ও ওই মৌলিক সক্ষমতাগুলো তৈরি না হবার কারণে। ওখানে পরীক্ষায় বড় বড় ফলাফল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বিপুল সংখ্যক ছাত্রের প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়ে উঠছে না। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক উপযুক্ত ও আগ্রহী তরুণ তরুণীর ওপর কেন্দ্রীভূত করে সেখানে ভিন্ন রকম বিনিয়োগ প্রয়োজন। এখানে গুরুত্ব দেয়া না দেয়ার ওপর নির্ভর করবে বিশ্ব সভায়, জ্ঞানের সভায় আমাদের আসনটি কোন জায়গায় হবে তা; জ্ঞান কতখানি আমাদের নিজস্ব হয়ে উঠবে তার প্রমাণ এখানে মিলবে। স্কুলেই সব ছাত্রের আকাঙ্খাকে হাউই বাজির মত ঊর্ধমুখী না করতে পারলে এটি সম্ভব নয়।

আমরা আগেই দেখেছি উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হতে যারা যায়, প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করে তারা মনের টানেই যায়, মনের টান আছে এমন বিষয়গুলোই পড়ে; বাধ্যতামূলকভাবে কিছুই করতে চায় না। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি আরও অনেক বেশি প্রযোজ্য– প্রায়ই দেখা যায় যে ও বিষয়ের এক রকম পাগল না হলে ওদিকে কেউ যায় না। আর যা নিয়ে পাগল তার অনেকটা হয়তো স্কুলজীবন থেকেই মাথায় ঢুকে আছে, কাজেই গবেষণা করতে গিয়ে, বা পেশার কাজ ঠিক করতে

গিয়ে ওই বিষয়কে টেনে এনে নতুন প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঠিক মিশিয়ে নেন। সেটি করতে গিয়ে আর্টস-সায়েন্সে প্রয়োজনে মেশাল দিতে তাঁর একটুও অসুবিধা হয় না। অনেক গভীরে গিয়ে, অনেক নতুন গবেষণা করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ওই চিরকালের পাগলামির বিষয়টিকে সঙ্গে নিয়েই তা করা, ওটা মাথা থেকে নামিয়ে নয়। এই কঠিন যাত্রার সাফল্য-সম্ভাবনা তখন অনেক বেড়ে যায়। এরকম সত্যিকার কয়েকজন সাধারণ স্নাতকোত্তর পাড়ি দেয়া মানুষের উদাহরণ নেয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ। স্নাতক পর্যায়ে তাঁর প্রধান বিষয় ছিলো জীববিজ্ঞান। কিন্তু সখ ছিলো কার্টুনে, এ্যানিমেশনে। নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন উৎস থেকে একেবারে পেশাদারের মতই এ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরি করতে শিখে যান, এবং এর মাধ্যমে জীবিকা অর্জনও করেন। এরপর তিনি পিএইচডি'র গবেষণা শেষ করেন তাঁর স্নাতকের বিষয় অনুসরণে কোষ-জীববিদ্যার ওপর। এখন তাঁর সুযোগ ঘটলো তাঁর অন্য আনন্দের বিয়টিকে এর সঙ্গে যুক্ত করার। জাতীয় গবেষণা ফান্ড থেকে একটি পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার অনুদান যোগাড় করলেন জৈব রসায়নে অণুর ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলোকে কম্পিউটার এ্যানিমেশনের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। এটি সফলভাবে করে তিনি দেখান যে ওই এ্যানিমেশন থেকে অণুগুলোর আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন খবর পাওয়া সম্ভব। একটি জৈব রাসায়নিক কোম্পানি তার রাসায়নিক পণ্যগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে এই এ্যানিমেশন প্রক্রিয়ার বড় সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তাঁকে এর বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করে। এভাবে তিনি বিজ্ঞানের একটি নতুন ও চমকপ্রদ উচ্চতর পেশা সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁর বিশেষজ্ঞ-বিষয় জৈব রসায়নের সঙ্গে তাঁর মূল সখ এ্যানিমেশন চলচিত্র তৈরির আনন্দকে কাজে লাগিয়ে।

দ্বিতীয় উদাহরণ। স্নাতক পর্যায়ে তাঁর প্রধান বিষয় কগ্‌নিটিভ সায়েন্স। এটি মনোবিদ্যার একটি আধুনিক শাখা। প্রাণীর আচরণের মধ্যে উচ্চতর উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায় কিনা সেটিই কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের বিষয়– মানুষের মধ্যে এটি ষোলো আনাই আছে, কিন্তু অন্য প্রাণীতে নেই। এদিয়ে মানুষ অন্য মানুষের মন বুঝতে পারে, সেই অন্য মানুষ কেন কী করছে তা বুঝতে পারে। কম্পিউটার যখন এমন বুদ্ধিমানের মত কাজ করে যে তার মধ্যে আমরা যেন এককরকম কগ্‌নিটিভ ক্ষমতা দেখতে পাই, তখন অনেক কিছু কম্পিউটারে করা সম্ভব। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিন্তু কাজ নেন একটি ডিজাইন ফার্মে– কারণ স্কুল জীবন থেকেই তাঁর আকর্ষণ ছিল ওয়েবসাইট ডিজাইন করা, কম্পিউটার গ্রাফিক্সে তিনি যথেষ্ট হাত পাকিয়েছিলেন। ওই

ফার্মে তিনি ডিজাইনার ও প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করতেন। তারপর তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করেন– সেখান থেকে পেশা হিসেবে নেন ভিশ্যুয়াল কম্পিউটেশনকে। এতে কম্পিউটার তার কাজের আউটপুটকে সাধারণভাবে প্রকাশ না করে নানা জটিল দৃশ্যপট ও গ্রাফিক্সের মাধ্যমে দিতে পারে, যাতে মনে হবে যে কম্পিউটার যেন বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধির মাধ্যমে তার ফলাফলগুলো দিচ্ছে। এভাবে তিনি তাঁর ভালোবাসার বিভিন্ন বিষয়কে তাঁর পেশার মধ্যে একত্রিত করতে পেরেছেন।

তৃতীয় উদাহরণ। স্কুলে থাকতে যখন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ছেন, তখনই তাঁর এক অদ্ভুত সখ মাথায় চেপেছিলো, ওখানে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে হাতে ছবি এঁকে খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতেন– যেমন জীবাণুগুলো ধীরে ধীরে কেন রূপ পালটাচ্ছে– ইত্যাদি। এটি পরে তিনি কম্পিউটারেও করতে শেখেন। ছবিগুলো এতো জাজ্বল্যমান হতো যে এর থেকে বিজ্ঞানের অনেক বিষয় খুব স্পষ্ট হতো। স্নাতক পড়ার সময় তাঁর প্রধান বিষয় হিসেবে তাই নিয়েছিলোন সায়েন্টিফিক ইলাস্ট্রেশনকে (বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)। প্রাণীদের ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়, যান্ত্রিক নানা বিষয়কে চিত্রায়ণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাটাই এই বিষয়ের শিক্ষা– যেই চিত্রায়ণ হয় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নানা জিনিসকে প্রাধান্য দিয়ে, যেন বিজ্ঞানেরই একটি অংশ। স্নাতক হবার পর তিনি কিছুদিন এরকম সায়েন্টিফিক ইলাস্ট্রেশনের চাকরি করেন। এরপর এই বিষয়ের ওপরই মাস্টার্স করে এই বিদ্যাটিকে আরও গভীর স্তরে নিয়ে যাবার সুযোগ পান। এর মাধ্যমেই তিনি বায়োফিজিক্স বিষয়টির দিকে ঝুঁকে পড়েন। স্নাতকে তাঁর পদার্থবিদ্যা (ফিজিক্স) ছিল। জীবদের বেশ কিছু জৈব-প্রক্রিয়ার এক একটি যান্ত্রিক দিক রয়েছে যাতে পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব, ফর্মুলা ও কৌশলগুলো সেখানে সুন্দর খাটানো যায়– তাই নিয়েই বায়োফিজিক্স (জীব-পদার্থবিদ্যা) বিষয়টি। শুধু ঝুঁকে পড়া নয় তিনি বায়োফিজিক্সে পিএইচডি'র কাজ শুরু করেন, যে কাজে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও জৈব-রসায়নে তাঁকে যথেষ্ট উচ্চ স্তরে পড়াশোনা করতে হয়েছে। ওই সায়েন্টিফিক ইলাস্ট্রেশনের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁর এই বায়োফিজিক্স গবেষণার একটি প্রধান দিক হয়ে দাঁড়ায়। তাতে ইলাস্ট্রেশনের ব্যাপারটিকেও তিনি আর এক মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেন।

জানার নেশা, বিষয়ের মধ্যে গভীর নিমজ্জন, এবং সৃজনশীলতার যোগ না হলে এই উদাহরণগুলো এবং এমনিতরো হাজারো উদাহরণ সৃষ্টি হতে পারতো না। শিক্ষা ব্যবস্থা সেই সুযোগ রেখেছিলো বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সেখানে তরুণ তরুণীদের সামনে যার যার বিভিন্ন

সৃজনশীলতাগুলোকে নানা মিশ্রণে মেশাবার দুয়ার খুলে রাখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে আমাদের তরুণ-তরুণীদের জন্যও সৃজনশীলতার দুয়ার খোলা রাখতে হবে।

সৌখিনতার সৌন্দর্য

আনন্দ তাড়িত

সৌখিন যাযাবরঃ

'আমি এক যাযাবর... আমি ইলোরার থেকে রং নিয়ে দূরে শিকাগো শহরে দিয়েছি...'। ভূপেন হাজারিকার গানের মত নিজেকেও মনে হয় এক যাযাবর, সৌখিন যাযাবর– এক জায়গায় থেকে কিছু নিয়ে তা অন্য জায়গায় সানন্দে ব্যবহার করার মত যাযাবর। জায়গা বলতে যতটা না শহর থেকে শহরে, তার থেকে বেশি এক কাজ থেকে অন্য কাজে, আনন্দের তাড়নায়; অবশ্য ওই গানের যাযাবরের মতই লক্ষ্যনিষ্ঠভাবে কিছু একটি অর্জন করবো বলে।

ইংরেজি 'এ্যামেচার' শব্দের অনুবাদ হিসেবে বাংলায় সৌখিন শব্দটি খুব যুৎসই নয়, কারণ সৌখিনের মধ্যে একটি বাবুয়ানা অথবা বিবিয়ানার ভাব আছে। সখ মেটাতে নানা সৌখিন কাজের অধিকার মনে হয় শুধু জমিদার গোছের মানুষেরই আছে। আবার ইংরেজিতে 'এ্যামেচার' ও বাংলায় 'সৌখিন' উভয় শব্দকেই কাঁচা অর্থেও ব্যবহার করা হয়, পাকা পেশাদারের বিপরীতে। আমি যে অর্থে এখানে ব্যবহার করছি সেটি বাবুয়ানাও নয়, কাঁচাও নয়– বরং মনের তাগিদে করা কাজ। অন্য ভালো শব্দের অভাবে আপাতত তার জন্য সৌখিনই সই। নিজের পেশার জন্য বাঁধাধরাভাবে জরুরি নয় এমন অনেক কাজের সঙ্গে সারা জীবন জড়িত থাকার কারণে সৌখিনতার প্রতি আমার একটু পক্ষপাত থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে এবং সারা দুনিয়ায় সৌখিন মানুষদের কাজের দ্বারা বিশাল সব অর্জন হতে দেখে আমার বরাবর মনে হয়েছে আনন্দ তাড়িত কাজের একটি বিরাট মূল্য আছে। সবার কাছে উন্মুক্ত থাকে বলে এই সৌখিনতার স্বাদ ও অর্জনের তৃপ্তি থেকে কারোই বঞ্চিত থাকা উচিত নয়।

সৌখিনতার মধ্যে বাড়তি সৌন্দর্য্য যা আমি দেখি তা হলো এতে মনের একটি সার্বভৌমত্ব থাকে যা পেশাদারিত্বে থাকে না। এটি ছোটবেলা থেকে

মনের তাগিদে যে খেলার দল গঠন করা, পাখির পেছনে ছোট, ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে মাছ ধরা, এমনি মনের আনন্দে করা কাজগুলোর ধারাবাহিকতায় বড় বেলায় আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস করার পর্যায়ে গড়ে। এমন কাজ কে না করেছে? বাধ্যতামূলক কাজে বা পেশার কাজে যে চাপ থাকে সেটি বাদ দিতে পারলে একই রকম জিনিসকে, এমনকি আরও কঠিন কাজকেও অন্তরের কাছাকাছি মনে হয়। স্পষ্ট মনে পড়ে স্কুলে বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষার জন্য হন্তদন্তভাবে স্কুলের বই পড়ে যাওয়ার পর শেষ দিন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে পা টেনে আরাম করে বসে লাইব্রেরি থেকে আনা কঠিনতর বিজ্ঞানের বইটি পড়তে মজা করে লেগে যাওয়ার কথা। এ যেন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম! যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এমনি সৌখিন কাজগুলো একেবারে পরস্পর অসম্পর্কিতভাবে না হওয়া। সে জন্যই যাযাবর হয়েও লক্ষ্যনিষ্ঠ হবার কথা বলা। যতই ইতস্তত হোকনা কেন, ছোট ছোট সৌখিন কাজের বিন্দুগুলো একের সঙ্গে এক যুক্ত হয়ে একটি অর্থপূর্ণ রেখাচিত্র যদি তৈরি হতে পারে তাহলে দুনিয়াতে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে পেশাদারিত্বের বাইরেও। একার কাজের মাধ্যমে সেটি বিন্দু থেকে বৃত্ত হয়তো হয় না, কিন্তু একটি রেখাচিত্রতো হয়। এমনি ধারার বহু মানুষের কাজ পেশাদারদের মূল বৃত্তকেও অনেকগুণে বর্ধিত করতে পারে। আনন্দের কাজ বলেই এভাবে এগুলোতে বহু মানুষ জড়িত হতে পারে, পেশাদারদের থেকে অনেক বেশি মানুষ।

সৌখিন কাজ তারপরও প্রশ্নের সম্মুখীন হয় পেশাদারিত্বের প্রতি মনোযোগকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত করে ফেলে বলে। কারণ অনেকেই পেশাদার কাজকে কাজের রাজা বলে মনে করেন। ওটি দায়িত্বের কাজ, ওখানে কাজের কোন জায়গায় সক্ষমতার ঘাটতি থাকলে সেটিকে এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, বরং বার বার চেষ্টা করে সেই দুর্বলতা কাটাতে হয়– কারণ পেশাদার কাজে প্রতিযোগিতা বেশি, জবাবদিহিতা বেশি। এভাবেই ওটি কাজের রাজা হয়, পেশাদাররাও কাজের এক রকম ওস্তাদ হিসেবে স্বীকৃতি পান। এগুলোকে মেনে নিয়েও বলা যায় যে দুনিয়ার ও মানব জাতির সব কল্যাণের জন্য পেশাদারদের ওপর নির্ভর করলে আমরা কাম্য গতিতে এগুতে পারবো না, বরং পেশাদারদেরই উচিত যত ব্যাপকভাবে সম্ভব সৌখিন কাজে সবাইকে উৎসাহিত করা এবং তাতে সহযোগিতা দেয়া। এটি তাদের কাজকে বরং আরও অনেক সমৃদ্ধ করবে, তার কার্যকারিতাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। তা ছাড়া পেশাদারিত্বের মত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এখানে মনের যে তাগিদ ও তাড়না থাকে তার

শক্তি কিন্তু কম নয়। বরং বলতে হয় কাজের রাজা হবার বা ওস্তাদ হবার সাধনায় একটি ক্লান্তি আছে, সেখানকার অগ্নি-পরীক্ষা অনেককে নিরুৎসাহিত করতে পারে; কিন্তু সৌখিন কাজে এই ভয় নেই। কাজের সৌকর্যকে এত নিখুঁত উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা না দিয়েও শুধু মনের তাগিদের শক্তিতে অনেক সুদূর লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানো সম্ভব। এটি আমরা দুনিয়ার বহু বড় বড় কাজে দেখেছি।

সৌখিন কাজ নিয়ে মূলধারার অনেককে অস্বস্থি প্রকাশ করতে দেখা যায় এর খেয়ালি প্রকৃতি নিয়ে। তাঁরা মনে করেন মনের খেয়ালে কাজ করে বলে ওরা অল্প সাফল্য পেলে তাতেই খুশি হয়ে যায়, আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগে। প্রায়শ তারা এক স্বপ্ন থেকে অন্য স্বপ্নে চলে যায়, যায় ফলে শেষ লক্ষ্য পর্যন্ত যেতে পারে না। আমার মনে হয় খেয়ালে কাজ করা একটা খেয়ালিপনা নয়, এর মাধ্যমে তারা যে আত্মনিয়োগ ও স্বেচ্ছাসেবা দেবার মনোভঙ্গি দেখায় সেটি অনেক পেশাদারের মধ্যে দেখা যায় না। প্রাথমিক সাফল্য তাকে যে আত্মবিশ্বাস দেয় সেটি তার সীমাবদ্ধতা নয়, বরং তার পাথেয়। নিজের বাধ্যবাধকতার কাজ পেশাদারকে অতিমাত্রায় ছকবাঁধা পথে যেতে বাধ্য করে– শেষ লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত তাকে এদিক ওদিক সরতে দেয় না। বরং সৌখিন কাজের মত তারও মধ্যে নড়াচড়ার স্বাধীনতা থাকলে, তাতে ভালো বৈ মন্দ হতো না। সৌখিন কাজের নমনীয়তাটি তাকে তার স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত করে একথা মানা যায় না, এই নমনীয়তা বরং কাজের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। সৌখিনতার এই যে সুযোগ আছে, পেশাদাররাও সে সুযোগ পেলে বরং ভালোই হতো তাদের ছকবাঁধা পথের বদলে; নানা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্যই করে। আজকাল শুনি গুগল, মাইক্রোসফট ইত্যাদি সৃজনশীল কোম্পানিগুলো তার সকল কর্মীর মধ্যে এই নমনীয়তা আনার জন্য বহু রকম স্বাধীনতা তাদেরকে দিয়ে থাকে। সৌখিনতার সমালোচনার যে বিষয়গুলো দেখলাম, সেগুলোকে আমার কাছে সৌখিনতার সৌন্দর্য বলেই মনে হয়েছে।

মনের তাগিদে সুযোগ করে শুরু করতে হয় বলে সৌখিন কোন কিছু আটঘাট বেঁধে সম্ভব হয় না, ছোট ছোট সাফল্য থেকে আনন্দ-উৎসাহ পেয়েই তাকে এগুতে হয়। এই সব কাজে যাঁরা হাত লাগান তাঁরা সবাই যদি পেশাদারী মনোভাব নিয়ে চলতেন তাহলে এত রকমের কাজ স্বেচ্ছায় ও সৃজনশীলভাবে হতে পারতো না। সৌখিন যখন সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের মত সৃষ্টির কাজ করেন তখন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে নয়, বরং তাৎক্ষণিক সৃষ্টির আনন্দেই তা করেন। তেমনি তাঁরা স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদেরকে

শিক্ষা দেন, দুর্যোগে ত্রাণ নিয়ে যান, যে রুগীর চিকিৎসার সোজা রাস্তা নেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি। এই অসহায়রা পেশাদার জগতের চোখে সাধারণত পড়ে না। পেশাদার একেবারে লাগামছাড়া অভিনব কৌশল ব্যবহার করতে বাধা পান। পেশাদারিত্বের অভিমান অনেক সময় তাঁকে অন্যের কাজের দ্বারাও প্রভাবিত হতে দেয় না। অন্যদিকে খোলা জগতে উন্মুক্তভাবে কাজ করতে সৌখিনরা বেশি অভ্যস্ত, তারা একের দ্বারা অন্যে উৎসাহিত হন, একজন অভিনব কিছু করলে আরও দশ জন চেষ্টা করেন সেটি শিখে, আত্বস্থ করে নিজেরা কিছু করতে পারেন কি না। তার ফলে নিজের কাজটি হয়তো কিছুটা মোড় নেয়, কিন্তু যতক্ষণ সেটি সোৎসাহ আনন্দের মধ্যে হয়, কার্যকর হয়, এবং প্রত্যেকের যার যার অবদান স্বীকৃতি পায়, ততক্ষণ তাতে অসুবিধা কোথায়?

আমি যখন সৌখিন যাযাবর হয়ে বিজ্ঞানের প্রচারে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি, সেই কলেজ জীবন থেকে এর এক কৌশল থেকে অন্য কৌশলে, তখন দেশের বিদেশের নানা উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই করেছি। কিন্তু সেখান থেকে নিজেদের জন্য অদ্ভুত অভিনব নতুন উদ্ভাবন করতে পেরেছি। পরের কাজটি যে আগের কাজ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়, বরং পরেরটি আগেরটিকে সমৃদ্ধ করেছে ও নতুন মাত্রা দিয়েছে, আবার নিজেও পাখা মেলেছে। তাই যা ছিল সাহস করে বের করা বিজ্ঞান পত্রিকা– সবার জন্য, বিজ্ঞান উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের জন্য; সেটি রূপ পেয়েছে সারা দেশে মনের আনন্দে সৃষ্টি হওয়া বিজ্ঞান ক্লাবে; ওভাবে আমরা চলে গিয়েছি সুবিধা-বঞ্চিত অন্য কিশোর-কিশোরী-তরুণ-তরুণীদের জগতে। ওই বিজ্ঞান সাময়িকীতে যা আইডিয়া হিসেবে প্রকাশ করেছি তখন তা ওই সুবিধা-বঞ্চিতদের জন্য বাস্তবায়িত করার চ্যালেঞ্জ আসলো। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একেবারে হাঁটি হাঁটি পা পা হিসেবে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রকে (সিএমইএস) এই লক্ষ্যেই গড়ে এগিয়ে নিতে পারলাম। যেখানে শিক্ষা, কিশোরী ক্ষমতায়ন, তাদের উল্লম্ফনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি– এমনি নানা দিকে কাজের তাগিদ। পরিস্থিতি এমন যে একমাত্র নতুন অভিনব কৌশলই আমাদেরকে সাফল্য দিতে পারে, আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো নতুন কৌশল। কাজই আমাদেরকে পরিচিত করিয়েছে দুনিয়ায় এরকম কাজের আরও অনেক উদাহরণের সঙ্গে। যেমন আমার একটি বড় আগ্রহের অনুসন্ধান ছিল ওই তরুণ-তরুণীরা তাদের সীমিত সুযোগের মধ্যে নিজেদের বিকাশের জন্য কোন কোন লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে তা খুঁজে বের করা,

এবং তাদের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য এর ওপর গবেষণা করা। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা থেকে তার কিছু কিছু আইডিয়া পেয়েছি। কিছু নেহাৎ বইপত্রে, লেখায়। আর কিছু দৈবক্রমে পরিচিত হওয়া কারো থেকে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকায় কনফারেন্সে গিয়ে যে গৃহকর্ত্রীর বাড়িতে আমার ঠাঁই হয়েছিলো সেখানে দেখলাম তিনি বাসার রান্নাঘরের বর্জ্য কেঁচোকে খেতে দেন। ওই কেঁচো যেই সার তৈরি করে দেয় তা ব্যবহার করে বাড়ির পেছনে তাঁর বিরাট সবজি বাগান। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আরও অন্যান্য যারা এ কাজ করে তাদের সমিতিতে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে অনেক খবর পেলাম, অনেক বৈজ্ঞানিক লেখাও। আমাদের গ্রামের পরিস্থিতিতে একে চালু করতে বেশ কয়েক বছর খাপ খাইয়ে নেবার গবেষণা আমাদেরকে করতে হলো। কিন্তু তা এদেশে কেঁচো সার তৈরির পথিকৃৎ করলো আমাদেরকে।

আরেকটি উদাহরণ মাশরুম ভালো দামে বিক্রয় হয়, জমি ছাড়া করা যায় দেখে সরকারি মাশরুম কেন্দ্র থেকে এটি শিখতে চেয়েছিলাম– বীজটাও যেন আমাদের গ্রামের তরুণ-তরুণীরাই তৈরি করতে পারে। শুনলাম সে রীতিমত বহু লক্ষ টাকার ল্যাবোরেটরি না করে সম্ভব নয়। ভারতের ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জন্য কাজ করে এমন একটি গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয়েছিলো। ওখানে গিয়ে দেখলাম আদিবাসীরা বাড়িতে বাড়িতে মাশরুমের চাষ করে। এর বীজ আসে ওই গ্রামেই খোলা ইটের ছোট্ট ঘরে বসানো পনরো-বিশ হাজার টাকায় তৈরি টিশ্যু-কালচার ব্যবস্থায়। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত তরুণ তরুণীরাই তা চালায়। ওই বিদ্যা শিখে এসে আমরা ওই মডেলেই কাজ করলাম। সে সময় মাশরুম বীজ শুধু আমাদের ছেলেমেয়েরাই গ্রামে গ্রামে তৈরি করতো। কিন্তু এজন্য ঝাড়খণ্ডের বিদ্যা হুবহু কাজ করেনি– আমাদেরকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। এখন সারা দেশে গ্রামেগঞ্জে অনেকে মাশরুম চাষ করেন– অনেকেই খুব সীমিত আয়োজনে। এভাবেই বহুদিন ধরে নিশ্চিত হয়েছি টেকসই উন্নয়নে সৌখিন যাযাবরের একটি জায়গা আছে, কিছু তুলনামূলক সুবিধাও আছে।

সৌখিন হিসেবে কাজ করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় পেশাটির ফাঁকে ফাঁকে– তাই সময় বের করতে গিয়ে অন্য অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে– যেমন নিজের সামাজিক মেলামেশা, পরিবারের সঙ্গে অন্যদশ জনের মত সাধারণ বিনোদন । কিন্তু সৌখিন কাজের মধ্যেই তো রয়েছে অনেক মেলামেশা, অনেক বিনোদনও; সহকর্মী, পরিবার সবাই এটি

উপভোগ করতো। কিন্তু পেশার সঙ্গে সৌখিন কাজের সম্পর্কটি কী রকম ছিলো? শিক্ষার দিকটায় এবং ওই বিজ্ঞানের কাজে কিছুটা ছিল– যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌরশক্তির মত নবায়নযোগ্য শক্তির গবেষণাটি ছিল আমার কাজের প্রধান দিক। ঠিক এই জিনিসটি আবার আমি অন্যভাবে ওই গ্রামের কাজেও নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশে কোন বিশেষ কাজের বিশেষজ্ঞরা এবং পেশাদাররা সৌখিনদেরকে বেশি প্রশ্রয় দেন না, অনেকটা অনধিকার চর্চাকারী মনে করেন। যেমন সরকারি মাশরুম প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা, টিশ্যু-কালচার বিশেষজ্ঞরা আমাদের মাশরুম বীজ তৈরির পদ্ধতিটি কখনো সঠিক বা নিরাপদ মনে করেননি। অথচ আমি বিদেশে একাধিক জায়গায় ঠিক আমাদের মতই করতে দেখেছি। পেশাদারদের সঙ্গে সৌখিনের এই দূরত্বটি আমাকে সব সময় ভাবিয়েছে, মনে হয়েছে এটি না হলে উভয়ে উপকৃত হতে পারতো, প্রত্যেকের কাজকে আরও সমৃদ্ধ করে তাকে নতুন মাত্রা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌরশক্তি নিয়ে আমার পেশাদার গবেষণা যেমন এই একই বিষয়ে আমার সৌখিন কাজ থেকে নতুন মাত্রা পেয়েছে, তেমনি আমাদের সৌখিন কাজও পেশাদারের কাছে নতুন গল্প শোনাতে পেরেছে, নতুন চিন্তা তার মাথায় ঢুকাতে পেরেছে। এতে কখনো পেশাদার কখনো সৌখিন হয়ে একই মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক হবার দরকার নেই– ওরা দু'জন আলাদা মানুষ হলেও এমন সম্পর্ক হতে পারে। একজন শুধুই পেশাদার আরেকজন শুধুই সৌখিন হয়েও একে অপরের কাজকে দারুণ সমৃদ্ধ করতে পারেন। সর্বত্র এর অসংখ্য উদাহরণ আছে।

সৌখিন কাজ মানে লাগামছাড়া কাজ মোটেই নয়। ভালো কিছু অর্জন করতে চাইলে তার মধ্যেও কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ করতে হয়, এমনকি পেশাদারিত্বের কিছু দায়িত্বও এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে। যেমন একটি ম্যাগাজিন সৌখিনভাবে শুরু হতে পারে। তখন তার সামনে দুটি রাস্তা থাকে। একটি হলো সমমনা কিছু বন্ধুরা মিলে লিটল ম্যাগাজিনের মত মাঝে মাঝে তা বের করে এর আদর্শের অস্থিত্ব ঘোষণা করা। অন্যটি হলো একে যে ভাবে পারা যায় নিয়মিত চালিয়ে গিয়ে এর একটি পাঠকশ্রেণি সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে একটি আন্দোলন শুরু করার চেষ্টা। আমরা বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য এই দ্বিতীয় রাস্তাটি বেছে নিয়েছিলাম, কাজটি মোটেই সহজ না হলেও। ফলে অনিবার্যভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা চলে এসেছে; পরে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গিয়ে সে সবের চাপ প্রচণ্ড হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে স্বীকার করতে হয়েছে যে এ এক সৌখিন

পেশাদারিত্ব– তবে একেবারে নিজেদের খেয়ালে ও আনন্দে বলে বেশ উপভোগ্য এক পেশাদারিত্ব। সৌখিন আর পেশাদার এ দুই পরস্পর-বিরোধী জিনিসকে মেলাতে গিয়ে আমাদের এগুলোর মত অনেকের সৌখিন কাজকে সুকুমার রায়ের বকচ্ছপের রূপ ধারণ করতে হয়। বক ও কচ্ছপ এই দুই সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণীকে মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি প্রাণীকে নিয়ে তিনি ছড়া ও ছবি রচনা করেছিলেন এই বকচ্ছপ নাম দিয়ে। কিন্তু আমি সৌখিন পেশাদারিত্বের মধ্য জগাখিচুড়ি বা হাসির কিছু কখনো দেখিনি বরং পেশাদারিত্ব ও সৌখিনতা উভয়ের উপভোগ্য জিনিসগুলোকে এক সঙ্গে হতে দেখেছি, যার কোন তুলনা হয় না। ইংরেজিতে একটি সুবচন অনেককে বলতে শুনেছি– 'সৌখিনের মত ভাব আর পেশাদারের মত কাজ কর'। কথাটি একেবারেই আমার মনের কথা। কাজ যতখানি পারি গুছিয়ে তো করতেই হবে– পেশাদারের মত হোক বা না হোক। কিন্তু ভাবনার রাজ্যটি একেবারেই সৌখিনের, ওখানে আনন্দ আর স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারবে না। ওই ভাবনার আনন্দ আর স্বপ্নগুলোই কাজকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় নেশার মত।

এক সঙ্গে দুই কাজঃ

সৌখিনের মত ভাবনা নিয়েও সব কাজ সময় মত সঠিকভাবে করতে পারার পথে একটিই বাধা– সময়ের অভাব। এই সময় খুঁজতে গিয়েই একই সঙ্গে একই সময়ে দুটি কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেকেই এটি করে, আমিও করি। কিন্তু সবাই বলে এটি পণ্ডশ্রমের কাজ, এটি এক অসম্ভব চেষ্টা– কারণ এক সঙ্গে দুটি কাজ করতে গিয়ে না এটি হয়, না ওটি। এরকম এক সঙ্গে দুই কাজ করার কথা বললে অনেকের মনের চোখে ভেসে ওঠে আজকালকার অনেক স্কুল-কলেজের ক্লাসরুমের কথা যেখানে ছাত্ররা শিক্ষকের কথাও শুনছে, আর স্মার্ট ফোনে ফেইসবুকের দিকে নজর রাখছে, সেখানে বার্তাও দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধরে নেন যে ছাত্র যেমন আসলে শিক্ষকের বক্তব্যের দিকে কোন মনই দিচ্ছে না, শুধু দেয়ার ভান করছে, সেভাবে এক সঙ্গে দুই কাজ করার কোন মানুষই আসলে দুই কাজ করতে পারে না, একটিই করে তবে মনে করে যে অন্যটাও করছে। যেমন ওরকম ছাত্র যদি মনে করে সে ক্লাসও করছে, জরিপে তাদের পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু অন্য কথা বলে। এক সঙ্গে দুই কাজ করার বাস্তব অর্জন সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই মানুষের এই সাধারণ ধারণার সঙ্গে একমত– এতে দুই কাজই কিছু ব্যাহত হয়। অথচ আমি সোৎসাহে

আমার গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ এভাবেই করে গেছি, প্রায় সারাজীবন। তাতে সময়ের সাশ্রয় হয়নি, বা কাজ খুব খারাপ হয়েছে, এমনটি কখনো মনে হয়নি। আসলে বিশেষজ্ঞরাও এ নিয়ে একেবারে শেষ কথা বলতে রাজি নন, কারণ গবেষণায় আজকাল অন্য রকম তত্ত্বও দেয়া হচ্ছে।

যখন আমরা দুটি কাজ এক সঙ্গে করি, তখন আসলে কী করি? একটি কাজকে অন্য কাজের ওপরে উপরিপাতন করি। ওর মধ্যে একটি কাজকে বেশি ভালোবাসি অথবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি বলে অন্য কাজের জন্য বরাদ্দ সময়েও এটি ছাড়তে পারি না। ওই বেশি ভালোবাসার কাজটি তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে করেও আমাদের মন ভরে না, বা কাজটিও শেষ হয়না; তাই অন্য কাজের সময়ের ওপরেও ওই কাজটিকে চড়িয়ে দিই। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বলে এভাবে এক কাজের ওপর আরেক কাজ চাপানোতে কোন সুবিধা হয় না। সনাতন মস্তিষ্কবিদ্যাটিও এর বিপক্ষে। আমার নিজের অভ্যাস থেকে একটি মামুলি উদাহরণ দিই ঃ স্কুলের আমল থেকেই আমার পড়ার টেবিলে সব সময় একটি রেডিও বাজতেই থাকতো– আমার লেখাপড়া ও অন্য সব কাজ রেডিও শুনতে শুনতেই চলতো। এর মানে এই নয় যে রেডিওর আওয়াজটি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজ হিসেবেই থাকতো, বরং আমার মনোযোগের একটি দিক কমবেশি ওদিকেও থাকতো– গান, খবর, কথিকা, ক্রিকেট ধারা বিবরণী, নাটক, আলোচনার আসর যা কিছুই হতো তার মধ্যে। আমার পছন্দমত অনুষ্ঠান আমি টিউনিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে বদলে নিতাম দেশ-বিদেশের নানা বেতারকেন্দ্র থেকে, এটি একরকম আমার নেশার মত। এর থেকে অনেক তথ্য আমার জানা হতো, এই ক্রিকেট ধারাবিবরণী থেকেই আমার আজ পর্যন্ত সকল ক্রিকেট জ্ঞান এসেছে, কারণ নিজে কখনো খেলিনি। আসামের গৌহাটি এবং উড়িষ্যার কটক ও 'বিবিধ ভারতী' শুনতে শুনতে আমি অহোমিয়া, উড়িয়া ও হিন্দি ভাষা ভালোই শিখে গিয়েছিলাম– প্রথম দুটি শুনতাম শুধু ওই ভাষার জন্য, বাংলার সঙ্গে মিল-অমিল লক্ষ্য করার জন্য। কাজেই রেডিও শুধু বেজে চলতো, তাতে আমার মনোযোগ থাকতো না, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এ মনোযোগ এমন একটানা বা অখণ্ডভাবে হতো না যে আমার লেখাপড়া, অংক করা বা এ ধরণের অন্য কাজে বিঘ্ন হয়েছে এমনটি আমি কখনো অনুভব করিনি। বরং কোন কারণে রেডিও না বাজলেই যেন ওসব কাজ নিরানন্দ মনে হতো। এই অভ্যাস সেই সময় থেকে এখন অবধি একইভাবে বজায় আছে শুধু এক সময় রেডিওর স্থানটি টেলিভিশন দখল করে নিয়েছে। ওই অবস্থায় টেলিভিশনের শব্দ একটানা

কানে আসে, কিন্তু দৃশ্য শুধু ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু দেখা হয়– তাতেই উপভোগ বা মনোযোগ এক ভাবে বজায় থাকে, সেটিকে আমার কাছে যথেষ্ট কার্যকর মনে হয়।

সনাতন মস্তিষ্কবিদ্যা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। এর মতে কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুধাবনের মাত্রা নির্ভর করে সে বিষয়ে আমাদের একাগ্র মনোযোগের ওপর। আমাদের যেই 'স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি' বা 'কার্যকর স্মৃতি' ওই অনুধাবন সৃষ্টিতে কাজ করে সেটি মনোযোগ-নির্ভর। এই মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য অন্য যে সব জিনিস সে সময় আমাদের মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করে সেগুলোকে এক্ষেত্রে আমরা কোলাহল (নয়েজ) বলতে পারি। মূল বিষয়টির প্রতি মনোযোগ কোলাহলের প্রতি মনোযোগ থেকে যত বেশি হবে তার অনুধাবন তত ভালো হবে। ওই কোলাহল যতটা মনোযোগ চুরি করবে মূল বিষয়ের অনুধাবন তত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যতবার যতক্ষণ ধরে এক বিষয়ের থেকে মনোযোগ অন্য বিষয়ে যাচ্ছে ততবার সেখানে স্নায়ু উদ্দীপনা নতুন করে পুনঃচালু করতে হচ্ছে এবং ওর ওপর পুনঃকেন্দ্রীভূত করতে হচ্ছে। এটি একটি বিক্ষিপ্তকারী কাজ, এক দিকে বন্ধ করে অন্যদিকে চালু করা। এর ফলে উভয় কাজের কার্যকর স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হব, যেই ছোট ছোট স্মৃতি হাতে জমা করে করে অনুধাবনে এগুতে হয়। উভয় কাজের এসব কার্যকর স্মৃতির স্নায়ু সিগন্যালগুলো পরস্পরের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একটি জ্যাম লেগে যায় বলেই এমনটি হয়। অনেকদিন ধরে এই তত্ত্ব আমি জানি, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে এটি কখনো পুরাপুরি সঠিক বলে মনে হয়নি। আমি ইচ্ছে করে ভালোবেসে যেই কাজটি আমার মূল কাজের সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে করছি তাকে আমি কোলাহল বলতেই রাজি নই। বরং মূল কাজ যখন একঘেঁয়ে হয় তখন এই তথাকথিত কোলাহলের পুরস্কারের লোভেই আমি মূল কাজটি করার উৎসাহ পাই।

আমার কাছে মনে হয়েছে মনোযোগের জালটি ওই মূল বিষয়টির ওপরেই শুধু না ফেলে আরও একটু বড় জায়গা জুড়েই ফেলা যায়। মূল বিষয়কে বলতে পারি বড় মাছ ধরা- বড় মাছ ধরার জন্য জালের খোপটি এত ছোট না করলেও চলতো। সেটি করেছি কাছেই যেখানে ছোট মাছ আছে, অতিরিক্ত হিসেবে সেগুলোও ধরার জন্য। এতে বড় মাছ ধরাতে কোন বিঘ্ন ঘটার কথা নয়, হলেও সেটি তুচ্ছ করার মত। মাছ যে অনেক অতিরিক্ত ধরলাম সেটিই বড় কথা। এমনকি কোন কোন বিরল সময়ে ছোট মাছের মোট পরিমাণ ধরা পড়া বড় মাছের থেকেও বেশি হতে পারে। বিশেষ করে ছোট মাছ ধরতে আর খেতে যার আনন্দ বেশি, সে অন্য সময়

অবসরেও ছোট মাছ ধরে– বড়শি দিয়ে ধরে, ছোট জাল দিয়ে ধরে, ফাঁদ পেতে রেখে ধরে; তবে বড় মাছের সঙ্গে এক সঙ্গে ধরাটার লোভও সামলাতে পারে না। যে সব সৌখিন কাজে আমি নিজেকে জড়িয়েছি তাতে উপভোগ্য কাজের এই লোভও বড়, আবার প্রয়োজনীয় অথচ কিছুটা একঘেঁয়ে এমন কাজেরও কমতি নেই। উভয়ে মিলে কাজের পরিমাণটিও বিপুল। কাজেই এক সঙ্গে দুটি কাজ প্রায়শ না করে উপায় নেই। এটি করতে করতে এ সম্পর্কিত বেশ কিছুটা দক্ষতাও জন্মে গেছে– যেমন খুব গভীরভাবে পড়তে হবেনা এমন যে কোন প্রচুর লেখা যেমন দরখাস্ত, ইমেইল, প্রতিবেদন, দীর্ঘ প্রবন্ধ, বই ইত্যাদিতে খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো চট্ করে চিহ্নিত করে ফেলতে পারা। আমি যা লিখে জানাতে চাই তা খুব সংক্ষিপ্ত একটি নোটের আকারে খুব গুছিয়ে অল্প কথায় লিখে ফেলা, প্রাসঙ্গিক একটি বক্তৃতার মূল কথাগুলো অন্যদের কথা শুনতে শুনতেই মাথায় ছক কেটে ফেলা, এমনকি পয়েন্টগুলো লিখেই ফেলা, যা এখন শুন্‌ছি তারো প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে রেখে– তার মানে সেই বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো শুনে বুঝতেও হচ্ছে, একই সাথে। এমনো হয়েছে যে একটি লেখার, একটি প্রজেক্টের, একটি বইয়েরও প্রাথমিক ধারণা এমনি কাজের ভিড়ের মধ্যেই চট্ করে মাথায় আনা ও তা নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া মনে মনে করে ফেলা। এর কোনটাই অবশ্য ওখানেই শেষ হবার কথা নয়, অবশ্যই আরও বিবেচনা পরে করতে হবে। কিন্তু ওই প্রাথমিক ধারণাটি না নিয়ে এলে সময়ের সাশ্রয় হতো না। আর অন্য যে কাজ করেছি যেমন বক্তৃতা শোনা, বা একটি ভিডিও দেখা, বা কিছু নথিপত্র বা বই পড়া তাও যে আরও অনেক বেশি কার্যকর হতো তাও নয়। এটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ে যখন মূল কাজটি গতানুগতিক এবং আবশ্যকীয় হয় কিন্তু কোলাহল বলে কথিত কাজটি আনন্দদায়ক, নতুন, ও সৃজনশীল হয়। এটি পেশাদার কাজে যে হয়না তা নয়, তবে সৌখিন কাজগুলোতে এর সম্ভাবনা অনেক বেশি।

এখন সর্বশেষ মস্তিষ্কবিদ্যায় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বরং ভালোই মিলে যাচ্ছে; আমার বিশ্বাস সৌখিন কাজ করার জগতে আরও অনেক মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও। ওই যে দুই কাজ এক সঙ্গে করতে গিয়ে উভয়ের স্নায়ু সিগন্যালের মধ্যে জ্যাম লেগে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছিলো নতুন তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে দুই কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে মস্তিষ্ক ওই জ্যাম লাগাকে এড়িয়ে যেতে পারে। অভ্যাসের ফলে মস্তিষ্ক ক্ষণে ক্ষণে এক কাজের সিগন্যাল

থেকে অন্য কাজের সিগন্যালে চলে যেতে ও ফিরে আসতে নিজেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কোনটিকে না দমিয়ে বা কোন রকম বাধা না পেয়ে। আগে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে জ্যাম লাগাতো সেখানে একটি নতুন শৃঙ্খলা আসে। সেটি এমন শৃঙ্খলা যে এতে কোন কাজটি অগ্রাধিকার পাবে এবং কতখানি পাবে সেটিও সেখানে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত বেশি আনন্দের কাজটি অগ্রাধিকার পায় ও তা মনোযোগও বেশি পায়, অন্যটি যতখানি প্রয়োজন ততখানিই পায়। এ যেন মস্তিষ্ক এক সঙ্গে দুই কাজ করতে প্রশিক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু একটি কাজ যদি একেবারেই আনন্দের না হয় বা খুব বেশি কঠিন হয় তখন এভাবে মসৃণভাবে এদিক ওদিক করা মস্তিষ্কের জন্য দুরূহ হয় এবং তার জন্য অনেক বেশি 'প্রশিক্ষণের' প্রয়োজন হয়। জীবনভর দুই কাজ এক সঙ্গে করতে অভ্যস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি ইতোমধ্যে ঘটে গেলেও ক্লাসরুমে ফেইসবুক চর্চা করা ছাত্রের ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ সহজে ঘটেনা। ছাত্র ক্লাসের পড়াটা বুঝতে বুঝতে সেটি করতে পারে না, যদি না সে ক্লাসের পড়াতেও অন্তত বেশ কিছু আনন্দ পায় এবং সেটি তার জন্য বেশি কঠিন না হয়।

নাগরিক বিজ্ঞানী

সাধারণ মানুষের অসাধারণ ভূমিকাঃ

মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে একই রকম সৌখিন কাজে যখন অনেকেই যুক্ত হয় তখন সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের কাতার থেকে শুধু আগ্রহের জোরে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁরা রাখতে পারেন। প্রায়ই তাঁরা সংখ্যায় ও বিস্তৃতিতে ওই কাজে সকল পেশাদারদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে দুনিয়াজোড়া তাঁদের মধ্যে একটি যোগসূত্রও থাকে যার ফলে সামগ্রিক ভূমিকাটি আরও অনেক বড় হতে পারে। বিষয়টি যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে তাঁদের বলা যায় নাগরিক বিজ্ঞানী (সিটিজেন সায়েন্টিস্ট), সাধারণ নাগরিক হয়েও তাঁরা বিজ্ঞানীর কাজ করছেন। যে কোন অনুসন্ধানী ও গঠনমূলক কাজে, যেখানেই মানুষ মনের টানে সৃজনশীলতার প্রেরণায় স্বতস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রেই তাঁদেরকে দেখা যায়– নাগরিক প্রত্নতত্ত্ববিদ, নাগরিক ইতিহাসবিদ, নাগরিক সাংবাদিক, নাগরিক প্রকৌশলী, নাগরিক পরিবেশবিদ, নাগরিক বন-সংরক্ষক, নাগরিক প্রাণী-সংরক্ষক– এমনি যেখানেই আনন্দের কাজ আছে, কাজের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেখানেই তাঁদেরকে দেখা যায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের বিষয়টি অন্যত্র পেশাদারদের তত্ত্বাবধানেই রয়েছে, এগুলো পেশাদারদেরই ক্ষেত্র, অন্যদের সাধারণত এখানে প্রবেশের কথা নয়। কিন্তু সৌখিনরা মনের টানে ঠিকই প্রবেশ করেন, এর জন্য নিজেই নিজেকে তৈরি করে নেন, অনেকটাই আসে স্বপ্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে; কখনো বা অন্যদের সহায়তায়। তাঁরা প্রায়শ বিনা পারিশ্রমিকে বা স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন, এভাবেই হয়তো সারা জীবন এতে নিয়োজিত থাকেন। কেউ হয়তো পুরো অথবা খণ্ডকালীনভাবে নিজের জীবিকার পেশাটি একই সঙ্গে বজায় রাখেন, অন্যরা একেবারে শুধু এর মধ্যেই ডুবে থাকেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আজ কোন কোন ক্ষেত্রে এই নাগরিকদের এমনই ভূমিকা যে তাঁদের অভাবে অনেকগুলো কাজ চলতেই পারবে না, শুধু পেশাদারদের দিয়ে একাজের বর্তমান অগ্রগতি সম্ভব নয়। এটি শুধু তাঁদের সংখ্যার কারণে নয়, তাঁদের অবস্থানের কারণেও। যেমন পেশাদার বিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাঁদের কর্মস্থল, ল্যাবোরেটরি, দপ্তর, গবেষণাকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে; আর নাগরিক বিজ্ঞানীরা কাজ করেন সারা দুনিয়ার শহরে-গ্রামে ছড়ানো তাঁদের বাড়ি, এবং হয়তো সেখান থেকে কিছু দূরের তাঁদের অনুসন্ধান এলাকায়। নাগরিকদের বিস্তৃতি অনেক বেশি– তাই তাঁরা সব রকম জায়গা, সব রকম পরিস্থিতিকে এ কাজের মধ্যে আনতে পারেন। সৌখিনের নমনীয়তাগুলো এখানে বড় সুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে আজকের তথ্য প্রযুক্তিতে পুরো দুনিয়ার সংযুক্ত তথ্য জালের সুযোগ নিয়ে এই নাগরিক বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত সংখ্যা ও ব্যাপ্তি সারা দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে অপরিহার্য ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে।

সৌখিন নাগরিক চর্চাকারীদের উপস্থিতির কথা প্রথম জানতে পারি স্কুলে থাকতে। এ সময় পপুলার ইলেকট্রনিক্স পত্রিকার বেশ কিছু পুরানো সংখ্যা আমার হাতে এসেছিলো। ওগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে আমি দেখছিলাম আমার সদ্য তৈরি করা কৃস্টাল-রেডিওটির কার্যকারিতা একটু বাড়াবার কোন উপায় ওতে বলা আছে কিনা– কারণ এ ধরণের সখের রেডিও তৈরি নিয়ে বেশ কিছু লেখা এখানে থাকতো। আমার তৈরি রেডিওতে শুধু একটি গ্যালেনা কৃস্টালের ওপর সেফটি পিনের চোখা মাথাটি ঠেস দিয়ে থাকাতে ওটি একটি ডায়োডের মত কাজ করে চট্টগ্রামের নতুন রেডিও রীলে স্টেশনের অনুষ্ঠান আমাকে হেডফোনে শুন্‌তে দিতো। এতে ব্যাটারি বা অন্য কোন বিদ্যুৎ-উৎস লাগতো না, তবে একটি লম্বা লোহার তার বাসার ছাদে খাটাতে হতো এন্টেনা হিসেবে। আওয়াজটি খুব স্পষ্ট হচ্ছিলোনা বলে

পপুলার ইলেক্ট্রনিক্স ঘাঁটা। লক্ষ্য করলাম সেখানে সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও সম্পর্কে একটি বিভাগ প্রত্যেক সংখ্যাতেই আছে। এগুলো কিন্তু এক তরফা শোনার রেডিও নয়– একই সঙ্গে রেডিও সম্প্রচার যন্ত্র ও রেডিও গ্রাহক যন্ত্র– যা সৌখিন অনেক নাগরিক রেডিও-উৎসাহীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যবহার করেন। এজন্যই এর নাম সিটিজেন ব্যান্ড। এর জন্য সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহার করা হয় যার অন্তর্ভুক্ত ফ্রিকোয়েন্সিগুলো ওই রেডিওগুলো ব্যবহার করে, ফলে নির্দিষ্ট কয়েক মাইলের মধ্যে পরস্পর কথা বলা যেতো, অন্য কারো সঙ্গে না জড়িয়ে গিয়ে। দেশে দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় তখন সিটিজেন ব্যান্ড ব্যবহার করা নাগরিক রেডিও-উৎসাহীর সংখ্যা অনেক। এটি বেশি ব্যবহার করা হতো যখন লোকালয়ের বাইরে দল বেঁধে অনেকে বেড়াতে যেতো কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পার্কে, অথবা বেশ কিছুদিনের জন্য বনের ধারে বা হ্রদের ধারে ক্যাম্পিং-এ যেতো। তখন পরস্পরের যোগাযোগে এটি খুবই কাজে আসতো– তখনতো আর মোবাইল ফোন, ওয়াকি টকি এসব ছিলনা।

কয়েক বছরের মধ্যে জানলাম সিটিজেন ব্যান্ড বিস্তৃত হয়ে এখন তা অন্যরকম সৌখিনদের হাতে চলে গিয়েছে যাদের বলা হয় রেডিও হ্যাম। পার্থক্য হলো এখন যন্ত্রগুলো অনেক শক্তিশালী এবং এমন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি যে পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে রেডিও হ্যামরা অন্য যে কোন জায়গার হ্যামদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। হ্যামদের সখ ছিল রেডিওর টিউনিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথায় আর কোন্ হ্যামকে পাওয়া যায় দেখা– এভাবে তাঁরা অনেক নিয়মিত হ্যামবন্ধু যোগাড় করে ফেলতেন এবং মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। অবশ্য হ্যাম কথাটি এসেছে রেডিও যুগের একেবারে শুরু থেকে, ১৯০৯-১০ সালের দিকে যারা সেই প্রথম যুগের রেডিওকে ক্রমে ক্রমে বেশি দূরে বার্তা পাঠাবার জন্য কসরৎ করছিলেন তাদেরকে ঠাট্টার কথ্য ভাষায় বলা হতো হ্যাম। সে যুগে ওরা সৌখিনে পেশাদারে একাকার ছিল। বহু বছর পর আশির দশকের প্রথম দিকে ইতালিতে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রে কয়েক মাস কাটাবার সময় এর গেস্ট হাউসে আমি একই কামরায় থেকেছি পোল্যান্ডের এক তরুণ পদার্থবিদ তোমাস স্টাপিনিস্কির সঙ্গে। তোমাস খুবই বন্ধু-বৎসল, এক সঙ্গে খাই দাই, রুমে আড্ডা দিই। ও বললো বাংলাদেশ নামের দেশটির কথা সে প্রথম শুনেছে রেডিও হ্যাম হিসেবে টিউনিং ঘোরাতে ঘোরাতে দৈবক্রমে এদেশে আরেকজন হ্যামকে পেয়ে যাওয়াতে– যে কক্সবাজারে থাকে। উভয়ে এখন ভালো হ্যামবন্ধু। তোমাদের এরকম হ্যাম-

বন্ধু পৃথিবীর নানা দেশে আছে। খুব দূর দেশের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ করতে হলে হ্যামদেরকে নিজের যন্ত্র নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়– বিশেষ করে খুব লম্বা করে খাটানো এন্টেনাকে নানা রকম আকৃতি দিয়ে চেষ্টা করতে হতো দূরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার। সারা দুনিয়া জোড়া এরকম নাগরিক রেডিও-উৎসাহী হাজার হাজার হ্যামরা এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলো।

বিশ্বজোড়া নাগরিক-উৎসাহীদেরকে প্রথম দেখেছিলাম তোমাসের মধ্যে। সম্প্রতি আমাদের দেশের একটি ঘটনা এমনি ধারার নাগরিক অংশগ্রহণকে আরও বেশ নাটকীয়ভাবে আমার কাছে তুলে ধরেছিলো। ওটিকে নাগরিক বিজ্ঞানীদের ব্যাপার বলতে পারি, নাগরিক পরিবেশবিদের অথবা নাগরিক জীববৈচিত্র রক্ষাকারীদেরও বলতে পারি। কক্সবাজারের কাছে সোনাদিয়া দ্বীপের সমুদ্রের চরায় উঠে এসেছিলো একটি সামুদ্রিক কাছিম। এই প্রজাতির কাছিমকে বিলুপ্ত হবার কাছাকাছি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে এমন প্রাণীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি রক্ষা সংস্থা (আই ইউ সি এন)। এই সংস্থা তার দুনিয়াজোড়া কর্মী আর তার থেকে অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক জীববৈচিত্র রক্ষাকারীদের সহায়তায় নিয়মিত এই তালিকা তৈরি করে। তারপর আশঙ্কায় থাকা প্রাণীদেরকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচাবার জন্য নানা ব্যবস্থা নেয়া হয়। সোনাদিয়া দ্বীপে এই বিরল কাছিমটি উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে খবরটি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক জীববৈচিত্রবিদ এটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য নানা দেশ থেকে এখানে আসে। এই স্ত্রী কাছিমটির একটি নাম দেয়া হয় যা সাধারণ বাঙালি মেয়ের নাম ঊর্মি। বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য হলো যত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা সেরে ঊর্মিকে সাগরের পানিতে ছেড়ে দেয়া। তাই দেয়া হলো, তবে ছাড়ার আগে তার পিঠের ওপর লাগানো হলো খুব হালকা ওজনের রেডিও ট্রান্সমিটার ও অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্র যা তার দেহের নানা শারীরবৃত্তের ভালোমন্দ সব সময় মেপে সে তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেবে, তার আশপাশের পরিবেশের কথা জানাবে এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের (জি পি এস) সাহায্যে সে এখন দুনিয়ার কোন জায়গায় আছে তাও জানাবে। এই সব যে শুধু পেশাদার বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন তা নয়, ঊর্মির নামে দেয়া ওয়েব সাইটে ঢুকে দুনিয়ার যে কোন মানুষ তথ্যগুলো সব সময় পেতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে বড় একটি অংশ হবেন নাগরিক জীববৈচিত্র রক্ষাকারীরা, যাঁরা সক্রিয়ভাবে

এরকম প্রাণী বাঁচাতে কাজ করছেন। আর বাকিরা এ বিষয়ে অনেক আগ্রহী মানুষরা। পেশাদার বা নাগরিক– সব বিজ্ঞানীরই উদ্বেগ ঊর্মি বেঁচে থাকে কি না, বংশবিস্তার করে কি না, সে জন্য তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, সেটি হবে প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার পথে একটি পদক্ষেপ।

আমিও বেশ ক'দিন ওই ওয়েব সাইটে গিয়ে ঊর্মিকে অনুসরণ করলাম, ক্লাসে আমার ছাত্রদেরকেও উৎসাহিত করলাম এটি করতে, আমরা প্রায়ই তাকে নিয়ে ও জীববৈচিত্র নিয়ে আলাপও করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ওদের কেউ কেউ যেন জীব-বৈচিত্রের রক্ষায় সচেতন হয়, খবর রাখে, সচেষ্ট হয়। দিনের পর দিন আমরা খবর পাচ্ছিলাম ঊর্মি বার্মা উপকূল হয়ে শ্রীলঙ্কার দিকে চলে গেছে। তার শরীরের তাপ, খাওয়া দাওয়া, শারীরিক ভালোমন্দের অন্যান্য বিষয়ও জানছিলাম; কিছুদিন ধরে তার যে একটি সঙ্গী জুটেছে সে খবরও। গবেষণা ও এই বিশেষ প্রাণীটিকে রক্ষা ছাড়াও এই ধরণের আয়োজনের আর একটি উদ্দেশ্য থাকে– তা হলো সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের মধ্যে জীববৈচিত্র রক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ গড়ে তোলা। যারা সরাসরি ওই ওয়েবসাইটে ঢুকতেন না তাঁরাও এসম্পর্কে তথ্যগুলো পত্রিকায়, টেলিভিশনে জানতে পারতেন। এভাবেই হয়তো গড়ে উঠবে তাঁদের মধ্য থেকে দুনিয়ার নানা জায়গায় আরও বহু নাগরিক বিজ্ঞানী। অথবা নিদেন পক্ষে তাঁরা যার যার পরিবেশে প্রাণী রক্ষায় ব্যক্তিগতভাবে আরেকটু সচেতন হবেন। যেহেতু বিলুপ্ত হওয়ার পথে অনেক প্রাণী নানা বিশেষ অঞ্চলে শুধু দেখা যায়, খুঁজে পেতে হলে সংরক্ষণে সাহায্য করতে হলে ওখানকার স্থানীয়রাই তা করতে পারেন। সব জায়গা পেশাদার পাওয়া বা নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়; ওখানে নাগরিক বিজ্ঞানী ছাড়া গতি নেই।

আমরা যখন সারা বাংলাদেশে গ্রামেগঞ্জে আমাদের অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবের শাখা গড়ে তুলছিলাম, তখন সবাইকে উৎসাহিত করছিলাম যার যার এলাকার পরিবেশের ওপর নজর রাখতে, উদ্ভিদ-প্রাণী নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে, তরুণ নাগরিক বিজ্ঞানীর মত। সেটি এই ইন্টারনেটের কালের ও ঊর্মির কালের বহু আগের কথা।

শতদিকে হাজারো নাগরিক সৌখিনঃ

এখন বনে-জঙ্গলে, মরুভূমিতে, বরফের দেশে সব জায়গায় যে কোন সময়ে বিনা নোটিশে যদি অনুসন্ধান চালাতে কাউকে দেখা যায় তা হলে তিনি নির্ঘাৎ একজন সৌখিন নাগরিক উৎসাহী হবেন। এমন একজন মানুষের

একটি খবর বিদেশি পত্রিকায় দেখে বুঝলাম এরকম গহিন অথবা বিরান জায়গায় এমন মানুষের আনাগোনা কতভাবে চলছে। আমাজন বনের গভীর অভ্যন্তরে বিলুপ্ত- প্রায় এক পাখি প্রজাতির খোঁজে ছিলেন দুজন নাগরিক জীববৈচিত্র রক্ষাকারী। আমাজন বনের ওই পাখিটির সংখ্যা কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাচ্ছিল, তাদের প্রজনন ঘটছিলোনা বলে। একটি বড় কাজ ছিলো কোথাও এই পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে এমন অত্যন্ত বিরল ঘটনা উদ্ঘাটন। এমনি একটির সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা দু'জন। ওই পাখির ডিম ফুটে নতুন বের হওয়ার বাচ্চাগুলোর ছবি তোলা ও আওয়াজ রেকর্ড করে একই সঙ্গে ইন্টারনেটে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য ওখানে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন রাখা ছিল যা কিছুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছিলো– যাতে গবেষকরা, আগ্রহীরা, সংরক্ষকরা ও তাঁদের মত অন্য নাগরিক জীববৈচিত্র রক্ষাকারীরা চাইলে একটানা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। যে অনেক মানুষ ওই একই সময়ে ওই বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং ওদের চিক্ চিক্ মৃদু ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশেষভাবে অনুসন্ধানী মনের। তাঁর কাছে মনে হয়েছে ওই চিক্ চিক্ আওয়াজের সঙ্গে অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজের মতো চাপা আর একটি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো যেটি তিনি স্পষ্টভাবে যান্ত্রিক করাতের আওয়াজ বলে চিনতে পারছিলেন। এর একটিই অর্থ– যে সব শক্তিশালী মাফিয়ার মত গোষ্ঠি আমাজন বনে খুব গোপনে গাছ কেটে বন ধ্বংস করে তাদেরই লোকরা কাছে কোথাও গাছ কাটছে। ওই করাতের শব্দ যিনি পেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ওই পাখির বাচ্চা পাওয়া জায়গার নিকটতম বন-পুলিশ কেন্দ্রে ফোন করলেন; আর বনরক্ষীদের হেলিকপ্টার দ্রুত সেখানে পৌঁছে ওই গাছ-কাটা মানুষদেরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করলো। নাগরিক বিজ্ঞানী এবং ইন্টারনেটের সমন্বয়ে কতদিকে কত রকমের অর্জন ঘটতে পারে, তা বিস্ময়কর।

তবে অনেক আগে থেকে নাগরিক বিজ্ঞানীরা যা করে আসছিলেন তা কিন্তু পরিবেশ নিয়ে নয়, জীববৈচিত্র নিয়ে নয়, বরং আকাশ নিয়ে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে পেশাদারদের ভূমিকা অপরিহার্য, কারণ তাঁদের কাজের জন্য খুব শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আর একটু সাধারণ দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে, এমন কি শক্তিশালী বাইনোকুলার দিয়ে বহু আগে থেকেই সৌখিন জ্যোতির্বিদরা নতুন নতুন ধূমকেতু, সুপারনোভা, ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন, অনেকে এর জন্য প্রচুর খ্যাতিও পেয়েছেন। আকাশ পর্যবেক্ষণ অনেক সময় একটি নিঃসঙ্গ রাতব্যাপী কাজ– দুনিয়ার

নানা জায়গা থেকে করা পর্যবেক্ষণের আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে। এক্ষেত্রে অনেক অতি সাধারণ মানুষ, স্কুলের ছাত্ররাও একাকী কাজ করে নিজেদেরকে দুনিয়াজোড়া পরিচিতি দিতে পেরেছে, এমনকি তাদের নাম ধূমকেতু ইত্যাদির নামকরণও করা হয়েছে। আজকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ের পুরো চিত্র পেতে হলে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণের উপাত্তকে একত্রে সমন্বিত করতে হয়– এখানে নাগরিক জ্যোতির্বিদরা খুব কাজে আসেন, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে। এখন এমন সহযোগী দলের মধ্যে যদি কেউ যোগ দিতে চান তাঁর জন্য খুব সহজ ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁকে দল খুঁজে বেড়াতে হয় না। এক একটি এরকম সৌখিন কাজের জন্য ইন্টারনেট প্ল্যাটফরম গড়ে উঠেছে– তাতে যোগ দিয়ে নিজের অবদানগুলো তুলে ধরলেই অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে। যেমন নাগরিক প্রকৃতিবিদের জন্য 'আই নেচারালিস্ট', নাগরিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষকদের জন্য 'ইনস্ট্যান্ট ওয়াইল্ড'। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্য সংস্থা নাসার এমন প্ল্যাটফরম রয়েছে যাতে দুনিয়াজোড়া অনেক সৌখিন জ্যোতির্বিদ শুধু পৃথিবী ঘেঁষে যাওয়া উল্কা-পিণ্ডগুলোর পর্যবেক্ষণ করে তার গোণাগুনতি নাসাকে দিতে পারে। নাসার জন্য এই তথ্য মূল্যবান আর ওই সৌখিনদের জন্য এটি খুবই তৃপ্তিকর একটি কাজ।

নাগরিক জ্যোতির্বিদরা যেভাবে একা একা কাজ করেন, আবার পরস্পর সহযোগিতা করে দলে কাজ করেন, তেমনি নাগরিক ফটোগ্রাফাররাও করেন, নাগরিক সাংবাদিকরাও করেন। সাধারণ নাগরিক হয়েও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের সৌখিন কাজের মাধ্যমে যাঁরা বড় ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে নাগরিক সাংবাদিককে সবচেয়ে বেশি মানুষের সামনে আসতে হয়। অন্য দশ জনের মত তাঁরা জনতার মধ্যেই মিশে থাকেন, ওখানে যখন কিছু ঘটে তখন তাঁরা একেবারে অকুস্থল থেকে তাৎক্ষণিক তা হুবহু জানাতে পারেন, পেশাদার সাংবাদিকরা কিছু জানার আগেই। অনেক সময় সেই নাগরিক জানতেনও না যে তিনি হঠাৎ এমন কাজ করবেন, বা করতে পারেন। প্রায়শ এমনি সাংবাদিকের তোলা ভিডিয়ো এবং তাঁর দেয়া বর্ণনা চলে যায় বিশ্ব বার্তা সংস্থায়, দৈবক্রমে দেখে ফেলা বিষয় তোলপাড় তোলে। অনেক নাগরিক সাংবাদিক অবশ্য নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে এমনি সাংবাদিকতার উপযুক্ত করে তুলেছেন। এখন সংবাদ যে শুধু পেশাদার সাংবাদিকের হাতে নেই তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধানীরাও অনেক সময় এক একটি বৈশিষ্টপূর্ণ দিকে সাংবাদিকতা করেন যেমন পরিবেশ সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, মানবাধিকার

সাংবাদিকতা– যেখানে ওই বিষয়ের প্রতি মনের একটি ভালোবাসারও ভূমিকা থাকে। আমি সারা জীবন নিজেকে একজন সৌখিন বিজ্ঞান সাংবাদিক হিসেবে মনে করে এসেছি– আমার অনেক আনন্দ, অনেক তৃপ্তি ওখান থেকেই এসেছে।

বিশ্বজোড়া আরও যে সৌখিনরা খুব বড় আকারে অবদান রাখছেন তার মধ্যে রয়েছেন নাগরিক ইতিহাসবিদ ও নাগরিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা। তাঁদের সহায়তা ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার প্রাথমিক একটি কাজ ফসিল সন্ধান তো চলতেই পারতো না। ইতিহাসের উপাদান তৈরি হয় স্থানীয়ভাবে অনেক আলামত খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে। নতুন নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ সব সময় আসতেই থাকে- আর এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে নাগরিক ইতিহাসবিদ্দের কাছে। দেশে দেশে ইতিহাসে দারুণ আগ্রহী এবং সৌখিনভাবে ইতিহাস-দক্ষ অনেক মানুষ আছেন ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের এক রকম রোমান্টিক সম্পর্ক থাকে, আর তাঁদের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে অতীতের কোন হারোনো দিনের চিহ্ন কোন নতুন কথা বলে কি না। এখানেও নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সৌখিনদের বড় সংখ্যাটিই বিশেষভাবে কার্যকর হয়। কোথায় যে কী পাওয়া যাবে তাতো আগে থেকে জানা থাকে না। তাঁদের আরেকটি অবদান ঘটে এক একটি স্থানের অপেক্ষকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাসকে তুলে আনার ক্ষেত্রে। কোন কোন দেশে এরকম স্থানীয় ইতিহাস গবেষণা করার জন্য নাগরিকদের কেন্দ্র আছে যেখানে তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন, প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। আমি একবার লন্ডনের হ্যাম্পস্টীড এলাকায় একটি পরিবারের মেহমান হিসেবে কিছুদিন ছিলাম। তাঁরা বহু বছর ধরে ওখানকার বাসিন্দা, গৃহকর্ত্রী একজন সৌখিন ইতিহাসবিদ, তিনি তখন হ্যাম্পস্টীডের ইতিহাসের ওপর অবসর সময়ে গবেষণা করছিলেন– ওখানকার বয়োবৃদ্ধদের সাক্ষাৎকার নিয়ে; বিভিন্ন ভবনের ভাঙ্গাগড়া লক্ষ্য করে; পুরানো ফটোগ্রাফ, আঁকা ছবি, নিজের তোলা অসংখ্য ছবির ওপর ভিত্তি করে তাঁর গবেষণা চলতে দেখেছি। আমি নিজেও তাঁর দু'একটি কাজে উপস্থিত ছিলাম। পরে 'হিস্ট্রি অফ হ্যাম্পস্টীড' নামে তাঁর বইটিও পড়ার সুযোগ হয়েছিলো।

তবে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সৌখিনরা যা অবদান রাখে তার কোন তুলনা হয় না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনভর ফসিল-শিকারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মাটির ওপরে, খনন করা হয়েছে এমন জায়গায়, অবক্ষয়িত শিলার আনাচে কানাচে, প্রাচীন মাটির ডিবির মধ্যে, কোন ফসিলের নমুনা এমনকি ছোট্ট একটি প্রাচীন হাড়ের ভাঙ্গা নমুনাটিও বের করতে পারলেও

তাঁদের তৃপ্তির কোন সীমা থাকেনা; অথবা পুরাতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোন নিদর্শন– প্রাচীন হাড়ির কোন ভাঙ্গা টুকরা বা পুঁতির মালার একটি মাত্র দানা। তাঁদের অন্যরকম অংশগ্রহণটি বেশি দৃশ্যমান হয় যখন অনেক এরকম সৌখিনরা একটি বড় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শামিল হয়ে যান। এরকম কাজ যাঁরা করেন উৎসাহ ও আগ্রহই প্রথমে তাঁদেরকে ওদিকে নিয়ে যায়; কাজটি অত্যন্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য সাপেক্ষ, সে তুলনায় সাফল্য আসে কদাচিৎ। এভাবে দিনের পর দিন একই রকম কাজে খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পরিশ্রম করতে করতে তাঁরা যেমন আরও পাকা প্রত্নতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন, সাফল্যও বেশি বেশি ধরা দেয়। সেই টুকরা ফসিলগুলো একেবারে হাতে এসে যে ধরা দেয় তা মোটেই নয়, অনেক পলেস্তরার আবরণ, ময়লা, জমাট শিলা এসবের মধ্যে লুকিয়েই কখনো সেগুলো আবছা দেখা দেয়। অনেক সময় ওরকম এক গাদা স্তুপ করা ডেলা, শিলা, ময়লা, গুড়া ইত্যাদির মধ্য থেকে সম্ভাব্য সেই আবছা দেখা দেয়া ফসিল টুকরাটি, বা নিদর্শনের টুকরাটি ছেঁকে বের করতে হয়। এরকম টনে টনে ওজনের ফেলনা জিনিসকে নানা সাইজের ছাকনিতে ছেঁকে ছেঁকে সম্ভাবনাময়গুলোকে বের করে সেটিও সূঁচের মত কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে হয় আসলে কী। রীতিমত ধৈর্য ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ। মনে হতে পারে নেহাতই শ্রমিকের কাজ; কিন্তু একমাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদই তা পারেন, নাগরিক প্রত্নতত্ত্ববিদ হলেও। জহরত চিনতে হলে যে জহুরির চোখ ও জ্ঞান থাকতে হয়। ফসিল টুকরা অক্ষত ও গবেষণা-উপযুক্ত অবস্থায় পেতে হবে– যে দায়িত্ব সেই সব সৌখিনদেরই বেশি, কারণ তাঁরাই সংখ্যায় বেশি থাকেন– তাঁদের মধ্যে অনেকে তরুণ বয়সের ছাত্র-ছাত্রী মাত্র, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে প্রত্নক্ষেত্রে কাজ করছে। কোন্‌টি ফসিলের অংশ কোনটি নয়; কোনটি এত ভাঙ্গা যে এখনই যদি আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে চেনার মত অবস্থায় না আনা হয় তাহলে কাজের সময় সেটি আর চেনা যাবে না। খেয়াল করতে হয় এসব ক্ষুদ্র অংশ পরিষ্কার করার পদ্ধতি, সাবধানতা, কী হাতিয়ার ব্যবহার করে তা করা যাবে কি যাবেনা– খোঁচা দেবার কাঠি, নিজের নখ, স্ক্রু-ড্রাইভারের কোনা, ছোট হাতুড়ি, কোনটি? সিদ্ধান্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গেই তাৎক্ষণিক নিতে হচ্ছে, ভুল করলে ভেঙ্গে ফেলার ভয়। এসবে ওই প্রাণী, ওই ফসিল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাখতে হয়, লক্ষ বছর আগের এই বিশেষ প্রাণীটি মারা যাওয়ার পর কী কী প্রক্রিয়ায় এই টুকরাগুলোতে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাসটি মনে খেলিয়েই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয়। এই জ্ঞানেরও ব্যবহার করতে হয় এই মুহূর্তের মধ্যে

তাৎক্ষণিকভাবে। মূল আবিষ্কারে তাঁদের এই মনপ্রাণ ঢেলে দেয়া ভালোবাসার কাজের স্বীকৃতি মিলুক আর না মিলুক, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। স্বীকৃতি তাঁরা সাধারণত পান্ না, অথচ ওই আবিষ্কারটি কোন্ পথে যাবে, আদৌ ঘটবে কিনা তার অনেকটা তাঁদের ওই খুঁটিনাটি কাজগুলোই নির্ধারিত করে দেয়।

নাগরিক বিজ্ঞানী, এবং সব রকমের নাগরিক সৌখিনরা বরাবর ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার জন্যও একটি অত্যন্ত উপকারী সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছেন। আমাদের দেশে এ কথাটির উপলব্ধি কম, আমরা তাই প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারদের ওপরেই সব কাজের জন্য নির্ভর করি, ওই বিশেষজ্ঞের সংস্কৃতিতে আমরা অতিরিক্ত আস্থাবান। এই কারণে আমাদের সাধারণ মানুষ নাগরিক বিজ্ঞানী হয়ে নিজেদের মধ্যে যেমন যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে না, তেমনি এমনি নাগরিক সৌখিনদের নানা গোষ্ঠির বিশ্বময় নেটওয়ার্কেও যুক্ত হতে পারে না। সেটি যখন ঘটবে তখন তারাও নিজেদেরকে অসাধারণ করে তুলতে পারবে এবং সেই সঙ্গে দেশটিকেও। শুধু সীমিত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ যাঁদেরকে উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ বেতন দেয়া দেশের পক্ষে সম্ভব তাঁদের ওপর নির্ভর করলে এটি হবে না। আমার নিজের কাজে বরাবর একটি চেষ্টা ছিল যে নিজেদেরকে এভাবে নাগরিক সৌখিন হিসেবে ভাবা, সে ভাবে কিছু অর্জন করা, এবং তরুণ তরুণীদের মধ্যে এমনি আকাঙ্খাও গড়ে তোলা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও মনের তাগিদে আরও কিছু শিখে ও আরও কিছু করে নিজের জন্য আরেকটি বাড়তি জায়গা তৈরি করা। তার কিছু সার্থকতা দেখতে পেয়েছি আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীতে– অনেকে তাতে নিজেদের লেখায় কাজের প্রতিবেদন লিখেছে, কাজের প্রস্তাব করেছে; দেখেছি বিজ্ঞান ক্লাবে 'অনুসন্ধানীদের' মধ্যে; আর দেখেছি আমাদের অনানুষ্ঠানিক মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। আজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে তারাও তাদের মত আরও অনেককে খুঁজে নিচ্ছে, কেউ কেউ বিজ্ঞানে, স্থানীয় সম্পদ আবিষ্কারে, এমনকি স্থানীয় ইতিহাস-উপাদানের সংগ্রহে, সক্রিয় হচ্ছে এবং সে কথা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে; এসবে আশার সঞ্চার হয়।

জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ

এনজিওর স্বেচ্ছাসেবীরাঃ

সৌখিন হয়েও পেশাদারের নানা ভূমিকায় আমাকে কাজ করতে হয়েছে দিনের পর দিন– সৌখিনতার জগতেও প্রাতিষ্ঠানিক কিছু করতে গিয়ে এ

ছাড়া উপায় ছিল না। আর এই কাজের কথা বলতে গেলে কোন এক রকম বর্ণনার কুলায়না– তাতে জুতা সেলাইয়ের তুলনীয় একেবারেই মামুলি কাজ যেমন আছে, তেমনি দুনিয়ার কাছে আমাদের আদর্শ তুলে ধরা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার মত চণ্ডীপাঠও আছে। সমস্যা হলো এর কোনটারই বিদ্যা আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে ছিল না, করতে করতে জেনে জেনে শিখতে হয়েছে। এরকম নানা কাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে এমন সহকর্মী যে ছিলনা তা নয়– কিন্তু আমাদের অদ্ভুত এই কর্মক্ষেত্রে সেগুলোকে কাজে লাগাতে গেলে ওই বিদ্যাকে আমাদের মত করে বদলাতে হবে, অন্তত খাপ খাইয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করতে হবে। সে জন্য আমাকেও ওসব কাজ শিখতে হয়েছে ওভাবে বদলানো বা খাপ খাওয়ানোটি সম্ভব করতে। নিজে যা একেবারে পারবোনা তা অন্যকে দিয়ে করানো কঠিন, আর তাকে বদলে নেয়াতো একেবারেই অসম্ভব। এভাবে আমাকে নাগরিক প্রশাসক হতে হয়েছে, নাগরিক প্রকৌশলী, নাগরিক একাউন্টেন্ট, নাগরিক অডিটর, নাগরিক ট্রেইনার, নাগরিক স্কুল-শিক্ষক, নাগরিক জেন্ডার-বিশেষজ্ঞ, নাগরিক প্রযুক্তি-উদ্ভাবক, নাগরিক লেখক-সম্পাদক– একের মধ্যে এরকম অন্তত ডজন খানেক নাগরিক।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে সৌখিন ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করাতে এর প্রত্যেকটিতে নাগরিক কথাটি বলে সেটি বোঝালাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে সৌখিনকেও কিছুটা পেশাদার-সৌখিন না হয়ে উপায় নেই, তাতে 'বকচ্ছপের' মত মনে হলেও। পেশাদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা হলো যা করতে চাই তা যেন সব মহলে স্বীকৃত হবার মত করে করতে পারি, সাফল্য-ব্যর্থতার পরিমাপের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে। আর দশটি প্রতিষ্ঠানের মত আমাদেরটিকেও প্রাসঙ্গিক সবার কাছে জবাবদিহি করতে হয়, আর এ জবাবদিহিতা উপকারভোগী, সরকার, বিদেশি সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা সবার নিয়ম অনুযায়ীই করতে হয়েছে কারণ বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র নানাভাবে এর সবার কাছে দায়বদ্ধ। তাই আমাকে শিখতে হয়েছে প্রত্যেকের নানা নীতিমালা এবং তাদের কেতাদুরস্ত নিয়ম কানুনও। শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে এবং নির্দিষ্ট কাজের চাকরি করার জন্য যে ক'জন সহকর্মীকে পেশাদার বলা যেতো, এখানকার কাজে এসে তাঁদেরকেও এতে নিজেকে খাপ খাওয়াবার উদ্দেশ্যে কিছুটা সৌখিন স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকাও নিতে হয়েছে। আমাকে অবশ্য বইপত্র থেকে, বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে, সহকর্মী ও সহযোগীদের থেকে, আর অভিজ্ঞতার থেকে, শিখতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো অত্যন্ত আনন্দের শেখা।

বিশেষ করে যেখানে ওর সঙ্গে নিজের চিন্তা ভাবনাও মেশাবার সুযোগ পাওয়া গেছে সেগুলো খুবই তৃপ্তিকর। দেখে অবাক হয়েছি যে প্রায় সব রকম জিনিসেই কমবেশি সে রকম মেশাবার সুযোগ আছে। কিছু কিছুতে তো নিজের অবদানটি বেশ স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়েছে নিজের ঝোঁক ও পটভূমির কারণে– যেমন স্কুল শিক্ষক, ট্রেইনার, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, প্রকৌশলী, তরুণদের পরিচালক, সম্পাদক, লেখক ইত্যাদির ভূমিকায়। এতই একাত্ম হবার সুযোগ পেয়েছি যে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ও কর্মীদের জন্য সহজবোধ্য ও বাস্তবের সঙ্গে আনন্দদায়ক হিসেবে মিলিয়ে এর ওপর ছোট ছোট বই লিখতেও অগ্রণী হয়েছি সহকর্মীদেরকে নিয়ে। খুব অল্প কিছু জিনিস নিরানন্দ, তবু তাও শিখতে ও করতে হয়েছে– যেমন সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার চাপিয়ে দেয়া অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক কিছু কাজ– যেগুলো শুধু কাগজ ও কম্পিউটার ফাইল বাড়িয়েছে বলে মনে হয়েছে, কার্যকর কোন জবাবদিহিতা বাড়িয়েছে বলে মনে হয়নি। এগুলোর জন্য প্রচুর সময় দিতে বিরক্তি বোধ হয়েছে তবুও দিতে হয়েছে। কিন্তু এই বিচিত্র কাজের বেশির ভাগেই আনন্দ, শুধুই আনন্দ। এত কিছুতে সৌখিন পেশাদার হওয়াতে প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে হয়েছে, কিন্তু ছোট বড় সাফল্যের আনন্দ সব পরিশ্রমকে সার্থক করে।

এনজিও কথাটি অবশ্য সাদামাটা 'বেসরকারি সংস্থা'– ওতে এনজিও'র পুরো চরিত্রটি বোঝা যায় না। সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পার্থক্য রাখতে জাতিসংঘই নিজে যখন সরকারের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছে তার নাম দিয়েছিলো এনজিও (বেসরকারি সংস্থা)। তারপর থেকে জাতিসংঘের ব্যাপারে না থাকলেও দেশে দেশে নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য গড়ে ওঠা সব প্রতিষ্ঠানকেই বলা হচ্ছে এনজিও। কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এগুলো গঠিত হয় না, বরং সাধারণত কয়েকজন মানুষের স্বতস্ফুর্ত উৎসাহে সৃষ্টি হয়– এই অর্থে সব এনজিও স্বেচ্ছাসেবী। কিন্তু বহু এনজিও অন্তত আংশিকভাবে হলেও আরও এক ভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান– কারণ এখানকার অনেক কাজ আসে একেবারেই পারিশ্রমিকহীন স্বেচ্ছাশ্রম থেকে। এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম দেন, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজগুলো সম্পাদনের সময় নিজের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও মেধা প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য অর্জনে দান করে থাকেন। তাঁদের অধিকাংশই কাজের মেজাজে সৌখিন নাগরিক, এবং তাদের অনেককে রীতিমত সৌখিন পেশাদার হয়েও উঠতে হয়।

কিছু আন্তর্জাতিক এনজিওর উদাহরণ নেয়া যাক। যেমন মেডিসিন স্যান ফ্রন্টিয়ার বা এম এস এফ (সীমানাহীন চিকিৎসক) নামের এনজিওটির অনেক স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তাররা দুনিয়ার নানা দেশে গিয়ে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন– অসহায়কে রক্ষার ব্রত নিয়ে। গ্রীনপীস নামের আরেকটি এনজিও পৃথিবীর পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। এটি অন্য দশটা প্রতিষ্ঠানের মতই কাজ করে তার দপ্তর, কর্মী, পরিচালক ইত্যাদিকে নিয়ে; তাঁদের অনেককে নিশ্চয়ই দৈনন্দিন অনেক দাপ্তরিক কাজ, গবেষণার কাজ, প্রশাসনিক কাজ করতে হয়। কিন্তু গ্রিনপীস এসবের দ্বারা যতটা না বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার চেয়ে বেশি পরিচিত একটি আন্দোলন হিসেবে, যে আন্দোলনের পুরোধা হলেন এর অনেক স্বেচ্ছাসেবীরা। তাঁদেরকে দপ্তরে বেশি দেখা যায় না, দেখা যায় পরিবেশ ধ্বংসকারীদের সঙ্গে বা জীববৈচিত্র নষ্টকারীদের সঙ্গে লড়াই যেখানে চলছে সেখানে, সে লড়াইয়ে বড় যোদ্ধারাও তাঁরাই। টেলিভিশন সংবাদে দেখেছি ছোট্ট নাজুক একটি রাবারের ডিঙ্গিতে করে সমুদ্রের মাঝখানে দৈত্যাকার বিশাল তিমি শিকারি জাহাজের গতিরোধ করতে, তাদের কাজে বাধা দিতে। এসব জাহাজ ব্যবসায়িক স্বার্থে বিশাল সংখ্যক তিমি হত্যা করে থাকে বেআইনিভাবে, অথচ বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকা এই তিমি শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ওভাবে গতিরোধ করার উদ্দেশ্য হলো এই নষ্টকারীদের কাজকে দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত করা এবং এটি বন্ধ করার চেষ্টা করা। অত্যন্ত প্রতিকূল সমুদ্রে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাজটি জীবন হাতে নিয়েই করতে হয়। তাঁদের কারো কারো নিজেদের জীবনের কাহিনি পড়েছি– নিজেদের নিয়মিত পেশা ছেড়ে অথবা তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা বছরের পর বছর এ রকম কাজে নানা জায়গায় গিয়েছেন।

অন্য এক ধরণের এনজিও'র আরেকটি পর্যায়ের স্বেচ্ছাশ্রমকে আমি সরাসরি আরও কাছাকাছি দেখেছি। বেশ কিছু এনজিও রয়েছে যার মূল ভিত্তি হচ্ছে এর অসংখ্য সদস্যদের সক্রিয় সমর্থন। এগুলো আসলে এক একটি গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন; সদস্যরাই প্রতিষ্ঠানটিকে পোষণ করেন, তৃণমূলে তার জন্য কাজ করেন, এবং প্রতিষ্ঠানের উপরি-কাঠামোটি গঠন করেন। ফ্রান্সের এমন একটি এনজিও আমাদের বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগী ও দাতা হওয়াতে ওই পুরো সংগঠনটির সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিলো বহু বছর ধরে। এর নাম তেরে দেস হোম (মানুষের জন্য পৃথিবী)– সব মানুষের জন্য, বিশেষ করে দুনিয়ার সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা তার ব্রত। নানা দেশে আলাদা

সংগঠন হিসেবে এটি আছে, আমার সঙ্গে কাজ ছিল ফ্রান্সের সংগঠনটির সঙ্গে। ফ্রান্সে গিয়েছি বেশ কয়েকবার ওখানে এনজিওটির সঙ্গে কাজ করার জন্য, সারা ফ্রান্সের নানা শহর আর গ্রামে, সব সময় কোন না কোন সদস্য পরিবারের সঙ্গে থেকেছি। দেখেছি সারা দুনিয়ায় তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো যে মানুষগুলোর জন্য কাজ করে তাঁদেরকে তাঁরা ভালোই চেনেন; কেউ কেউ ওখানে গিয়ে কিছুদিন স্বেচ্ছাসেবাও দিয়েছেন। প্রতিটি মাসে কিছু না কিছু সময় তাঁরা তেরে দেস হোমের জন্য অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যয় করেন, নিজেদের তৈরি বা নিজেদের পুরানো জিনিস বিক্রির মেলা করে, নানা অনুষ্ঠান করে, প্রদর্শনী করে ও আরও নানা ভাবে। একবার তাঁদের সবার সাধারণ সভায় প্যারিসে প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে দেখি ফ্রান্সের নানা জায়গা থেকে এসে যে যেখানে পেরেছে বিছানা পেতেছে, অফিসে, হলঘরে, ওখানে যে প্রেসটি আছে তার মেশিনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা তাবলিগ জামাতের কায়দায়। প্রতিষ্ঠানের অর্থ আসল কাজে না গিয়ে নিজেদের জন্য একটুকুও যেন ব্যয় না হয় সেদিকে তাঁদের কড়া দৃষ্টি। স্বেচ্ছাসেবা বলতে যতকিছু বোঝাতে পারে তার সব কিছুরই তাঁরা যেন প্রতিমূর্তি।

আবার অন্য রকম আন্তর্জাতিক এনজিও'র সঙ্গে কাজ করেছি যেখানে অবশ্য ওরকম সৌখিন-নাগরিক মানুষের সাক্ষাত পাইনি, বরং কাজে দক্ষ যোগাড়ি কর্মকর্তাদের দেখেছি– কেউ কেউ নিজ নিজ ক্ষেত্রের রীতিমত বিশেষজ্ঞ। তাঁদেরকে সৌখিন বলার দুঃসাহস কারো হবে না। বড় কাজ, বড় পরিকল্পনা– সেসব বাস্তবায়িত করার জন্য সকল যোগাড়যন্ত্র করার ব্যবস্থা সেখানে, সেজন্য আনুষ্ঠানিকতা আর কেতা-কানুনেরও কোন শেষ নেই। তবে বেসরকারিভাবে সংগঠিত হবার কারণে এগুলোও এনজিও, সরকারি খুব সুনির্দিষ্ট সব নিয়মনীতির বদলে এগুলোর নিজের নিয়মনীতি চালু করার স্বাধীনতা আছে, সেই সুবাদে কাজেরও স্বাধীনতা বেশি; এইটুকু বাদ দিলে উচ্চ সরকারি দপ্তরের সঙ্গে তাদের বেশি পার্থক্য নেই।

এনজিও'র শতফুলঃ

আমার কাছে সব সময় নাগরিক বিজ্ঞানীর মত এনজিওরও একটি আলাদা বৈশিষ্ট থাকা জরুরি মনে হয়েছে। তারা যদি সবাই একটি ছাঁচের মধ্যে পড়ে যায়; সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের থেকে যদি তাদেরকে আলাদা করা না যায়, তাদের জগতে সবই যদি এক-কেন্দ্রিকতার দিকে যায় তা হলে আমরা ভিন্নতরভাবে সমস্যা সমাধানের একটি রাস্তা হারিয়ে

ফেলছি। এখানে এনজিওর সঙ্গে আমি নাগরিক বিজ্ঞানীদের একক, কয়েকজনের সম্মিলিত, অথবা বড় নেটওয়ার্কের সঙ্গেই তুলনা করতে ভালোবাসি। ওই শেষের মানুষগুলোর গুরুত্বই হলো তাদের বৈচিত্র, তাদের মধ্যে শতফুল ফুটতে দেয়া যা প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারদের পক্ষে সৃষ্টি করা কঠিন।

বাংলাদেশের এনজিওদের যাত্রা এভাবেই শুরু হয়েছিলো– যে যেখানে পারে, যেভাবে পারে সহায়তায় লেগে যাওয়া, আর অন্য পটভূমি থেকে আসা মানুষরাও নিজের সৃজনশীলতা আর ভালোবাসা দিয়ে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারা। এ কারণে এনজিওদের সেই প্রাথমিক সময়টিতেই এক সময়ে মনে হয়েছে, এতদিন ধরে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানে উৎসাহ নেবার জন্য যা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম, যাকে আমরা আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীতে গোড়া থেকেই বিজ্ঞান আন্দোলন বলে এসেছি, এবার এনজিওকে আশ্রয় করে তার বিস্তৃতি ঘটাতে পারি কিনা সুযোগ-বঞ্চিতদের মধ্যেও। এভাবে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) সৃষ্টির মাধ্যমে এনজিও জগতে যোগ দিয়ে একবারও আর ফিরে তাকাইনি, সব সময় মনে হয়েছে সৃষ্টিশীল স্বেচ্ছাসেবীদের মেলার মধ্যেই আছি। আশপাশের সব এনজিওকে সেভাবেই পেয়েছি।

কিন্তু দেশের এনজিও জগত বদলিয়েছে। এখানে একটি নতুন মন্ত্র সঙ্গত কারণেই এসেছে তা হলো 'স্কেইল আপ'– যা করছো তা অনেক বড় করে কর, অসংখ্য সুবিধাভোগী তোমার কাজের থেকে উপকার না পেলে এর সার্থকতা নেই। এ কাজের জন্য উপযোগী বিবেচিত হলো যারা খুবই দক্ষ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দ্রুত নিজের কাজের পরিধি বাড়াতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের সৃজনশীল কেন্দ্র থেকে পরিধিটি ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে চলে গেলেও ক্ষতি নেই। একটি ফর্মুলার মত করে মূল-প্রশিক্ষক শাখা-প্রশিক্ষককে শেখাবে, তারা স্থানীয় প্রশিক্ষককে, তারা কর্মীকে, এভাবে পর্যায়ক্রমে শিখিয়ে মূল কৌশলের বিস্তৃতি ঘটানো হলো। এতে ফর্মুলার বাণী নিশ্চয়ই যথেষ্ট পৌঁছে, কিন্তু প্রাণ পৌঁছায় না। এর আরেকটি ফল হলো উন্নয়ন সহযোগীরা (দাতারা) এই স্কেল আপের উপযুক্ত এনজিওদের ওপরেই ভরসা রাখলো, কারণ তাতে সাফল্য বেশি দেখা যায়, অন্তত সংখ্যাগত দিক থেকে। সেই সঙ্গে শতফুল ফোটানো অন্য এনজিওগুলোকেও যথাসম্ভব একই বন্ধনীর মধ্যে বেঁধে ফেলার জন্য অন্তর্বর্তী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করলো তাদের সমন্বয়ে, যাতে ওই স্কেল আপ করা বড় এনজিওদের মত বড় কিছুর সঙ্গে কাজ করা যায়। ওই বন্ধনীটাই হলো

সেই বড় এনজিও প্রতিষ্ঠান। ফর্মুলা যোগান দিতে ও তাদের তদারকি করতে বন্ধনীটি রীতিমত পেশাদার প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলো। ওতে নানা রকম সংখ্যাবাচক লক্ষ্যবস্তু দেয়া থাকে, যা পূরণের জন্য অসম্ভব তাগাদা দেয়ার অনেক পেশাদার মানুষ থাকে সেই প্রতিষ্ঠানে। সেই বন্ধনী প্রতিষ্ঠানই তখন আসল এনজিওদের সব সাফল্যের দাবিদার হয়ে যায়। দাতা সংস্থা বা সরকার তখন সংক্ষেপে ওই বন্ধনীর সঙ্গে কাজ করলেই চলে, মূল এনজিওগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দরকার হয়না– অর্থ সহায়তাও ওর মাধ্যমেই দান করা যায়। এর ফলে গোড়াতে কাজের প্রাণটি আর কোথাও থাকেনা– অথচ এই প্রাণই এনজিও'র বড় সম্পদ। এই প্রাণ দিয়েই শুরুতে স্কেল আপ করা বড় এনজিওগুলোও ডানা মেলে উড়তে পেরেছিলো।

এদেশে এনজিও'র প্রায় একেবারে গোড়া থেকেই তাদের কোন কোনটির সৃষ্টিকারদের কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যেও দেখেছি সেই জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের সব কিছুর মধ্যে নিজের জীবনকে ব্যস্ত রেখেছেন। তাঁরা একটি বিশেষ নেশা, বিশেষ স্বপ্নকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের জীবনকে গতানুগতিকতার বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। অনেকের কথা জানি যাঁরা কোন দিন ভাবেনওনি যে তাঁকে একদিন সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। নিজের জীবনে যা দেখেছেন, যা তাঁকে ভাবিয়েছে তাই তাঁকে এমন করতে বাধ্য করেছে। সে সব প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি এখন অনেক বড় হয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে; যারা তা হয়নি তাদেরো স্বপ্ন সার্থক হয়নি এ কথা বলা যাবে না।

এমনিতরো এনজিওদের সংখ্যা ও বৈচিত্র যে আরও অনেক ব্যাপক তা বুঝতে পেরেছি আরও পরে যখন ২০০৮ সাল থেকে এনজিও ফেডারেশনের নেতৃত্বে শামিল হই– এর মধ্যে পর পর তিনবার এর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ছয় বছর এর অনেক সদস্য এনজিও'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পারি। ভিন্ন রকমের ভিন্ন স্বাদের এক একটি গল্প এদের গড়ে ওঠার পেছনে দেখতে পেয়েছি। স্থানীয় কোন কোন পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে কাজ করেছে– যেমন উপকূলীয় নোনা পানিতে সংগ্রাম রত মানুষের সমস্যা, সীমান্ত এলাকার মানুষ-পাচারের সমস্যা, চরাঞ্চলের ভঙ্গুর পরিবেশের সমস্যা ইত্যাদি। যিনি বা যাঁরা এনজিওটি গড়েছেন স্বপ্ন ছিল সমস্যার সমাধানে হাত বাড়িয়ে দেয়া। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বহু রকম মানুষের সংশ্রব আছে সমস্যাগুলোতে, আবার সমাধানের উপায়ও নানা মানুষকে সচেতন করে কাজে আনার মাধ্যমেই। কোন দিক থেকেই কাজটি সহজ হয়নি– যেমন,

পরিবেশ নিয়ে, মানুষ নিয়ে নানা চ্যালেঞ্জ, তেমনি সংগঠনের ব্যয় সংস্থান নিয়েও। এখানে সাফল্যের পেছনে কাজ করে মূলত প্রধান মানুষটির ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বেচ্ছাসেবী নিবেদিত জীবন। প্রত্যেকটি সফল এনজিওতে এই জিনিসটির গুরুত্ব লক্ষ্য করেছি। শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা ম্যাজিকের মত কাজ করে ওই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করতে। ওখানে, ওইভাবে, ওই দীর্ঘদিনের জমে ওটা বাধাগুলো অতিক্রম করে এগুতে গেলে নিবেদিত এমন মানুষের বিকল্প নেই। এটি যতটা না দক্ষতার প্রশ্ন তার থেকে বেশি ভুক্তভোগীদের জন্য ভালোবাসার প্রশ্ন।

এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলোর কারণেই আটঘাট বাঁধা, ওপরের দিকে অভিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞদের সমারোহপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেখানে আসল সমস্যার গোড়াতে পৌঁছতে পারেনা এই স্বতস্ফূর্ত এনজিওগুলো তা পারে। প্রায় ক্ষেত্রেই অবশ্য দেখেছি এই স্বতস্ফূর্ততাটি ব্যাহত হয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতিতে অনিশ্চয়তার কারণে। যেখানে সৃজনশীলভাবে সমস্যা সমাধানে লেগে থাকাটাই বড় কাজ হওয়া উচিত ছিল দেখা যায় পরের বছরের সঙ্গতি যোগাবার চেষ্টাতেই তার ঘুম হারাম করতে হচ্ছে। অথচ এদের চাহিদা কিন্তু তুলনামূলকভাবে খুবই কম; যেমন অনেক উচ্চ ব্যয়ের বিশেষজ্ঞদের পোষণ তাদেরকে করতে হয়না যেটি সুপ্রতিষ্ঠিত বড় এনজিওদের করতে হয়। সরকার ও দাতা সংস্থার অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক কাগুজে কাজ চাপিয়ে দেয়ার কথাতো আগেই বলেছি এতেও সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব নিয়ে এনজিও ফেডারেশনকে ক্রমাগত কাজ করতে হয়েছে।

কিন্তু ফেডারেশনকে যে কাজটি আরও গুরুত্ব দিয়ে করতে হয়েছে তা হলো এনজিওদের নিজেদের মধ্যই তাদের স্বেচ্ছাসেবী-চরিত্রটি বজায় রাখা। কারণ ওসময়ে এসে বজায় রাখাটি কঠিন হয়ে পড়েছিলো। অর্থাভাবে স্বল্পমেয়াদি ফরমায়েশি কাজের পেছনে ছুটতে গিয়েই তা কঠিন হয়ে পড়ছিলো। এতে অনেক ক্ষেত্রে এনজিও কার্যত সরকারি দপ্তরের মত বা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মত হয়ে পড়ার আশঙ্কাতে ছিল– যারা কাজ দিয়েছে সারাক্ষণ তাদের ফরমায়েশের খুঁটিনাটি শর্ত পালন করতে গিয়ে। এনজিও'র গৌরবটাই হলো তার স্বায়ত্ব-শাসন– একেবারে তৃণমূলে পরিবর্তন আনতে নিজস্ব নীতি, নিজস্ব কর্মকৌশলের ব্যবহারে। সেই স্বায়ত্ব-শাসনের সুযোগ এখন সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

এই সুযোগে এনজিও'র প্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে বাইরে ভুল বোঝাবুঝির এবং কিছু কিছু নায্য সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ ঘটেছে। এক দিকে বড়

বড় এনজিওর উপর মহলে বাড়ি-গাড়ি-বেতন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অন্য দিকে কোন কোন এনজিও প্রধানরা (অনেকের ভাষায় 'মালিক') স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফেডারেশনকে এই বিষয়ে মনোযোগী হতে হয়েছে, সমালোচনার কারণ দূর করতে এনজিওগুলোর মধ্যে আত্মসমালোচনা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি উন্নত করার ব্যাপারেও। এই সুযোগে সরকারি আমলাতন্ত্র ক্রমেই নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণ এনজিও'র ওপর আরোপ করে তাকে ওদিক থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি নিয়ে আসছিলো। এই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করাটিও খুব জরুরি হয়ে পড়েছিলো। আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে এনজিও'র মূল সৌখিন স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণাটি অক্ষুণ্ন রাখার মধ্যেই রয়েছে এসবের প্রকৃত সমাধান। পেশাদারিত্বের চেয়েও নাগরিক কর্মীর চরিত্রটাই তৃণমূলের মানুষের জীবনে সহজে পৌঁছতে পারে।

সাভানার স্মৃতি

জীবপ্রেম

আমার টম্যাটো চারাঃ

তখন আমার বয়স চার বছরের বেশি হবে না, তখনকার অন্য তেমন কিছুই মনে নেই, কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট মনে আছে। প্রত্যেকদিন ভোরে নিজে নিজে সিড়ি বেয়ে উঠে আমাদের শহরের বাসার ছোট্ট রেলিংঘেরা ছাদে যেতাম। যেতাম শুধু একটি কারণে– ওখানে টবের মধ্যে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট টম্যাটো চারা। বিকেল বেলায় ছাদে খেলার সময় দেখতাম এগুলো সারাদিন শুকিয়ে নিস্তেজ হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে– কোন কোনটি তার খুব ছোট্ট ফুল ও ছোট্ট টম্যাটো নিয়েই। ওটি দেখতে ভালো লাগতো না। ভোরে ওই চারাগুলোকেই দেখতাম সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যে। রাতের শিশিরে ভিজে তখন সেগুলো টগবগে খাড়া হয়ে উঠেছে– পাতাগুলো পুরাপুরি জেগে ওঠা, পুরোটা মেলে ধরা, একটুও কোঁকড়ানো নয়। ডাঁটা, পাতা, কলি সবই মনে হয় ফোলা ফোলা ঠস ঠস করছে। যে দু'একটাতে ফুল আছে তা ওপরে মেলে ধরা, কোন কোনটাতে মাঝখানে সুন্দর লাল ছোট্ট টম্যাটো। এর একমাত্র বর্ণনা হলো চোখের সামনে সুন্দর সতেজ একটি জীব। ঠিক তখন যে ভাবে দেখেছি সে ভাবেই মনে আছে– সেই সঙ্গে মনের মধ্যে খেলে যাওয়া আনন্দের হিল্লোল। ওইটুকু বাচ্চার মধ্যে নেতিয়ে পড়া টম্যাটো চারার বদলে এভাবে জেগে ওঠা সতেজ চারা দেখে এত আনন্দ কোথা থেকে এলো যে শুধু সেটি দেখার জন্য ভোরে সিড়ি ভেঙ্গে ছাদে যেতে হবে? এই বয়সে প্রকৃতি জগতের সঙ্গে তার এমন কোন মেলামেশা ঘটেনি, বা কেউ এমন কোন শিক্ষাও দিতে পারেনি। গিঞ্জি শহরের ইটের কোঠার মধ্যে থাকা আমার ক্ষেত্রে তো অন্যথা একেবারেই নয়। তা হলে এর একটি ব্যাখ্যাই আছে, এটি শিশুর কাছে জন্মগতভাবে আছে– সব শিশুর ডিএনএর মধ্যেই আছে।

এখন তার একটি ব্যাখ্যা পাচ্ছি মানুষের জেনেটিক ইতিহাস থেকে। সেটি যদি ঠিক হয় তা হলে যুগে যুগে মানুষের যে কোন বাচ্চা ওরকম

জীবন্ত কিছুকে সতেজ অবস্থায় দেখে এমনি আনন্দ অনুভব করবে– ছোট কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী দেখলে। মানুষের বহু লক্ষ বছরের ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে তার মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে কম সময়ে অভাবনীয় রকমের বড় ও জটিল হবার দিকে বিবর্তিত হয়েছিলো। আর সে সময় মানুষের প্রধান বাসভূমি ছিল পূর্ব আফ্রিকার সাভানা নামে পরিচিত তৃণভূমিতে। ওটিই ছিল আমাদের মত মানুষ হোমো সেপিয়েন্সের আদি লালনভূমি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এক কালের ঘন বনভূমি পরিণত হয়েছিলো এমনি তৃণ ভূমিতে; কাছে কোথাও কোথাও ঘন বন ছিল বটে, তবে অধিকাংশ জায়গা উন্মুক্ত তৃণভূমি; তাতে ঘাস ও অনুচ্চ ঝোপই বেশি, শুধু কিছু দূরে দূরে একা বা দুএকটি করে স্বল্প ঝাঁকড়া গাছ– এইই সাভানার দৃশ্য। কিন্তু সে দৃশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবশ্যই এর প্রাণিকূলের– বেশ বড় থেকে মাঝারি ছোট বিচিত্র সব স্তন্যপায়ী তৃণভোজী প্রাণীই প্রধান, কিন্তু তাদের সমাগমের সুযোগ নিতে সেদিনের নানা হিংস্র প্রাণীও। নর-বানর জাতীয় যেই বড় এইপগুলো ছিল তাদেরই মধ্য থেকে কালে কালে বিবর্তিত বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির সর্বশেষ প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সের দ্রুত বিবর্তন ঘটছিলো, বিশেষ করে তার মস্তিষ্কের বিবর্তন। তার দৈহিক-মানসিক নানা পরিবর্তন ঘটছিলো বিবর্তনের ফলে তার ডিএনএ পরিবর্তনে। বিবর্তনের নিয়মে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়াতে পরিবেশের প্রতি একটি ভালোবাসা সে ভাবেই মানুষের ডিএনএর অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলো। উচ্চতর মানবিক বিষয়গুলো সে সময় দ্রুত বিবর্তন হচ্ছিলো বলেই আবেগ, সৌন্দর্য প্রীতি ইত্যাদিও সে সময় আমাদের মস্তিষ্কের অংশ হয়ে যাচ্ছিলো। সেই সঙ্গে তাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতো হয়ে ছিলো যেই সাভানা– তার ঘাস, তার ঝোপ, তার বৃক্ষ এবং তার প্রাণিকূল, সে সবের প্রতিও অদ্ভুত একটি আকর্ষণ সেখানে ঢুকে গিয়েছিলো।

এটিই সাভানার স্মৃতি– সাভানার থেকে পেয়ে যাওয়া অদ্ভুত এক জীবপ্রেম; জীবনের যে কোন লক্ষণের প্রতি এই প্রেম, বিশেষ করে যেখানে এর সুন্দর একটি নান্দনিক প্রকাশ ঘটে– একটি পাতায়, একটি ফুলে, একটি চারায়, ফলে, বৃক্ষে, তৃণতে, বনে এবং তার মধ্যে বিচিত্র সুন্দর প্রাণিকূলের প্রতি। এটি অভিজ্ঞতায় ও অনুসন্ধানে পরে আরও বিকশিত হয় বটে, কিন্তু এর মূল আবেগ, মূল প্রেরণাটি সেই সাভানায় বিবর্তিত হওয়া মানুষগুলো থেকে বংশগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে গিয়ে আজ পৃথিবীর সব মানুষের মস্তিষ্কে চলে এসেছে। তাই জন্মের পর থেকেই সে এতে সাড়া দেয়, এগুলো তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আকর্ষণ করে ভালোবাসার টানে। মাত্র

কয়েক মাস বয়সের বাচ্চাকেও দেখা গেছে যে কোন প্লাস্টিক বা ধাতব খেলনার থেকে সত্যিকার একটি বেড়ালের বাচ্চা, সত্যিকার একটি রঙীন টস টসে ফল, এমনকি দেয়ালে একটি টিকটিকির ছুটাছুটি করা আর টিক্ টিক্ টিক্ আওয়াজে অনেক বেশি মনোযোগ দেয়, এবং ভালো লাগার মত করে তাকিয়ে থাকে। শিশু বয়সে আমার ভোর বেলায় শিশিরভেজা সতেজ হয়ে ওঠা টম্যাটো চারাকে দেখতে যাওয়া হয়তো সেই সাভানার স্মৃতিরই অংশ।

এই সাভানার স্মৃতিটি কী রকম? জীবপ্রেমের কী প্রকাশ আমরা সব মানুষের মধ্যে দেখি? বিশ্বময় পরিচালিত একটি জরিপ গবেষণা থেকে তার একটি প্রমাণ নেয়া যাক। এটি দুনিয়ার সব রকমের পরিবেশে থাকা বিভিন্ন দেশের নানা জনগোষ্ঠি থেকে বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তাঁদের প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করা হয়েছে যে যদি তাঁকে উপহার হিসেবে একটি নতুন বাড়ি দেয়া হয় যেখানে তিনি ছুটির সময় গিয়ে থাকতে চাইবেন বা সম্ভব হলে স্থায়ীভাবেই থাকবেন, তা হলে সেটি কী রকম পরিবেশে হলে তাঁর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে। মানুষটি হয়তো বরাবর মরুভূমিতে তাঁবুতে থেকেছেন, অথবা ধনী নগরীর শততলা ভবনে, অথবা কোন পল্লি অঞ্চলে কৃষি খামারের পরিবেশে, এরকম নানা বিচিত্র বাসস্থানে। কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর যখন এলো তখন অবাক হয়ে দেখা গেলো যে সবার উত্তরের মধ্যে অদ্ভুত মিল। যে পরিবেশের বাড়ি তাঁদের প্রায় সবাই পছন্দ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাতে সমৃদ্ধ বনভূমি খুব দূরে নয়, তবে বাড়ির কাছাকাছি ও সামনে রয়েছে উন্মুক্ত জায়গা, তৃণ, ঝোপ, আর ছোট ছোট বৃক্ষকুঞ্জ– যেমন বাড়ির কাছের ফলের বাগান। বাড়ির সামনে কাছেই থাকবে হ্রদ বা নদী, বা এমনি অন্য কোন বড় জলাশয়, ধীর জল-ধারা। ওতে শান্ত পানিতে মাছ ও অন্যান্য জলজ-প্রাণী খেলা করবে, পানির ওপরে ওপরে ভাসবে বা উড়বে জলরাশিতে দেখা যাওয়া পাখিগুলো, আর ওই মাঝে মাঝে ঝোপের, বৃক্ষের, তৃণের খোলা জায়গা পেরিয়ে দৃষ্টি চলে যাবে সেই জলরাশি ছাড়িয়ে। আরও একটি বড় মিল হলো সবার পছন্দের বাড়ির সামনে খোলা জায়গাতে বিচরণ করবে নানা রকম তৃণভোজীরা– হরিণ, গরু, ঘোড়া তো বটেই তাছাড়া খরগোস, কাঠবিড়ালির মত ছোটরাও। সবার বর্ণনা দেখলে মনে ভেসে আসে অনেকটা ওই বিবর্তন কালের সাভানার দৃশ্য, যা বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে আমাদের জন্য এঁকেছেন, আজকের সাভানার সঙ্গেও যথেষ্ট মিল। সারা দুনিয়ার নানা সংস্কৃতি, নানা পরিস্থিতি, নানা জীবনযাত্রায় ছড়ানো এত রকমের মানুষের

মনে মনে থাকা আদর্শ আবাসের জন্য এই একই রকম স্বপ্ন কেন? উত্তর সেই একই– তাদের মস্তিষ্কে থাকা সাভানার স্মৃতি। আজ তারা যেখানে আছে তাতে এমন পরিবেশে থাকার বিষয় তাদের ভাবারও কথা নয়। তবুও তারা যদি মরুভূমিতে থাকে, মরুদ্যানে গিয়ে যেটুকু তাদের সাভানার স্মৃতির কাছাকাছি পায় তাতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ইট-পাথরে গড়া নগরে যাদের বাস, তারা চেষ্টা করে পার্কে গিয়ে ওই স্মৃতির কাছাকাছি আবহটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও পেতে।

এসবে মনে হয় মানুষ সব সময় জীব জগতের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ চায়, যারা পায় তাদের জীবন যেমনই হোক এদিক থেকে তাদের মনে একটি প্রশান্তি থাকে, যারা পায়না তাদের অধিকাংশ সেটি মেনে নিলেও কেউ কেউ বিদ্রোহ করে, সে রকম সমৃদ্ধ জীব-পরিবেশ খুঁজে নেয়। এভাবে নিয়েছিলেন হেনরি ডেভিড থ্যুরো– যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। তাঁর মধ্যে যে প্রকৃতিপ্রেম ও জীবপ্রেম সেটিকে তিনি পুরোপুরি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ পাকা দুটি বছর প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একাকী বাস করে, একা মানে শুধু তিনি এবং ওরা। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'ওয়াল্ডেন' নামের বইটি লিখে সারা দুনিয়ার মানুষকে তা জানিয়েছেন। বনে ঘেরা ওয়াল্ডেন নামের হ্রদের পাড়ে নিজের হাতে একটি কুটির বানিয়ে সেখানে তিনি কাটিয়েছেন। যত রকম প্রাণী সেখানে ছিল তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁর দিন কেটেছে, তার মধ্যে ছিল বাড়িতে থাকা ইঁদুরের কাণ্ডকারখানা অথবা দুই দল পিপড়ার যুদ্ধ ইত্যাদি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করা; আর ছিল হ্রদের পানিতে আসা বিশাল অতিথি পাখির সঙ্গে লুটোপুটি খাওয়া। যেটুকু মাছ ধরলে আর সামান্য ফসল ও সবজি ফলালে তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতো সেটুকুই করেছেন ওই দু'বছর। তাঁর আনন্দের একমাত্র বিষয় ছিল জীবপ্রেম– যা মনে হয় ওই সাভানার স্মৃতি থেকেই তিনি পেয়েছিলেন, সবাই পেয়েছে।

ওয়াল্ডেনের সঙ্গে আদি মানুষের কালের সাভানার পরিবেশের একটি বড় পার্থক্য হলো ওয়াল্ডেনের থেকে একটু দূরে গেলেই মানুষের হাতে নানাভাবে জীব-পরিবেশ নষ্টের বহু নমুনা সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই পাওয়া যেতো– কাছেই রেল লাইন তৈরি করা হয়েছিলো অনেক বনভূমি নষ্ট করে, তা ছাড়া নানা শহর ও শিল্প বেশি দূরে ছিল না, চাষ বাসের জমিও কাছেই ছিল। এর সবই উদ্ভিদ আর প্রাণীর প্রচুর বৈচিত্রকে ধ্বংস করেই তৈরি করা হয়েছিলো, মূলত বিচিত্র জীবের আবাস ধ্বংস করে। ওই বিবর্তিত অভূতপূর্ব মস্তিষ্ক মানুষকে তার অজান্তেই এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার ক্ষমতাও

দিয়েছিলো, তা তারা নিয়মিত ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু শুরুতে আদি মানুষের সাভানায় এই ব্যাপারটি ছিল না। সাভানায় উদ্ভিদ, প্রাণী সবই সেখানকার পরস্পর ভারসাম্য ছিল, যেমন অন্যত্রও সব জীবের অস্থিত্বও সেখানকার সীমাবদ্ধ সব জীবের ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া ওই ভারসাম্য কখনো নষ্ট হয়নি। কোটি কোটি বছর ব্যবধানে এক এক সময় প্রাকৃতিক কারণে তা নষ্ট হয়েছে, তখন দুনিয়ার জীববৈচিত্রের বড় অংশই চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওয়াল্ডেনে যে রকম দেখলাম এখনো জীববৈচিত্র যেভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে তা মানুষের কারণে হচ্ছে, আরও অল্প সময়ের মধ্যে আরও পাকাপাকিভাবে। থ্যুরোর মত দার্শনিক সেটি মন থেকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান সেটি নিশ্চিত প্রমাণ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এখন জীবপ্রেমিক না জীবশত্রু মানুষের এই দুই দিকটির মধ্যে কোন্‌টি প্রাধান্য পাচ্ছে।

জীবপ্রেমের যে বংশগত তাগিদ টম্যাটো চারাকে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে বা বয়স্ক মানুষকে সাভানার মত জায়গায় বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখায়; অথবা নিজের দর্শনে তাকে আরও রোমান্টিক করে তুলে নিজের আরামের আবাস ছেড়ে প্রকৃতিতে বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে– তথাকথিত উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি আজ তাকে পরাজিত করতে যাচ্ছে। জীবশত্রু হিসেবে কাজটি কখনো আমরা সরাসরি করছি, প্রধানত জীবের আবাস কেড়ে নিয়ে; আবার কখনো করছি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে দিয়ে, যার ফলে জীব প্রাকৃতিকভাবেই আবাস থেকে বিতাড়িত হচ্ছে।

নতুন স্বাভাবিকঃ

কোভিড-১৯ বিশ্বমারি আমাদেরকে একটি শব্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে 'নিও-নরমাল' বা নতুন স্বাভাবিক। আমরা এসময় স্বাস্থ্য সুরক্ষার খাতিরে এমন কিছু আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যা মনে হয় সামনে সব সময় বজায় থাকবে। অস্বাভাবিক কারণে চালু হলেও এগুলোই তখন স্বাভাবিকে পরিণত হবে– নতুন স্বাভাবিক। এর মধ্যে হয়তো থাকবে যথাসম্ভব বাসা থেকে কাজ করা, অনলাইনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সভা সমিতি করা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইত্যাদি বিমান ভ্রমণে সশরীরে না করে যথাসম্ভব ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে করা, ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা দৈহিক দূরত্ব রাখা, ইত্যাদি। বিশ্বমারির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও স্বাস্থ্যগত, পারিবেশিক ও অন্যান্য কারণে এগুলোর নানা উপকারিতা থাকবে বলেই এগুলো স্বাভাবিক

আচরণে পরিণত হবে, এটিই হলো ধারণা। লক্ষ্য করেছি এখানে অসংখ্য মানুষ এসব আচরণের খুব একটি তোয়াক্কা করেননি, কারণ আমাদের দেশে এসব বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়িত করার খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল না। অনেকে যাঁরা এগুলো পালন করেছেন তাঁদের কাছ থেকে প্রায়ই হা হুতোশ শুনেছি যে ওটি করতে গিয়ে তাঁদের অস্থির হাসফাঁস সময় কাটছে। আমার নিজের কিন্তু সে রকম মনে হয়নি মোটেই। বরং মনে হয়েছে এর ফলে অনাবশ্যকভাবে শহরের রাস্তায় সময় ব্যয় না করতে হওয়াতে সময়টি নিজের কাজ ও লেখাপড়ায় কাটাতে পেরেছি। অনলাইনে প্রায় সবই অনেক কম শ্রম ও আয়োজনে করতে পেরেছি, মিডিয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার খবর রাখার সুযোগ আরও বেশি পেয়েছি। সশরীরে না হলেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলাও কমেনি। আমার বরাবরই মনে হয়েছে ওই নতুন স্বাভাবিক সবার জন্য উপকারী ও প্রিয় হয়ে উঠবে বলেই এটি স্বাভাবিক হবে।

পাশাপাশি এই কোভিডের মধ্যেই এমন কিছু নতুন পরিস্থিতি দেশে ও বিদেশে লক্ষ্য করেছি যেগুলোও নতুন স্বাভাবিক হলে শুধু দুনিয়ার সব মানুষ নয় বরং পুরো জীববৈচিত্র, এবং পৃথিবী নিজে খুবই উপকৃত হবে। সাধারণত মানুষের আগমনে মুখরিত থাকা পৃথিবীব্যাপী কতগুলো গন্তব্য ব্যাপক লকডাউনে অনেক দিনই বন্ধ ছিল– তার মধ্যে দেশে দেশে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলো তো বটেই, স্থানীয় মানুষরাই ভ্রমণে যায় এমন অনেক পার্ক, বিস্তৃত জাতীয় পার্ক; বন-পাহাড়, ঝরণা, জলরাশি প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ জায়গা; অতিথি পাখি সমাবেশের দিঘী, হ্রদ, হাওড় ইত্যাদি; নানা প্রাণীর অভয়াশ্রম, এমনকি চিড়িয়াখানাও রয়েছে। আমাদের দেশের কিছু পর্যটন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। লকডাউন জিনিসটা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাজ ব্যাহত করে প্রায় সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং নিরানন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু ওই বন্ধ থাকা প্রকৃতি ও জীব-সমৃদ্ধ জায়গাগুলোর জন্য এটি শাপে বর হয়েছে। এরকম অনেকগুলো জায়গা থেকে সাংবাদিকদের পাঠানো প্রতিবেদন টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি, অনেকগুলোর বিবরণ পড়েছি তাতে মাত্র বছর খানেকের মানুষের পদচারণা থেকে দূরে থাকার কারণে এখানকার জীববৈচিত্রের সমারোহ স্পষ্টভাবে বেড়ে গিয়েছে। যেই ঘাস, ঝোপ, গাছ ওই চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো সেখানে সবুজের গরিমা অনেক বেড়েছে; এমনকি তার ভেতরের পতঙ্গ, পোকামাকড় ওই সবও। যেই পাখিগুলোর আওয়াজ পাওয়া যেতো না, তাদের কিচিরমিচিরে ও জায়গা পরিপূর্ণ হয়েছে, গাছে গাছে কাঠবিড়ালি থেকে শুরু করে অন্য সব গাছ-বাওয়া প্রাণীর ছুটাছুটি অনেক বেড়েছে।

আর যে সব পশু কালেভদ্রে দেখা দিতো, পর্যটকরা গভীর আগ্রহে তাদের জন্য অপেক্ষা করতো, তারা এখন নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে– অবাধে ঘুরে বেড়াবার জায়গার অভাবে তাদের যে ম্রিয়মান অবস্থা তারও অবসান হয়েছে। জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ দেশের ভেতরের জলরাশিগুলোর অবস্থাও অনেক ভালো হয়েছে– বড় দিঘী, হ্রদ, হাওড় যেখানে জলচর পাখিদের মেলা বসে বা অতিথি পাখিরা হাজারে হাজারে এসে নামে। সাধারণ সময়ে পর্যটকদের ভিড়ে, আবার শিকারিদের আক্রমণে এসব পাখির ঝাঁক ব্যতিব্যস্ত থাকে– কিন্তু এখন আর নয়। মাত্র বছর খানেক পর্যটকশূন্য থাকার কারণে যদি জীববৈচিত্রে পূর্ণ প্রকৃতি এতটা বদলে যেতে পারে তাহলে এটিই যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে অবস্থার কতই না পরিবর্তন হতে পারতো। আর আজ শুধু পর্যটকদের আনন্দ দেবার জন্য যেটুকু এলাকা, যতখানি প্রকৃতিতে জীব-বসবাসের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেটি যদি আরও অনেকখানি বাড়ানো যেতো, তাতে শুধু সঠিক অংশে সীমিতভাবে আগ্রহী মানুষকে যেতে দেয়া হতো তা হলে জীববৈচিত্র ধ্বংসের প্রক্রিয়াটিকেই হয়তো থামিয়ে দেয়া যেতো। ওই নতুন স্বাভাবিক তারই আভাস দিচ্ছে।

কোভিডের ওই নতুন স্বাভাবিকের সময় পর্যটক গন্তব্যের মধ্যে যতগুলো জায়গার কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে শুধু একটি জায়গায় হয়তো প্রাণীদের জীবনে তেমন কোন সুবিধা আসেনি– সেটি চিড়িয়াখানায়। ওখানে এমনিতেও প্রাণীগুলো খাঁচায় বা খুব অল্প জায়গায় ঘেরাওয়ের মধ্যে থাকে, লকডাউনে পর্যটকশূন্য অবস্থাতেও তাই। নতুন স্বাভাবিককে যদি আমরা জীববৈচিত্রের স্বার্থে এবং পৃথিবীর স্বার্থে স্থায়ী স্বাভাবিকে পরিণত করতে চাই তাহলে চিড়িয়াখানা ব্যাপারটিই বাদ দিতে হবে। ওই প্রাণীগুলোকে অবশ্যই আগ্রহী দর্শক মাঝে মাঝে দেখবে– বিশেষ করে শিশুরা, ছাত্ররা, এবং উৎসাহী মানুষরা– কিন্তু সেটি রীতিমত একটি ভ্রমণ অভিযাত্রা করে বিশাল জাতীয় পার্ক বা অভয়ারণ্যের বিশেষ বিশেষ অনুমতি দেয়া জায়গাগুলোতে গিয়ে। ওই অনুমতি দেয়া জায়গা থাকবে শুধু ওসবের কিনারার দিকে– তাও হৈচৈ করা বনভোজনের জায়গা হিসেবে নয়, কৌতুহলী পর্যবেক্ষণে আনন্দ আর শিক্ষা লাভের জায়গা হিসেবে; সেখানেও প্রাণীদের চলাচলই অগ্রগণ্যতা পাবে, মানুষের চলাচল নয়। এই কিনারার অংশের ভেতরে যে বিশাল অভ্যন্তর ভাগ সেটি একেবারেই জীববৈচিত্রকে ছেড়ে দেয়া হবে। কখনো কখনো অল্প কয়েকজন গবেষক সন্তর্পণে কাজ করবেন, এছাড়া মানুষের কোন পদার্পণ সেখানে থাকবে না। এই

অভ্যন্তরটি ন্যূনতম এতখানি বড় হতে হবে যাতে ওখানকার সব থেকে বেশি জায়গা জুড়ে ঘুরে বোড়ানো প্রাণীটিকেও সেই জায়গাটুকু দেয়া যায়, আর তাতেই যেন ওই প্রাণীর একটি বড় বৈচিত্র ও সংখ্যাকে পোষণ করার মত খাদ্য ও পানীয় সমৃদ্ধ পরিবেশ ওখানে থাকে– তাদের নানা জীবের মধ্যে ভারসাম্য থাকার অবস্থায়। যথেষ্ট বড় জায়গা জুড়ে হলে এবং তাতে মানুষের উপদ্রব ও হস্তক্ষেপ না থাকলে প্রকৃতিই সেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

আমাদের দেশের জন্য এমন দৃশ্য প্রায় চিন্তার বাইরে। কিন্তু জীববৈচিত্রকে রক্ষার এই একটাই উপায় আছে– সবাইকে বাঁচার সুযোগ দেবার জন্য তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দেয়া। সাভানার স্মৃতি যখন আমাদের মস্তিষ্কে এসে ঢুকছিলো তখন সবারই অবাধ জায়গা ছিল ওই সাভানায়, মানুষেরও ছিল যতখানি জায়গাতে ঘোরাফেরা তার বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং তা অন্য সব প্রাণীর মধ্যেই। কিন্তু পরে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং তার খাই বেড়েছে– নিজেদের ব্যতিক্রমী মস্তিষ্কের জোরে সে অন্য সবাইকে শিকার করে এবং বসবাসের জায়গা থেকে বঞ্চিত করে কালে কালে তাদের অনেকগুলোর বিলুপ্তির ব্যবস্থা করেছে, এখন প্রায় গণহারে তাই করছে। ওই নতুন স্বাভাবিক সেই প্রক্রিয়ায় অন্তত কিছুটা রাশ টানতে পারে।

পর্যটক যে জীববৈচিত্রের আকর্ষণে অভয়ারণ্যে ছুটে যয় তা সাভানার স্মৃতির তাড়নায়, আবেগ বশত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কিন্তু তার অন্য উৎসাহও থাকে সেটি বৈজ্ঞানিক কৌতুহল, জানার ইচ্ছায়। আবেগের আকর্ষণের সঙ্গে বিজ্ঞানের আকর্ষণের মেলানোর অভিজ্ঞতা বেশ ছোটবেলাতেই হয়েছিলো যার পর থেকে ওই মিশ্রণ সব সময় কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছি বলে মনে হয়। তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। কাপ্তাইতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ তখন চল্‌ছে। আব্বার সখ হলো আমাকে ও আমার বোনকে নিয়ে সেটি দেখতে যাবেন। ওখানে আমাদের এক আত্মীয় ঠিকাদার ছোটখাট কাজ করছিলেন, তাঁর মেহমান হিসেবে। তখন কাপ্তাই রোড হয়নি, যাচ্ছিলাম একটি লঞ্চে করে কর্ণফুলীর উজানে। বিকেল নাগাদ কাপ্তাই থেকে বেশ দূরে থাকতেই নদী একেবারেই সরু হয়ে গিয়েছিলো– দুপাশে পাহাড়ি বন, জনমানব শূন্য। দুপাশের ঘন ঝাঁকড়া গাছের চাঁদোয়া যেন নদীর ওপর দিয়ে গিয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করেছিলো। ওই চাঁদোয়ার ভেতরে বানরের দৌড়াদৌড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম আর বহু রকমের পাখি। দৃশ্যটাকে এমন অভাবনীয়, এমন স্বর্গীয়, মনে হচ্ছিলো যেন একটি রূপকথার দেশে পৌঁছে গেছি–

পাহাড়ি বনে আলো আঁধারের মধ্যে হরিণ, শেয়াল বা এমনি কিছু কিছু ছুটাছুটি করে যেন লুকোচুরি খেলছিলো। এমনই অবাক বিস্ময়ে দেখেছি আজ এত বছর পরেও মনে গেঁথে আছে। কাপ্তাইতে পরদিন আমাদেরকে বাঁধের ওপরে নিয়ে গিয়ে পুরো প্রকল্পে কী কী হবে তা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন ঠিকাদার সাহেবের একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার।

কর্ণফুলীর স্রোতকে আটকাবার মত করে ওই মাটির বাঁধের নির্মাণ এখন প্রায় শেষ। ওটি সম্পূর্ণ হলে পানি আটকিয়ে ওখানে উঁচু করে তা জমা হবে। ওই পানিকে যখন সরু একটি পথে অন্য পাশের নিচু পানির দিকে ছাড়া হবে তখন তার শক্তিতে, পানির ঠেলায়, টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে– অনেক শক্তি, প্রদেশে বিদ্যুতের একটি ভালো অংশ এখান থেকে পাওয়া যাবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে বললেন ওই যে বাতাসের ধাক্কায় ফুরফুরি যেমন ঘোরে পানির ধাক্কাতে ঠিক তেমনি টারবাইন ঘোরে। তেল, কয়লা কিছু লাগবে না, কোন জ্বালানিই না, একেবারে প্রাকৃতিকভাবে নদীর পানির শক্তিতে বিদ্যুৎ, কী মজা! যতদিন নদী আছে ততদিন ফুরাবে না। আগের সন্ধ্যায় জীববৈচিত্রের যে প্রকৃতিকে দেখেছি, আর আজ দুপুরে যেই প্রকৃতির কথা শুনছি– আমার কাছে ফুরফুরির কথাটিই বেশি মনে হচ্ছিলো– দুটাই একাকার হয়ে গিয়েছিলো। একাকার হয়েই আজ অবধি মনে আছে। তখন ঘূণাক্ষরেও ভাবিনি একদিন আমি এই জলবিদ্যুতের মত নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে কাজ করবো, আর একই সঙ্গে জানতে পারবো কেন এর মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষা পাবে, পৃথিবী রক্ষা পাবে, ওই জীববৈচিত্রও রক্ষা পাবে। যখন যেই বড় বেলায় এসব করছি, জানছি, তখনো কিন্তু সপ্তম শ্রেণির আমার অভিভূত মাথায় ওই ভালো লাগার ঘোরটি যেন কাজ করতে থাকে– এই ভালো লাগা শুধু প্রকৃতির মধ্যেই থাকার ভালো লাগা।

তবে এতো সহজে পৃথিবী রক্ষা পাবে না, জীববৈচিত্র রক্ষা পাবে না, তার জন্য সব দেশ মিলে জাতিসংঘে সমঝোতা করতে হয়েছে– ওই নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়েই সব কিছু করতে হবে, তেল কয়লা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, অর্থাৎ প্রকৃতিতেই ফেরৎ যেতে হবে। অন্যরকম করলে আমাদের জলবায়ুর সব কিছু ওলট পালট হয়ে অস্থিত্ব বিপন্ন হবে। ইতোমধ্যেই বিপন্ন হবার পালা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা দেশে দেশে তার জন্য বিশেষ কিছুই এখনো করিনি, শুধু শিগগির করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মাত্র। সে কথায় একুটু পরে আসছি। আরও একটি সমঝোতা করেছি যে সব জীববৈচিত্রকে বাঁচাতে হবে। সাভানার স্মৃতি আমাদেরকে সেটি করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তা ছাড়া সে জীববৈচিত্রের আমরাও অংশ, আমাদের ভাগ্যও

তার সঙ্গেই বাঁধা। আমরাই তাদেরকে বিপন্ন করেছি, তাদের বিলুপ্ত হবার ব্যবস্থা করেছি, প্রকারান্তে ডেকে আনছি নিজেদের বিলুপ্তিও। তাই তাদের অভিভাবকত্ব আমাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সিদ্ধান্ত হলো সবার আগে অন্য সব জীবের জন্য প্রচুর জায়গা ছেড়ে দিতে হবে– সব দেশকেই এটি করতে হবে, প্রত্যেক দেশকে। শতকরা ৩০ ভাগ জায়গা অন্য প্রাণীদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, তা স্থলেও এবং সমুদ্রেও।

নানাদেশ নানা ভাবে এটি করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশ মিলে তাদের নিরবিচ্ছিন্ন বনভূমিকে সংরক্ষণ করছে তাদের প্রাণীদের জন্য, যাতে সব রকমের প্রাণী প্রয়োজনে শুধু তাদের সংরক্ষিত জায়গার মধ্য দিয়েই দেশ থেকে দেশে বহুদূর চলে যেতে পারে, একই প্রজাতির অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মালয়েশিয়া একসময় পাম গাছের বাণিজ্যিক বাগান তৈরি করতে গিয়ে তাদের দেশের অমূল্য জীববৈচিত্রে পূর্ণ বাদল-বন (রেইন ফরেস্ট) নষ্ট করেছিলো, সেই সঙ্গে ওখানে যার একমাত্র আবাস সেই মানুষের খুব কাছের প্রজাতি ওরাং ওটাংকে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করার উপক্রম করেছিলো (শব্দটার অর্থই হলো বনের মানুষ)। এখন মালয়েশিয়া তার বেশ কিছু বন ওরাং ওটাংকে ছেড়ে দিচ্ছে, আবার বনায়ন করছে। শুধু তাই নয় বিরূপ পরিস্থিতে যে অসংখ্য ওরাং ওটাং শিশু মাতৃহীন হয়েছে তাদের লালন পালনের জন্য অনেক মানুষ স্ত্রী ও পুরুষ নিয়োগ করেছে 'ওরাং ওটাঙের মা' হিসেবে। বড় হয়ে বাচ্চাগুলো আবার ওদের বনে ফেরত যাবে, অবশ্য তার আগে 'মা'দের থেকে বনে থাকার 'ট্রেনিং' নিয়ে। ঘন বসতিপূর্ণ দেশে অন্যান্য প্রাণীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া কঠিন কাজ– কিন্তু এজন্য প্রত্যেক দেশকে নিজস্ব অর্থনৈতিক কৌশল খাটাতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়া নামের ঘনবসতির ছোট দেশটি তাদের কয়েকটি ব্যতিক্রমী প্রাণীকে দুনিয়ার আকর্ষণে পরিণত করেছে, যেমন 'হাউলার মাঙ্কি' নামের অদ্ভুত বানরকে। ওরা গ্রামের কৃষিজমির কাছেই কৌশলে বন সৃষ্টি করে তাতে হাউলার মাঙ্কির প্রচুর আনাগোনা ঘটিয়েছে, যা পর্যটকরা এসে গ্রামে গ্রামে কিছুদিন থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এমনি পর্যটন এখন তাদের অর্থনীতির একটি বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অনেকের চেষ্টা সত্ত্বেও সবাই কিন্তু যথেষ্ট সাড়া দেয়নি প্রাণীদেরকে জায়গা ছেড়ে দেবার ক্ষেত্রে; যেমন আমাদের দেশ পিছিয়ে থাকার মধ্যেও অনেক পিছিয়ে আছে এই ক্ষেত্রে। যা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ওসব নামে মাত্র। শতকরা ৩০ ভাগ জায়গা ছাড়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সারা

দুনিয়ায় সার্বিকভাবে স্থল ভাগে তাতে ১৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে, ওই উৎসাহী দেশগুলোর উদ্যোগেই প্রধানত। কিন্তু সমুদ্রে তা শতকরা ৩ ভাগও অর্জিত হয়নি। সমুদ্রের ব্যাপারটি একটু ভিন্ন, এর অধিকাংশ যাকে বলা যায় খোলা সমুদ্র– সেখানে জীববৈচিত্র খুব বেশি নেই, জীবের কোন সমারোহই নেই। এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে সমুদ্রের খাঁড়িগুলো, সমুদ্র-তীরের কাছে অগভীর সমুদ্র, প্রবাল দ্বীপ– এগুলোই সব জলজ জীববৈচিত্রের খনি। নানা কারণে এগুলোই মাৎস্য সম্পদের জন্য উর্বর জায়গা– তাই বাণিজ্যিকভাবে যারা মাছ ও অন্যান্য লাভজনক জলজ প্রাণী বিপুলভাবে ছেঁকে আনে এখানে তাদের হাতে সে সব লাভজনক প্রজাতি তো বটেই, ওই প্রক্রিয়াতেই বাদবাকি সব জীববৈচিত্রও বেঘোরে মারা পড়ে।

ওখানকার জীববৈচিত্র বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো আংশিকভাবে হলেও এই জলভাগের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, ওই জলভাগ তাদেরকে ছেড়ে দেয়া, তাদের পরিবেশে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য। কিন্তু ওখানকার লাভজনক মাৎস্য ক্ষেত্রগুলোর ওপর কাছের দেশের এবং দূরের বহু দেশের নজর এত বেশি যে সেটি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শতাব্দীর শুরুতে যেখানে স্থলের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ জায়গাও জীববৈচিত্রের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়নি, এখন তা ১৫ ভাগ। জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হাঁটি হাঁটি পা পা করে উন্নতি হচ্ছে, তারাও তাদের বসবাসের ক্ষেত্র কিছু কিছু ফিরে পাচ্ছে। যেই মনোভঙ্গি নিয়ে নানা দেশের মানুষ তাদের জমি ছেড়েছে, আরও ছাড়বে, একই মনোভঙ্গি নিয়ে তাদের জলও ছাড়বে; সেই মনোভঙ্গিটি আসছে জীবপ্রেম থেকে, মানুষ হিসেবে পৃথিবীর জীববৈচিত্রের অভিবাবকত্ব গ্রহণ থেকে।

কোভিডের সময় নতুন স্বাভাবিক তার যেটুকু মুখ দেখিয়েছে সেটি হিমশৈলের ওপরের সামান্য অংশের মত মাত্র, যা দেখা যায়। আশা করবো সারা বিশ্বের সমঝোতায় আরও নতুন নতুন আচরণ শিগগির আমাদের জন্য স্বাভাবিক হয়ে পড়বে– আমাদের সবার জন্য। যেমন আমরা নানা প্রাণী দেখতে চিড়িয়াখানায় যাবোনা– যখন আমাদের জন্যও সুযোগ আসবে তখন পার্কের ও অভয়ারণ্যের বিশেষ জায়গাগুলোতে গিয়ে তাদেরকে দেখবো, ছেলেমেয়েদেরকে সেখানে নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীদের সান্নিধ্য পেতে দেবো। নিজেদের বাসস্থানের পরিকল্পনা আমরা একটু চাপাচাপি করে করবো– একার জন্য উঠানসহ বড় বড় বাড়ি ছাড়াই আমাদের বড় লোকদের চলবে, কারণ জমি আমরা অন্য প্রাণীদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। আমাদের কৃষি জমিতে মাইলের পর মাইল একই ফসল হবেনা– বাগানের

ফসল, খেতের ফসল, বনের ফসল সবই মেশামেশি করে পেতেই অভ্যস্ত হবো– তাদের মাঝে ঝোপ-সারিতেও নানা উপযুক্ত প্রাণীর সমারোহ থাকবে।

আমাদের কাছের খোলা সমুদ্রে প্রচুর সৌর প্যানেল ভাসমান অবস্থায় থাকবে, সমুদ্রে এবং স্থলে প্রচুর বায়ুকল ঘুরবে– দেখে মন ভরবে কারণ ওখান থেকেই প্রাকৃতিকভাবে কখনো না ফুরানো ভাবে আসবে আমাদের সব বিদ্যুত; তেল-কয়লার কারবার নেই বল্‌লেই চলে। আমাদের গাড়িগুলোতে কখন তেল ভরতাম সে গল্প আমরা প্রায় ভুলেই যাবো, কারণ এখন প্রতিদিন বিদ্যুতই তাতে ভরি, তার ব্যটারিতে, যা সৌর বিদ্যুৎ। আমাদের খাবারের প্রোটিন মাছ-মাংস থেকে কমই আসবে, আমাদের শর্করাও শস্য থেকে খুব বেশি নয়। কারণ তাতে যে রকম হারে একই রকম ফসলের চাষ করতে হয়, একই গরু, ভেড়া, ছাগল এবং অন্যান্য চাষের প্রাণী– তাতে জীববৈচিত্র থাকে না। আরও বড় কথা এতে প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে যায়; গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন করে বলে তা এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। ওই মাছ মাংস শর্করার মত স্বাদের পুষ্টির খাবারই খাবো, তবে প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে নয়, তাদের কোষ-কলাকে চাষ করে পাওয়া যাবে। যতদিন তা সম্ভব হবে না, এবং দুধের জন্য যে গরুগুলোর পালন করতেই হবে তাদেরকে খাওয়াবার পশুখাদ্য বদলে যাবে– যেমন সামুদ্রিক শৈবালের মত এমন উপাদান তাতে যোগ করা হবে যে ওই পশু থেকে মিথেন উদগীরণ একেবারেই কমে যাবে। এগুলো সব নতুন স্বাভাবিক, এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি; তবে কথাবার্তা যা শোনা যাচ্ছে তা হতে খুব দেরিও নেই। কিছু কিছু আগামী দশকেই হবে, বাকি হয়তো আরও দু-চার দশকে। এখন হয়তো অদ্ভুত মনে হচ্ছে, কিন্তু শিগগির আর হবে না। কোভিড থেকে বাঁচতে যে ভাবে নতুন স্বাভাবিকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, পৃথিবীকে বাঁচাতেও তেমনি হতে হবে।

এক পৃথিবী, এক প্রাণ

দেড় ডিগ্রির লক্ষ্য:

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ধরিত্রী সম্মেলনে থাকার সুবাদে আমি গোড়া থেকেই ব্যাপারগুলো খুব আগ্রহে নিয়ে লক্ষ্য করে আসছি– পৃথিবী ধ্বংসের ওই বিপদ-ঘণ্টা বাজানোর ব্যাপার, আর সেই ঘণ্টা শুনতে না চাওয়ার ব্যাপার। শুনতে চাই না, মানি না, এমন করে বলার মানুষ অবশ্য এখন কমে গেছে, তবে কার্যত কিছু না করার লোক প্রচুর

আছে। তারপরও ২০১৫ তে প্যারিস সম্মেলনে সব দেশ মিলে একটি লক্ষ্য দিয়েছে যে শতাব্দীর শেষে গিয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ যেন শিল্প বিপ্লবের আগে থাকা উত্তাপ থেকে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে ধরে রাখা যায়। এটি একটি খুবই আশাবাদী পদক্ষেপ ছিল– সবাই মিলে ওরকম একটি লক্ষ্য দিতে পারা, এবং সবাই স্বীকার করে নেয়া যে উত্তাপকে এর বেশি বাড়তে দেয়া মানে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে কার্যত আর আটকাতে না পারা। সেই থেকে এই দেড় ডিগ্রির লক্ষ্যটিই এ সম্পর্কে যাবতীয় চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু।

এই চিন্তায় কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাসের উদ্গীরণের কথা আছে মেরু অঞ্চলে বরফ গলার কথা আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কথা আছে– পৃথিবীর এসব দিকের ভাবনাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, বিতর্কের ঝড় তুলছে। কিন্তু সে ভাবে জীববৈচিত্রের কথাটি কম ভাবা হচ্ছে। অথচ পৃথিবী ও প্রাণ এই দুটির কথা আলাদা করা অসম্ভব। ওই দুইই প্রায় সমবয়সী– পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশত বিলিয়ন বছর আর প্রাণের চারশত বিলিয়ন, শুরু থেকেই একে অপরের ওপর নির্ভর করেছে। আদি প্রাণ একই প্রাণ যা নানা বৈচিত্রের সমারোহে বিবর্তিত হয়ে পুরো পৃথিবী দখল করেছে। সেই আদি থেকে পৃথিবী যে রকম প্রাণকে বদলিয়েছে, প্রাণ তেমনি পৃথিবীকে বদলিয়েছে। যেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আমরা এখন মরিয়া সেটি পৃথিবীর আদি থেকে বার বার ঘটেছে– আগের সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে ঘটেছে বলে কারো কিছু করার ছিল না, তাতে বহু প্রাণের বিলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সব প্রাণ বিলুপ্ত হয়নি বা পৃথিবী সব প্রাণের অনুপযুক্ত থাকেনি, তাই আমরা আসতে পেরেছি। শুরুতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বেশি ছিল না, ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য কিছু গ্যাস যা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবী-পৃষ্ঠকে গরম রেখেছিলো, নইলে মঙ্গল গ্রহের মতই পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে প্রাণের অনুপযুক্ত হতো, মঙ্গলের মত মরে যেতো। সেই গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া পৃথিবীকে প্রাণের উপযুক্ত রেখেছিলো। কিন্তু ভয় ছিল তাতে আবার পৃথিবী-পৃষ্ঠ না অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা হতে পারেনি।

প্রথম যুগের যে ক্ষুদ্র জীব সেগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন ছাড়তো, ওভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বেড়েছে, পরবর্তী জীবরা অক্সিজেন নিয়ে বাঁচার মত ছিলো; আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড এভাবে কমে যাওয়াতে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবী-পৃষ্ঠ এমন উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারেনি যে তা বুধ গ্রহের মতো উত্তাপের কারণে প্রাণের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে

যখন বনভূমি সৃষ্টি হলো তাও ভূমিকা রেখেছে কার্ব ডাই-অক্সাইড শোষণ করে তাকে বাতাসে যাওয়া থেকে কিছুটা বিরত রেখেছে। এসিড বৃষ্টি আবার কিছুটা কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কার্বোনেট শিলা হিসেবে তাকে ভূমিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। ওগুলোই ছিল আমাদের সৌভাগ্য– পৃথিবী ও প্রাণের নানা ক্রিয়া বিক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন হলেও আমাদের জন্য অনুপযুক্তভাবে হয়নি। আজো প্রাকৃতিক দিকটি সেভাবেই আছে। কিন্তু এর মধ্যে শক্তিশালী একটি নতুন কাজের কাজী যুক্ত হয়েছে তা হলো অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীব মানুষ যার কার্যকলাপে মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবী মানুষ বাসের অনুপযুক্ত হতে চলেছে এবং সেই সঙ্গে জীববৈচিত্রের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে, ওই আগের গণহারে জীব বিলুপ্তির মত। এবার প্রকৃতিকে দোষ দেবার উপায় নেই, কারণ দায়ী শুধু মানুষ। কাজেই মানুষকেই অভিভাবকত্ব নিতে হচ্ছে সব জীবের ও পৃথিবীর রক্ষায়। দেড় ডিগ্রি লক্ষ্য মাত্রা সেই অভিভাবকত্বের বাতিঘর।

একই মুহূর্তে দুনিয়ার সব জায়গার ওপর উত্তাপের গড় যদি নেয়া হয়, আর বছরে এরকম যত মুহূর্ত আছে তার সবার এই গড়ের যদি আরও গড় নেয়া হয় তা হলে যে উত্তাপটি পাই সেটি নিয়েই কথা হচ্ছে। দেখা গেছে গত হাজার বছরে তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই গড় উত্তাপ বলতে গেলে একই ছিল, কিন্তু তারপর প্রথমে ধীরে ধীরে এবং আমাদের কালের যত কাছে এসেছে তত হু হু করে এটি বেড়েছে এবং অতি দ্রুত বেড়ে ওই সমান থাকা পরিমাণ থেকে এখন পর্যন্ত এক ডিগ্রির মত বেড়েছে। শুনতে খুবই সামান্য মনে হলেও এই এক ডিগ্রি ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বাড়ার কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের এতগুলো আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি– যা গত কয়েক দশকে একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এমনকি ১৯৯২ সালে যখন প্রথম পৃথিবীজোড়া এ নিয়ে আন্দোলন জোরালো হচ্ছে তখন বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ঘেঁটে আমাদেরকে বুঝতে হয়েছে কী ঘটছে।

আজ আর সেই উপাত্ত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। যে সব জায়গায় মানুষ কোনদিন আশে পাশে কোথাও দাবানল দেখেনি আজ শুকনা মৌসুমে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়া দাবানল শুধু তাদের বন নয়, তাদের গ্রাম-শহর ঘরবাড়িও পুড়ে যেতে দেখছে নিত্য বছর। খুবই শীতপ্রধান হিসেবে পরিচিত দেশে (যেমন কানাডা) এখন গ্রীষ্মের উত্তাপ উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশের সব থেকে গরম দিনগুলোর মতই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে– প্রতি বছর প্রচুর মানুষ

শুধু গরমেই সেখানে মারা যাচ্ছে। এমন অনেক দেশের ব্যাপক বন্যার দৃশ্য এখন আমাদেরকে টেলিভিশনে দেখতে হচ্ছে যা কখনো কেউ কল্পনা করেনি– যেমন জার্মানিতে। বহু দিন ধরে যা আশঙ্কা হচ্ছিল যে রকম দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর অনেক নিচু দ্বীপের কিনারা পানিতে চলে যেতে শুরু করেছে; ঘূর্ণিঝড়, সুনামির সংখ্যা ও তীব্রতা যে বেড়েছে শুধু তাই নয়, এখন ওগুলো এমন জায়গায় হানা দিচ্ছে যেখান পর্যন্ত আগে কখনো এর ছোবল পৌঁছতে পারে মনে করা হয়নি। চিরচেনা গ্রিনল্যাণ্ডে গিয়ে এখন দেখা যায় অন্য দৃশ্য– বরফ গলে গিয়ে উন্মুক্ত ভূমির দেশ। আন্টার্কটিকায়ও বিশাল সব বরফ চাঁইয়ের গলে ভেঙ্গে গড়ার দৃশ্য এখন সবার পরিচিত। এখন দেখা যাচ্ছে আন্টার্কটিকার জগদ্দল বরফের এক একটি বড় অংশের তলায় বরফ এমন গতিতে গলে যাচ্ছে যে যেকোন মুহূর্তে মহাদেশটির একটি অংশই যেন সমুদ্রের পানিতে গিয়ে একাই সমুদ্র পৃষ্ঠকে অনেক উঁচু করতে পারবে।

প্রত্যেকটি অবাক কাণ্ড ঘটছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে কেমন করে জলবায়ু পরিবর্তন এটি ঘটিয়েছে; আর ঘটনার তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর এই সব শুধু এক ডিগ্রি উত্তাপ বাড়া অবস্থায়। সব বৈজ্ঞানিক হিসেব দেখাচ্ছে এটি যখন দেড় ডিগ্রিতে যখন পৌঁছাবে তখন এই সব ঘটনাই সহ্যের শেষ সীমায় চলে যাবে প্রায়, এমন অবস্থায় যে আমাদের প্রযুক্তির সকল শক্তি ও সদিচ্ছার সবটুকু প্রয়োগ করে হয়তো কোন রকমে শেষ রক্ষা হবে। কিন্তু সেটি যদি দেড় ছাড়িয়ে দুই ডিগ্রির দিকে এগোয় তা হলে সেই শেষ রক্ষা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হবারই আশঙ্কা। জলবায়ু পরিবর্তনের সব ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায়, কিন্তু এখানে আমাদের দেশের সব থেকে বড় ভাবনা সমুদ্র পৃষ্ঠতল উঁচু হবার কথাই যদি বলি কী হতে পারে? সব হিসেব বলে এটি এক মিটারেরও বেশি বাড়বে যার মানে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ আর না থাকা– অর্থাৎ আমাদের জন্য তো বটেই, ততদিনে এর উপচে পড়া প্রতিক্রিয়াগুলোর কারণে ঘটবে বিশ্বের জন্য চরম বিপর্যয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে চলছি, যেদিকে চলছি তাতে দুই নয় তিন, চার ডিগ্রিও ছাড়িয়ে যেতে পারে এ শতাব্দীর শেষে গিয়ে, যখন আমরা দেড় ডিগ্রিতে রাখা এতই জরুরি বলে অনুভব করছি।

বড় বিপদ জীববৈচিত্র বিলুপ্তির দিক থেকেও আসতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদ ইতোমধ্যেই ঢালাওভাবে উদ্বাস্তু হচ্ছে, উত্তাপ বাড়ার ফলে ঢালাওভাবে বিলুপ্তও হচ্ছে, নতুন পরিবেশে গিয়ে পুরো জীব জগত ক্রমে দারুণ চাপের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমাদের কারণে ঘটতে থাকা জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা জীব জগতেরও যে একটি বড় ভূমিকা

আছে যেটিও প্রায়শ আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আমরা ধরে নিই যে চিরন্তন যে বনভূমি নানা রূপে রয়েছে তা কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়াটি কমাচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে হিসেবটি এত সোজা নয়। গাছ কার্বন শোষণ করে নিজের মধ্যে তা আটকিয়ে রাখে নিজদেহের অংশ হিসেবে। কিন্তু যখন গাছ মারা যায় তখনই ওই গাছই পঁচে গিয়ে কার্বন আবার বাতাসে ফেরৎ দেয়। কাজেই মোটের ওপর দীর্ঘকালীন কতটি কমাচ্ছে তা অনিশ্চিত। আর কৃষি ও পশু পালনের ওপর সারা দুনিয়া যে ভাবে নির্ভর করে– বিশেষ করে খুবই বিশাল আকারের বাণিজ্যিক ধরণের এসব কাজের ক্ষেত্রে– সেখানে শস্য চাষ (বিশেষ করে ধান চাষ) ও গরু-ভেড়া-ছাগল ইত্যাদির চাষের সঙ্গে বাতাসে মিথেন যাওয়ার বড় সম্পর্ক আছে। কাজেই আমরা নিজেরা সরাসরি যে গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে পাঠাচ্ছি, আমাদের চাষবাসের মাধ্যমে বিশেষ রকমের উদ্গীরণকারী জীবকেই শুধু সীমাহীনভাবে বাকি জীবের জায়গা দখল করতে দিয়ে যা করছি, আর যে বনকে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভেবে আত্মতুষ্টি অনুভব করছি, এসব ব্যাপারে আরও গভীরে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

এটা এক রকম সাভানার স্মৃতি তাড়িত চিন্তার মত, যদিও এখন তার সঙ্গে আমরা বিজ্ঞান চিন্তাকেও শামিল করছি। ধরিত্রী সম্মেলনের আর একটি মূলমন্ত্র টেকসই উন্নয়নকে (সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট) জাতিসংঘ এখন অনেক বড় আকারের আন্দোলনে পরিণত করেছে। সেটিকে অর্থনৈতিক হিসেব-নিকেশ করা একটি সিদ্ধান্ত মনে হতে পারে, কারণ সম্পদ ফুরিয়ে যেতে থাকলে আমরা কেউই আমাদের যার যার বর্তমান জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে পারবো না। কিন্তু এর মধ্যেও আমি একটি সাভানা মনোভঙ্গি কাজ করতে দেখি যেটি আমাদের বরাবর ছিলো, কিন্তু শক্তিধরের স্বার্থ ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সব সময়ে একে দমিয়ে রেখেছে। স্বাভাবিকভাবে আদি মানুষ সাভানাতে যে ভাবে প্রকৃতিকে বার বার ফিরে আসতে দেখেছে শুকিয়ে যাওয়া তৃণ আবার উজ্জীবিত হয়ে, শিকারের প্রাণী আবার ফিরে এসে, হাতিয়ার তৈরির পাথর কখনো না ফুরিয়ে, বা পাথরে তৈরি হাতিয়ার সহজে পুরোপুরি নষ্ট না হয়ে, আগুন জ্বালাবার খড়কুটোর অভাব কখনো না হয়ে– সেই ডিএনএ-সৃষ্ট স্মৃতি বংশ পরম্পরায়ে আমাদের কাছে এসে আমাদেরকেও ভালো লাগায়; থ্যুরোকে যেমন লাগিয়েছিলো ওয়াল্ডেনে। তেমনি সত্যি সত্যি যখন বায়ুকল-জলকল-সূর্যালোক থেকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক শক্তিতে আমাদের সব চাহিদা মিটবে, এবং জীব জগতের

ঐক্য ও প্রকৃতির ঐক্যটি আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারবো, তখন এক পৃথিবী এবং এক প্রাণের একটি অংশমাত্র হয়েও ওই উভয়কে আমরাই রক্ষা করে এখনো টেকসই থাকবো। দেড় ডিগ্রি লক্ষ্যের দিকে সত্যিই এগুতে পারলে এই অর্জন আমাদের হবে।

রিও-কিয়োতো-প্যারিস-গ্লাসগোঃ

রিওতে ধরিত্রী সম্মেলনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো বাংলাদেশ এনজিওদের প্রতিনিধি দলের একজন হিসেবে। সেই ১৯৯২ সালে ওতে বেসরকারি গ্লোবাল ফোরামে অংশ নেবার প্রস্তুতি হিসেবেই আজকের সবার অতি পরিচিত শব্দগুলো প্রথম শুনেছিলাম– দুনিয়ার জমা বরফ গলন, জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্র-পৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি, বন উজাড় হওয়া, জীববৈচিত্র বিলুপ্তি, আমাদের জীবন-আচরণ পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, এমনিতরো সব কথা। এর সবই আমাদের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করছিলো ধরিত্রী সম্মেলনের সেই মূলমন্ত্রটি: 'আমাদের একটিই পৃথিবী, একে রক্ষা করতে হবে'। অবশ্য নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে পদার্থবিদ্যার দিক থেকে কাজ করছিলাম আরও দশ-বারো বছর আগে থেকে ঢাকায় এবং ইতালির ত্রিয়েস্তে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের একজন এসোসিয়েট বিজ্ঞানী হিসেবে, তাদের নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রুপে। তখন অবশ্য এর সঙ্গে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া রোধে তার ভূমিকার কথা যত না বলা হতো গবেষণার পেছনে তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ ও বিনিয়োগ যোগাত তেলের অভাবের আশঙ্কায়– কারণ ১৯৭৩ এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তেল সংকটের পর এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। তখন অবশ্য তেলের অভাব শেষ পর্যন্ত ঘটেনি, কিন্তু এখন সব দেশের কাছ থেকে তেল-কয়লা ব্যবহার আর না করার প্রতিশ্রুতি চাওয়া হচ্ছে, এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভর করার– সেটি পৃথিবী রক্ষার কারণে।

এই ধরিত্রী সম্মেলনেই প্রথম সোচ্চার দাবি ওঠেছিলো ভুক্তভোগী দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেবার। শিল্পোন্নত দেশগুলো দুশ' বছর ধরে কয়লা-তেল-গ্যাস পুড়ে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট বিপদগুলো ঘটিয়ে এই সব দেশে ভূমি ডুবে যাওয়া, নোনা ঢোকা, ঘূর্ণিঝড় প্লাবন বাড়া ইত্যাদি বিপর্যয় ঘটিয়েছে; এই সবের ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে যাতে তারা সামনে এগুতে পারে, ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের সঙ্গে বসবাস করতে পারে। ওখানে আমাদের বেসরকারি ফোরামের সোচ্চার হওয়াটাই ছিলো দেখার মত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (সিনিয়র) রিওতে এসেছিলেন বটে

তবে তাঁর মুখে বড় বড় কথা কিন্তু কাজের বেলায় যুক্তরাষ্ট্রের যথাযথ অংশগ্রহণে অনীহাতে খুবই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনেক বেসরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও প্রতিবাদ মিছিলে রাস্তায় ছিলাম। বিস্ময়ের কথা আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে ঠিক একই রকম দাবিতে গ্লাসগো বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের বাইরের রাস্তার একই দৃশ্য ক'দিন আগেই টেলিভিশনে দেখেছি। রিও থেকে ফিরে ধরিত্রী সম্মেলনের ওপর একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম– তার একটি প্রধান অংশ ছিলো এজেন্ডা-২১ এর প্রত্যেকটি দফা নিয়ে আমাদের দেশ তাতে কী করতে পারে সে সম্পর্কে আমার চিন্তাটি দেয়ার চেষ্টা। এটি করার একটি অর্থও ছিল– এজেন্ডা-২১ নামক দলিলটি সব দেশের জন্য গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া থামিয়ে বিশ্ব রক্ষা করার করণীয়গুলোর একটি নীতিগত মানচিত্র দিয়েছিলো যাতে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই টেকসই উন্নয়নের প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন হয় (এজন্যই এর নাম এজেন্ডা-২১)। কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও নীতিগত সমর্থনের কারণে প্রত্যেক দেশ সেখানে কথা দিয়েছিলো যে একটি নিজস্ব দেশীয় এজেন্ডা-২১ তৈরি করে নিজেই তা বাস্তবায়ন করবে।

ওসব ছিল প্রত্যেক দেশের স্বেচ্ছায় করার ব্যাপার, যার ওপর প্রথম কিছুটা বাধ্যবাধকতার স্পর্শ লাগলো ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োতো সম্মেলনে, যাকে কপ-৩ ও বলা হয়। আসলে কপ (কনফারেন্স অফ পার্টিস) মানে এই ব্যাপারে সব পক্ষের বিশ্ব সম্মেলন– রিওর পর থেকে সেগুলো শুরু হয়েছে, প্রথমটি বার্লিনে কপ-১ ১৯৯৯ এ। তারপর থেকে প্রতি বছরেই বিশ্ব সম্মেলন করে করে ২০২১তে গ্লাসগোতে কপ-২৬ হলো। প্রতিটি সম্মেলনেই সমঝোতা কিছু কিছু এগিয়েছে বটে তবে বড় নাড়া দেবার ঘটনা ঘটেছে ১৯৯৭ এ কিয়োতো, ২০১৫ এ প্যারিসে, এবং সর্বশেষ এই গ্লাসগোতে সবকিছু এখন গায়ের ওপর এসে পড়েছে বলে। এগুলোর কোনটাতে না গেলেও প্রচুর উৎসাহ আর আশা নিয়ে প্রত্যেকটিতে কী হয়েছে লক্ষ্য করে গেছি। কিয়োতো সম্মেলনের কথা উঠলেই কিয়োতো প্রটোকলের কথা আসে। এটি সেই সম্মেলনে ১৯২টি দেশের স্থির করা কিছু বাটোয়ারা– অদূর ভবিষ্যতে কোন দেশ আরও কত কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ করতে পারবে তার বাটোয়ারা, যাতে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া দ্রুত কমিয়ে আনা যায়। শিল্পোন্নত ৩৭টি দেশকে তাদের বর্তমান উদ্গীরণ কমিয়ে নিম্নতর একটি মাত্রায় আসতে হবে– বিভিন্ন দেশের আগের উদ্গীরণ অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায়। বাকি দেশগুলো উদ্গীরণ চালাতে পারবে, বাড়াতেও পারবে একটি সীমার মধ্যে; যেহেতু এ দেশগুলো

ঐতিহাসিকভাবে আগে অত্যন্ত কম উদ্গীরণই করতে পেরেছে, তাদেরকে ওভাবে উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে। চীন ও ভারতের মত এখনকার বড় কয়লা ব্যবহারকারীরা এভাবে রেহাই পেয়ে যাওয়াতে ওই ৩৭টি দেশের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। ওদের উদ্গীরণ কমাবার কিছু বিকল্প উপায়ও কিয়োতো প্রটোকল করে দিয়েছিলো প্রধানত একটি কার্বন-বাজারের সৃষ্টি করে। যারা তাদের পুরো কোটা উদ্গীরণ করবেনা তারা সেই না করাটুকু অন্যদের কাছে বেচে দিতে পারে, সেটি কিনে নিয়ে অন্য কেউ তার কোটা থেকে বেশি উদ্গীরণ করতে পারে। তাছাড়া ধনী দেশ দরিদ্র দেশকে উদ্গীরণ কমাতে অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে সেই পরিমাণ বাড়তি উদ্গীরণ নিজে করতে পারবে। আশা ছিল কিয়োতো প্রটোকলের কারণে ২০০৮ থেকে ২০১২ এই পাঁচ বছরে বিশ্বের মোট উদ্গীরণ ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫% কমে যাবে। বলা যায় সঠিক দিকে ছোটখাট একটি শুরু তো হলো।

ওই সময় উদ্গীরণ ঠিকই কমে গিয়েছিলো ওই ৫% এর থেকেও বেশি, কিন্তু সেটি কিয়োতো প্রটোকলের দেশগুলো যার যার কোটার মধ্যে কাজ করেছে বলে নয় অন্যান্য কিছু দৈবক্রমে ঘটা রাজনৈতিক কারণে, যার মধ্যে প্রধান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া। এসবের ফলে ওখানকার বহু উদ্গীরণকারী দেশের শিল্পোৎপাদনে বড় রকমে বাধা দেখা দিয়েছিলো। আসলে কিয়োতো প্রটোকলকে সব দেশ শেষ পর্যন্ত অনুসমর্থন দেয়নি, উদ্গীরণও কমায়নি বা সেটিকে তাদের কোটার মধ্যে রাখেনি। তার মধ্যে যাদের এই প্রয়াসে যুক্ত না হওয়া সব থেকে বেশি হতাশাব্যঞ্জক তারা হলো সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহারকারী দুটি দেশ– যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। কাজেই এর প্রটোকলে সত্যিকার কোন উপকার হয়নি। তবে বাকি যেই অনেকগুলো শিল্পোন্নত দেশ এটি মেনে নিজেদের উদ্গীরণ কমিয়েছে তারা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে– এই প্রথম বিশ্বজনীন একটি বাধ্যবাধকতা পৃথিবী বাঁচাবার জন্য মেনে নিয়ে। কার্বন বেচাকেনার কাজটিও বেশ কিছুটা শুরু হতে পেরেছিলো। বাংলাদেশের কোন কোন এনজিও এবং কোম্পানি এ প্রক্রিয়ায় কীভাবে শামিল হয়েছিলো তা তাদের কাছে শুনেছি– তেল-গ্যাসের বিদ্যুতের বদলে সৌরশক্তি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তারা যেই কয়েক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে ওই ক'টন উদ্গীরণ নিজেরা বাড়তি করার জন্য কোন উন্নত দেশের কোম্পানি তাদেরকে এই কার্বনের দাম দিয়েছে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে প্রক্রিয়াটির কাগুজে আনুষ্ঠানিকতা ও তদারকি ইত্যাদি এতো জটিল যে

ছোট আকারে এর করার তেমন অর্থ হয় না। ওই বেচাকেনার মাঝখানে আরও বহু বিশেষজ্ঞ পরামর্শক কোম্পানি ইত্যাদির হাত থাকতে হয়।

বিশ্ব সমঝোতায় কেউ এলো, কেউ এলোনা এরকম অবস্থা থেকে বড় মুক্তিটি আসলো ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনে। অত্যন্ত আশাবাদ সৃষ্টি করে দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো এবং এর জন্য সেই দেড় ডিগ্রি উত্তাপের লক্ষ্যমাত্রাটিতেও একমত হতে পারলো। অবশ্য এটি এমনি এমনি হয়নি, এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে সকল শক্তিশালী রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক স্বার্থ একে কিছু বিজ্ঞানীর কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে তাদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছিলো সর্বশেষ গবেষণা। জাতিসংঘের উদ্যোগে নানা দেশের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্যানেল তার দীর্ঘ গবেষণায় সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছে– জলবায়ু পরিবর্তনে বর্তমানে কী হচ্ছে, ভবিষ্যতে কী হবে। এবার তাই সবাইকে মনোযোগ দিতে হলো যাতে সর্বনাশটি না ঘটে– সেখান থেকেই দেড় ডিগ্রির লক্ষ্যটি এলো। আসলে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো ২ ডিগ্রির নিচে রাখার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সবাই বুঝলো তাতে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি হলো দেড় ডিগ্রির ভেতরে রাখতেই সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত হলো ২০৫০ সালের মধ্যে প্রত্যেক দেশকে সর্বমোট শূন্য উদ্গীরণ অবস্থা অর্জন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

সর্বমোট শূন্য উদ্গীরণ মানে হলো কার্ব ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি যত গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে যাবে তার থেকে যতটা শোষিত হয়ে বাতাস থেকে নিয়ে নেয়া হবে সেটুকু বাদ দিয়ে সমষ্টিটাকে শূন্য করা। কার্যত ফসিল জ্বালানি ব্যবহারকে প্রায় শূন্যে পরিণত না করে এমনটি করা খুব কঠিন। ঠিক কখন এবং কীভাবে প্রতিটি দেশ এটি করবে সেটি কিন্তু প্যারিসে কেউ বলেনি– এগুলো নিয়ে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব সংকল্প ঠিক করে পরের সম্মেলনগুলোতে জানাবে এমনটিই কথা রইলো। অবশ্য তার আগে প্যারিসের ওই লক্ষ্যবস্তু ও সিদ্ধান্তকে দেশে দেশে অনুসমর্থিতও হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরী প্যারিস সিদ্ধান্তের সব থেকে উৎসাহী রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু সেখানেই শুরুতেই অঘটন ঘটলো, ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে জানালেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে প্যারিস সিদ্ধান্ত থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। চার বছর পর জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

হলে যুক্তরাষ্ট্র ওই সিদ্ধান্তের পেছনে অনুসমর্থন দিয়ে আবার সোৎসাহে তাতে ফিরে এসেছে। ট্রাম্পের ওই প্রত্যাহার ছিল পুরো উদ্যোগে একটি চরম ধাক্কা।

২০২১ এর নভেম্বরে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে যে কপ-২৬ হয়ে গেলো তাতে কিন্তু সবাইকে যার যার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি খোলাসা করে বল্‌তে হয়েছে। শতাব্দী শেষে গড় উত্তাপ বৃদ্ধিকে দেড় ডিগ্রির ভেতরে রাখার লক্ষ্যস্থলে কে কীভাবে যাবে সেটিই ছিল প্রশ্ন। আরেকটি বড় প্রশ্ন ছিল সর্বমোট উদ্গীরণ শূন্যে নিয়ে আসাটি কে কখন অর্জন করবে; কথাতো ছিল ২০৫০-এর মধ্যেই করা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্মেলনের প্রথম দিকেই বড় বড় উদ্গীরণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। অনেকে আগেই সেটি বলে দিয়েছিলো প্রায় সবাই ২০৫০-এর মধ্যে, কেউ কেউ তারো আগে। কিন্তু বড় উদ্গীরণকারীদের মধ্যে চীন জানালো যে এটি করতে পারবে ২০৬০-এর মধ্যে, আর ভারত ২০৭০-এর মধ্যে! এতে অনেকে নিরাশ হলেও আবার অনেকে সান্ত্বনা পেয়েছে একটি তারিখের ঘোষণা তো তারা দিয়েছে। কিন্তু কী পথে যে তা করা হবে তা স্পষ্ট করতে অনেকেই রাজি নয়। যেমন একটি সমঝোতা হয়েছিলো যে উন্নত দেশগুলো কয়লার ব্যবহার ২০৩০ এর মধ্যে আর উন্নয়নশীল দেশগুলো তা ২০৪০-এর মধ্যে একেবারে বন্ধ করে দেবে। চল্লিশটি দেশ তাতে রাজিও হয়েছে যাদের মধ্যে কয়লার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এমন দেশও আছে। কিন্তু সব থেকে বেশি কয়লা ব্যবহারকারীরাই এতে বেঁকে বসেছে– শেষ পর্যন্ত ভারত আর চীনের পিড়াপীড়িতে খুব জলো একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে কয়লার উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে– শূন্যে পরিণত করার কথাটি আদৌ রইলো না।

অবশ্য কিছু কিছু দেশ থেকে অন্য কিছু প্রতিশ্রুতিও এলো যেমন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশ নষ্ট বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগ নেবার ও মিথেন গ্যাস বাতাসে যাওয়াটি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ ২০৩০ এর মধ্যে তেলে চলা গাড়ি আর নতুন তৈরি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে– তৈরি করবে শুধু বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি। এগুলোর প্রত্যেকটি সহায়ক হবে, তবে কত শিগ্‌গির কতখানি ফল এর থেকে আসবে বলা মুশ্‌কিল। কারণ মূল সমস্যায় হাত এতে পড়ছেনা– যেমন নতুন সৃষ্ট বনে কত গাছ টিকবে আর কখন থেকে তারা কার্বন শোষণ করবে সেসব প্রশ্নের আশাব্যঞ্জক উত্তর নেই। তবে জীববৈচিত্রকে বাঁচাবার জন্য তাদেরকে আরও বিস্তীর্ণ জায়গা ছেড়ে দেবার ব্যাপারে এটি বেশ

সহায়ক হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র মিথেন কমাবার উপায় হিসেবে বলছে পাইপ লাইনে ছিদ্র থেকে এখন যত মিথেন বাতাসে যাচ্ছে সেটি কমিয়ে আনবে। অথচ মিথেন বাতাসে যাবার আসল উৎস হলো পশু পালন ও কৃষি, বিশেষ করে বড় বাণিজ্যিক পর্যায়ের পশুপালন– তার ওপর ব্যাপক হস্তক্ষেপের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

আরেকটি বিরোধ গ্লাসগোতে বেশ তীব্র রূপ ধারণ করেছে, কিন্তু এরও কোন সত্যিকার সমাধান হয়নি। ভুক্তভোগী দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠার জন্য ধনী দেশগুলো ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের কথা ছিল যা পাওয়া যাওয়ার কথা ২০২০ সাল থেকে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। এখন ২০২৩ সালে পাওয়ার কথা বলা হলেও কেউ তাতে বিশ্বাস করে না; তা ছাড়া টাকার দরকার এর থেকে অনেক অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত এটি দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে, এবং যত শিগগির সম্ভব এ অর্থ যোগাড়ের কথাও হয়েছে। এরকম ছেদো কথার বদলে সব ক্ষেত্রে সত্যিকার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখতে চেয়েছিল বিভিন্ন পরিবেশবাদী আন্দোলনকারীরা, বিশেষ করে নানা দেশের কিশোর-কিশোরী-তরুণ-তরুণীরা, যাদের ভবিষ্যতের জন্য এই সম্মেলন। তারা সারাক্ষণ গ্লাসগোতে এবং তার আগে অন্যত্রও মিলিত হয়ে সভা-মিছিল করেছে। টিভিতে এসব দৃশ্য ১৯৯২ সালে রিওর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। গ্লাসগোর কয়েকটি দিন টেলিভিশনের সঙ্গে লেগে থেকে দেখতে চেষ্টা করেছি সবাই কী সমঝোতার দিকে যাচ্ছে, দেড় ডিগ্রির লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করতে চাইছে। ওখান থেকে আসা সমঝোতার দলিলগুলো ইন্টারনেটে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি।

মোটের ওপর সবাই ধরে নিয়েছে যে গ্লাসগো দুনিয়াকে নিরাশ করেছে। বড় বড় দেশের নেতারা যারা দেড় ডিগ্রির লক্ষ্য অর্জন করতে স্পষ্ট পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন তাঁরা নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কথা, এবং সেই সুবাদে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা, বিবেচনা করে তা দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। সব কিছুকে যথাসম্ভব অনির্দিষ্ট এবং শুধু চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু তারপরও গ্লাসগো আগের সম্মেলনগুলোর মতো হাল ছেড়ে দেয়া অবস্থায় শেষ হয়নি, সবাই লক্ষ্যটিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখছে, ওতে কারো কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সেই লক্ষ্য অর্জনের পথরেখাগুলো সবাই পরিষ্কার না করলেও অনেকে করেছে। মাঝপথে শিগগির এক পর্যায়ে তেল-কয়লাকে ছেড়ে নবায়নযোগ্য শক্তিতে

পুরোপুরি চলে যেতে হবে তাতেও সবাই একমত– কে কখন যেতে পারবে এ নিয়েই মতভেদ। মিথেনের উৎসগুলোকেও বন্ধ করতে হবে এও স্পষ্ট। আরও বড় কথা কে কী করছে তা আগামী বছরই বসে সবাইকে জানাতে হবে, পর্যালোচনা করতে হবে। এভাবে খোলামেলা তথ্য দিয়ে এগোলে সবাই শিগগির নিশ্চয়ই বুঝবে ২০৫০, কি ২০৬০ এ গিয়ে মোট শূন্য উদগীরণ অর্জন করতে সে দেশ পারবে কি না। আর একযোগে সবাই এও বুঝবে শতাব্দী শেষে উত্তাপ দেড় ডিগ্রির মধ্যে রাখার লক্ষ্য অলীক না বাস্তব। এর মধ্যে নতুন প্রজন্মের ধৈর্য্যহারা প্রতিবাদের চাপটুকুও আগের মত কিছু পরিবেশবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে ভবিষ্যতের সব নাগরিকদের মধ্যে। পৃথিবীর ও প্রাণের অস্থিত্ব রক্ষায় এখন একটি পথই খোলা থাকবে– 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।

গ্রহান্তরে যাত্রা শুভ, তবে অগস্ত্যযাত্রা নয়

স্টিফেন হকিন্স এ যুগের পদার্থবিদদের মধ্যে পুরোভাগের একজন ছিলেন ২০১৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। পদার্থবিদ্যায় তাঁর তত্ত্বগুলোর ওপর নিজের জনপ্রিয় লেখাগুলোর কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে; সেই সঙ্গে তিনি মানুষের ও পৃথিবী ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নানা বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎদ্বাণী করে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর এসব লেখা ও বক্তব্যকে আমি নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি। তবে পৃথিবীকে ছেড়ে শিগগির আমাদেরকে গ্রহান্তরে চলে যেতে হবে এমন আশঙ্কা প্রকাশকে আমি মন থেকে গ্রহণ করতে পারিনি, একথাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নৈরাশ্যবাদী মনে হয়েছে। তিনি একাধিকবার তাগাদা দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে অন্য গ্রহে যাওয়ার ও সেখানে থাকার জন্য যে গবেষণা ও প্রস্তুতি চলছে তাকে আরও অনেক ত্বরান্বিত করতে। তাঁর হিসেব থেকে তিনি দেখেছেন যে পৃথিবী বড়জোর একশ' থেকে দুশ' বছরের মধ্যে আর বাসযোগ্য থাকবে না। এরপর মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে এর মধ্যেই 'সবাইকে' পৃথিবীর বাইরের সুবিধাজনক কোথাও অভিবাসী হতে হবে। আরও কোন কোন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত তিনি বর্তমান জীববৈচিত্র বিলুপ্তি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছেন; এগুলো অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশ্বকে মানুষের বাসের অনুপযুক্ত করে তুল্‌ছে। তিনি গ্রহান্তরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্পের ভেতর আশা দেখতে পান্‌নি। সেটি হবে মানুষের অগস্ত্যযাত্রা– যেরকম অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে সেই যে গিয়েছিলেন আর কোনদিন ফিরে আসেননি।

পৃথিবী থেকে মানুষের গ্রহান্তরে যাবার ব্যাপারে আমার দারুণ উৎসাহ সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে; বিজ্ঞানে আমার বাল্যকালের উৎসাহটিকে প্রথম উসকেই দিয়েছিলো পৃথিবীর বাইরে আবাস গড়ার রোমান্টিক কল্পনা। এমনি গ্রহান্তর ভ্রমণের কল্পকাহিনি যখনই পেয়েছি গোগ্রাসে পড়েছি, কালেভদ্রে যে দু'একটি সিনেমা এসেছে অবশ্যই দেখেছি। তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন যন্ত্রযানকে চাঁদে পাঠিয়েছে, আর এরপর আমেরিকার মার্কারি ও এপলো কার্যক্রমগুলোর মধ্য দিয়ে গিয়ে মানুষ যখন সত্যি সত্যি চাঁদে পা রাখল তখন যেমন আগাগোড়া এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলাম, এরপরও আছি আরও দূরের গ্রহান্তর অভিযানে– বিশেষ করে মঙ্গলে। গত কিছু বছর ধরে প্রায় নিয়মিত মঙ্গলের খবর পাঠাচ্ছিলো ওখানে ক্রমাগত কাজ করে যাওয়া রোবট যান 'কিউরিসিটি' (কৌতুহল), এখন সম্প্রতি গেছে আরও উন্নত নতুন রোবটযান 'পারসিভারেন্স' (অধ্যবসায়)। এরা সীমিতভাবে হলেও মঙ্গলের বিভিন্ন রকম জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, মাটি খুঁড়ে শিলার গঠন রাসায়নিকভাবে পরীক্ষা করেছে; প্রচুর ছবি পাঠিয়েছে, তথ্য পাঠিয়েছে, এখনো পাঠিয়ে চলেছে। মঙ্গলে বরফের আকারে পানি আবিস্কৃত হয়েছে, ভূমিতে থাকা নানা রাসায়নিক বস্তুতে জীব-সহায়ক আলামত পেয়েছে–এগুলো যথেষ্ট আশা জাগিয়েছে যে এক কালে হয়তো মঙ্গল কোন না কোন রকম ক্ষুদ্র জীবনের উপযুক্ত ছিল।

মঙ্গলে বায়ুমন্ডলও আছে, তবে তা মোটেই পৃথিবীর মত বায়ুমন্ডল নয়-একেবারেই পাতলা ঝিরঝিরে, চাপ অনেক কম। আর বাতাসে আছে প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রায় ৯৫%; বাকি ৫% এর অর্ধেকের মত নাইট্রোজেন ও অর্ধেক আর্গন– কোনটিই অন্তত মানুষ বাসের উপযুক্ত নয়, যদিও খুবই সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন আছে। তবে এই ঝিরঝিরে বায়ুমন্ডলই এই সেদিন মঙ্গলকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে অনুভব করার সুযোগ এনে দিয়েছিলো আমার জন্য। মার্কিন মহাশূন্য সংস্থা 'নাসা' যারা মঙ্গলে পারসিভারেন্সের অভিযান পরিচালনা করছে তারা ওই রোবটের মাইক্রোফোনে ধরা পড়া কিছু কিছু শব্দ ইন্টারনেটে দিয়ে দিয়েছিল। সেই শব্দগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম, বারবার শুনলাম– অদ্ভুত এক অনুভূতি এনে দিলো, যেন মঙ্গলে বসেই শুনতে পাচ্ছি এমনিই বাস্তব সেই আওয়াজ। সঙ্গে শব্দ আসার জায়গাগুলো থেকে জ্বলজ্যান্ত ছবি অনুভূতিকে আরও জীবন্ত করে তুলছিলো। প্রথম আওয়াজটি ছিল বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ, এ সময় বোধ হয় একটু জোরেই বইছিলো বাতাস। একেবারেই পাতলা বায়ুমণ্ডল, কিন্তু তারপরেও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাতলা ঝিরঝিরে

বাতাস সেই শব্দ মাইক্রোফোনে পৌঁছেও দিতে পারছে। তারপর যে শব্দটি পেলাম তা হলো পারসিভারেন্সের মঙ্গলের পাথর-শিলায়-নুড়িতে ভরা ভূমির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলার ঘর ঘর শব্দ। এর পরের আওয়াজটি খুব চিকন চাপা চিক্ চিক্ শব্দ; এটি পারসিভারেন্সের লেজার রশ্মি দিয়ে মঙ্গলের একটি শিলা পাথরের ওপর ঠোকরানোর শব্দ ওভাবে শিলা থেকে একটু একটু করে পাউডারের মত গুড়া বের করা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। সব থেকে দুর্দান্ত শব্দ যেটি পেয়েছিল সেটি পারসিভারেন্সের সঙ্গে থাকা ছোট্ট একটি হেলিকপ্টারের, যার নাম ইনজিনুইটি (অভিনবত্ব)। অতি হালকা করে তৈরি ছোট্ট খেলনা হেলিকপ্টারের মত। মঙ্গলের এই পাতলা বাতাসে ভেসে থাকতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই, তাও ওপরের ঘুরন্ত পাখিটির ঘোরার গতিবেগকে অত্যন্ত বেশি রেখেই ওড়াটা সম্ভব হচ্ছে। তার আওয়াজ এই ওড়াটিরও একেবারে বাস্তব অনুভূতি দিচ্ছে। ইনজিনুইটির কাজ হলো আগেভাগে উড়ে ওপর থেকে দেখে পারসিভারেন্সের চলার উপযুক্ত পথের সন্ধান করে আসা ও সেভাবে তাকে পথ দেখিয়ে চলা। সম্প্রতি আরও খবর আছে, মঙ্গলে মার্কিন দূত এখন একা নয়, এ বছরই চীনও ওখানে একটি রোবট যান পাঠিয়েছে অনেকটা একই রকম, একই উদ্দেশ্যে; এর নাম হুরং (চীনা উপখ্যানের দেবতা)। হুরঙের পাঠানো ছবিগুলোও দেখলাম।

বোঝা যাচ্ছে মঙ্গলের প্রতি উৎসাহ প্রচুর, এবং সব দেখে ভাবতেই পারি শিগগির ওখানে মানুষও আসা যাওয়া করবে, হয়তো কিছুদিন থেকেও যাবে। সেই গবেষণাগুলোতে আলাদাভাবে বোঝার চেষ্টা চলছে কীভাবে মানুষ ওখানে ঘোরাফেরা করতে পারবে, বাস করতে পারবে তা নিয়ে। স্পষ্টত বায়ুমণ্ডল সত্ত্বেও ওটি আমাদের উপযুক্ত না হওয়াতে নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে থাকলে সেখানে স্পেস-পোষাক পরতে হবে, আর বসবাস করতে হবে আবৃত, কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে শুধু তার মধ্যে। তবে বরফ থাকায়, জীবন সহায়ক নানা বস্তু শিলার মধ্যে থাকায়, উত্তাপের ওঠানামা নিয়ন্ত্রিত আবৃত পরিবেশ গড়ার সীমার মধ্যে থাকায়, এক রকমের কলোনি করে মঙ্গলে বসবাস সম্ভব হবে। ওই হেলিকপ্টার ওড়া, শব্দ শোনা ইত্যাদিও এমনি সম্ভবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে সেটি কি আমাদের জন্য পৃথিবীর বিকল্প হতে পারবে?

ওভাবে অভিবাসী যদি হতে হয় তাহলে মঙ্গলই কি একমাত্র সম্ভাবনা? না চাঁদেরও অনুরূপ সুযোগ আছে, আর তা হাতের কাছে মানুষ যেখানে ঘুরে এসেছে; যদিও মঙ্গলের মত ওখানে কোন বায়ুমণ্ডল নেই, পানি যা

আছে তা সহজলভ্যভাবে নেই। মঙ্গলের থেকে দূরের কোন কোন জায়গার কথাও ভাবা হচ্ছে গিয়ে বসত করার জন্য। এর মধ্যে সুবিধাজনক মনে হচ্ছে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা আর শনির উপগ্রহ এনসেলেডাসকে। সৌরজগতের দূরের দিকটায় চালানো বহু বছর ব্যাপী মহাশূন্যযান ক্যাসিনির অনুসন্ধানে এই দুই উপগ্রহে এমন কঠিন ও তরলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে যেখানে মানুষের আবাস সম্ভব। তবে সেখানে সেই আবাসকে হতে হবে চাঁদ ও মঙ্গলের তুলনায় আরও কঠিন কৃত্রিম বসবাসের মাধ্যমে। আপাতত সম্ভাবনা এগুলোই দেখা যাচ্ছে– কোন বড় গ্রহাণুকে যদি একই রকমের বসবাসের জন্য খুঁজে নেয়া সম্ভব না হয়। হকিংস যে ধরনের ব্যাপক অভিবাসনের কথা বলছেন তা আগামী একশ' বছরের মধ্যে কতখানি সম্ভব হবে তা বলা মুশ্‌কিল। তবে প্রয়োজনের তাগিদে গবেষণার গতি বেড়ে গেলে তা সম্ভব হতেও পারে, পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে মানুষ কি না করতে পারে! হকিংস জলবায়ু পরিবর্তনের প্যারিস সম্মেলনের কথা জেনেছিলেন, গ্লাসগো সম্মেলনের কথা জানার সুযোগ পাননি। প্রথমটি তাঁর মতামতে কোন পরিবর্তন এনেছিলো কিনা জানি না, কিন্তু যেভাবে সবাই পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়েছে তাতে এটি বাসযোগ্য না থাকার ব্যাপারে শেষ কথা হয়তো তিনি বল্‌তেন না।

গ্রহান্তরে যাওয়ার জন্য মানুষের অভিযাত্রা চলবে। মানুষ তার পুরো ইতিহাসে কখনো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকতে চায়নি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সব সময় দেশান্তরে গিয়েছে। মূল বাসভূমি আফ্রিকা ছেড়ে ওদের অনেকে এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সব মহাদেশে গিয়েছে, যে সব জায়গা থাকার জন্য প্রতিকূল সেখানেও গিয়েও বাসা বেঁধেছে। শেষ পর্যন্ত এখন তাদের জন্য পৃথিবীতে নতুন করে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। তাই অনুসন্ধানী, অভিযাত্রী মনের মানুষ অন্য গ্রহে যাবে, সেখানে কাজ করবে, এমনকি সেখানে গিয়ে বসত করবে এটিই স্বাভাবিক। তাই বলে সবাই যাবে, পৃথিবীকে ছেড়েই দেবে এগুলো অকল্পনীয়। নতুন গ্রহে যাবার অনেক কারণ রয়েছে, নতুন মহাদেশে যাবার যে রকম কারণ ছিল। প্রধানত গবেষণা ও অনুসন্ধানই হবে মুখ্য, যার ফলে সেখানকার সম্পদ আহরণ সম্ভব হবে, ওখান থেকে আরও দূরে আরও সহজ জীবনের জায়গায়ও একদিন যাবার উপায় প্রশস্ত হবে; আর বেশি বেশি মানুষ ওই গ্রহ ও তার আশপাশে বসত করতে পারবে, বহু অজানাকে আবিস্কার করতে পারবে। চাঁদ, মঙ্গল, ইউরোপা বা ইনসেলেডাসের মত জায়গায় কৃত্রিম পরিবেশেও যদি আর একটু আরামপ্রদ জীবন সৃষ্টি করতে হয়, সেখানকার সম্পদকে

ব্যবহারোপযোগী করতে হয়, তাহলে সেখানকার আবহাওয়ায়, ভূমিতে, এবং ভূমির নিচে বড় বড় পরিবর্তন সাধন করতে হবে– ওখানেই যদি শক্তির ভালো উৎস পেয়ে যাই তাহলে এসব করা কঠিন হবে না। এমনি কাজের মাধ্যমে শিগগির একদিন হয়তো আমরা ওখানকার পরিবেশকেও মানব-বান্ধব করে তুলতে পারবো, এমনকি এক ধরণের জীব-বান্ধবও বটে। সে রকম বড় আকারের পরিবর্তন আমাদের জন্য একেবারে নতুন জিনিস নয়, স্থানীয়ভাবে পৃথিবীতে এক একটি জায়গায় প্রকৃতিকে বদলাবার কাজ আমরা করেছি– যেমন সাগর থেকে ভূমি উদ্ধার, নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি, মরুকরণকে বাধা দিয়ে উর্বর তৃণভূমি সৃষ্টি ইত্যাদি। অনেক বড় আকারে করলে এসবকে জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং বলা যায়।

প্যারিস ও গ্লাসগো সম্মেলনে ২০৫০ বা তার কাছাকাছি সময়ে মোট গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণকে শূন্যে পরিণত করার সংকল্প নেয়া হয়েছে, তার ওপরই জলবায়ু পরিবর্তনের থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য পূর্ণ ভরসা করা হচ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞানী এটিকে বোকামি মনে করেছেন, কারণ তাঁদের মতে ২০৫০ এ গিয়ে নতুন কোন উদগীরণ বাতাসে নাও যদি যায় গত কয়েক শ' বছরে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ইতোমধ্যেই চলে গেছে ও যাবে, সেটি দীর্ঘকাল ওখানে জমে থাকবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতেই থাকবে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকবে। যেই পৃথিবী-ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য এত কিছু করা সেই ধ্বংসের দিকেই এটি যাবে। শিল্প-বিপ্লবের আগে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড মোটামুটি বহুকাল একই রকম ছিল ৩০০ পিপিএমের থেকে কম (পিপিএম মানে প্রতি দশ লক্ষ এককের মধ্যে এক একক)। ওটি মানুষের জন্য আদর্শ স্থানীয় ছিল, ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপকে একই সুবিধাজনক জায়গায় রেখে দিয়েছিলো। ওর পর থেকে তা বেড়েছে এবং এখনো হুহু করে বাড়ছে বলেই ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বাড়ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। ২০৫০ সালে গিয়ে মোট উদ্গীরণ শূন্য হয়ে গেলেও তখন বাতাসে ৪৬০ পিপিএম কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকবে যা ভয়াবহ পরিণতি আনবে। কাজেই একমাত্র উপায় হলো উদ্গীরণ না করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি গ্রিন হাউস গ্যাস যা বাতাসে চলে গেছে তা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে আবার তাকে এই শিল্প বিপ্লবের আগের অবস্থায় নিয়ে আসা, ৩০০ পিপিএমের নিচে। ব্যাপকভাবে এটি করার উপায় ইতোমধ্যেই আমাদের হাতে রয়েছে তা হলো কয়েক ধরণের জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে। মোট উদ্গীরণ শূন্য করার লক্ষ্যকে যথেষ্ট মনে না করে তাঁরা এই নতুন প্রস্তাবকে বলেন বরং 'জলবায়ু পুনরুদ্ধারের' লক্ষ্যে কাজ করা।

তাঁদের মধ্যে একজন বিজ্ঞানী পিটার সীকোস্কি এজন্য মোট চার রকমের জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিক ব্যবস্থা এখনই ব্যাপকভাবে নেয়ার প্রস্তাব করেছেন যা ওভাবে জলবায়ু পুনরুদ্ধার করতে পারবে– বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই। এগুলোকে তিনি স্থায়ী ব্যবস্থা মনে করেন, কারণ ওই আটকানো গ্যাস আবার বাতাসে যাবার সুযোগ নেই। প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণে তাদের প্রয়োগ সম্ভব কারণ সেদিক থেকে কোন সীমা নেই। আর এর ব্যয়ের অর্থ এর ফলে উদ্ভূত বাণিজ্যিক লাভ থেকেই উঠে আসবে। পদ্ধতিগুলো নীতিগতভাবে নতুন নয়, প্রকৃতিও এভাবেই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন এই দুই গ্যাসকে বাতাসে যেতে বাধা দেয় এবং অতীতে সেভাবে তা করে পৃথিবীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমরা শুধু নিজেরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করবো মাত্র। এর একটি হলো কৃত্রিমভাবে চুনা পাথর তৈরি করা, কার্বনেট হওয়ায় যাতে বাতাসের কার্বন আটকা পড়ে। আরেকটি হলো ব্যাপক আকারে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ করা যেমন বড় বড় লম্বা পাতার মত কেল্প। মাঝ সমুদ্রে কোন বিশেষ হালকা কাঠামোকে জড়িয়ে বিশাল আকারে তা করা সম্ভব। এগুলোর বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করার ক্ষমতা বাদল-বনের বৃক্ষের থেকে অনেক বেশি, এবং তা মরে গেলে ডুবে যায়– পঁচে কার্বন আবার বাতাসে যাবার ভয় নেই। আর এদের নানা ব্যবহারও রয়েছে। তৃতীয় পদ্ধতিও প্রায় একই– এ ক্ষেত্রে সমুদ্রে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্লাঙ্কটনের চাষ করে তার ব্যাপক বিস্তার, খোলা মাঝ-সমুদ্রে। এগুলোও কার্বনের খুব বড় রকমের শোষক, মরে গেলে এও পানিতে ডুবে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে এদের বৃদ্ধি সীমিত হয়ে যায় সমুদ্রের পানিতে লোহার অভাবে। যদি ব্যাপকভাবে সেখানে লৌহ আকরিকের (পাথর) গুড়া ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে এর সীমাহীন বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। চতুর্থ পদ্ধতিটি অন্য গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেনের ভয়াবহ প্রভাবকে দূর করার জন্য– গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে মিথেনের প্রভাব কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে অনেক বেশি। মিথেনকে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে তার থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি পাওয়া যায়। আয়রন ক্লোরাইডকে ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করে এভাবে ব্যাপকভাবে মিথেনের বদলে কম ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া সম্ভব– এটি মন্দের ভালো। সীকোস্কির মতে এর মধ্যে দু'টি এখনই ছোট আকারে বাণিজ্যিকভাবে হচ্ছে, বাকিগুলো তাঁর ল্যাবোরেটরিতে করে সফল হয়েছে– সবই ব্যাপকভাবে হতে পারে। যা এখনো আমরা করছিনা এভাবে সেই জলবায়ু পুনরুদ্ধারের দিকেও হয়তো আমাদের নজর দিতে হবে পৃথিবী ধ্বংস

এড়াতে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে তো বটেই গ্রহ উপগ্রহেও এমনি ধারার কোন কোন ব্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাধ্যমে আমরা মানব-বান্ধব জলবায়ু এবং পরিবেশও হয়তো গড়ে নিতে পারবো।

কিন্তু অন্য গ্রহ-উপগ্রহে সেটি হবে আমাদের সীমিত অভিবাসন বা অস্থায়ী বসবাসের খাতিরে করা। আমাদের মূল লক্ষ্য পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আমরাসহ পুরো জীববৈচিত্রের জন্য সব চাইতে ভালো অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা। তার যে উপায় আমাদের হাতে যে আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। প্যারিস-গ্লাসগো তার এক পথ বাতিয়েছে, হয়তো জলবায়ু পুনরুদ্ধারও তার সঙ্গে প্রয়োজন হবে। আরও প্রয়োজন হবে প্রয়োজনীয় জায়গা ছেড়ে দিয়ে জীব বৈচিত্রকে বাঁচতে দেবার। মঙ্গল মরে গেছে বহুকাল আগে; পৃথিবী মরে যায়নি, ভবিষ্যতে মরার আশঙ্কা করা হচ্ছে মাত্র। মঙ্গলে কৃত্রিম আবাস করার থেকে পৃথিবীতে এখনো প্রাকৃতিক আবাস বাঁচানো অনেক সহজ। আর যদি কখনো কৃত্রিম আবাসও গড়তে হয় তাও মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে গড়া ঢের বেশি সহজ হবে। তার পর আরও অন্তত দু' একশ' বছরের মধ্যে আমরা দূর তারার গ্রহগুলোতেও হয়তো যেতে পারবো। সেখানে আবিস্কৃত হচ্ছে অনেকটা পৃথিবীর মতই গ্রহ, পরে হয়তো আরও হুবহু পৃথিবীর মতো ভূমি ও জলবায়ু নিয়েই বহু গ্রহ আবিস্কৃত হবে– যেহেতু গ্রহের সংখ্যা অনেক ও বৈচিত্র অনেক, তা হতে বাধ্য। ওখানে যাবার মত গতিবেগের যানবাহন আমাদের হাতে নেই, তবে গবেষণায় দেখাচ্ছে শিগগির এক সময় তা আমরা উদ্ভাবন করতে পারবো। সে সময় হয়তো আমাদের যাওয়ার জন্য পৃথিবীর মতই সুজলা-সুফলা করে নেবার উপযুক্ত বহু গ্রহ আমরা পাবো ব্যাপকভাবে অভিবাসী হবার জন্য। কিন্তু সে বহু পরের কথা। আপাতত আমাদের একটিই পৃথিবী, ওটিই আমাদের ঠিকানা, এবং বরাবর এটিই আমাদের আসল স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে থাকবে, একে রক্ষা করতে হবে। আমাদের ডিএনএ পৃথিবীর আদলে গড়া, যে কারণে সাভানার স্মৃতি ছোট মানব শিশুকে সতেজ চারা বা রোমশ বেড়াল বাচ্চার সান্নিধ্যে উৎফুল্ল করে তোলে। এখান থেকে কোনদিন আমরা অগস্ত্যযাত্রা করতে পারবো না।

পরকে করিলে ভাই

একই গ্রামের মানুষ

মফস্বল মনঃ

ছোটবেলার কথা, তখনো সিনেমা দেখার বয়স হয়নি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে সখ করে গিয়ে দেখা একটি সিনেমার কথা খুব মনে পড়ে– নামটি মনে আছে 'একই গ্রামের ছেলে', কাহিনিটিও আবছা আবছা। দুই বন্ধুর শৈশব হেসে খেলে গ্রামে কেটেছিলো, পরে তাদের একজন কলকাতা শহরে এক স্বচ্ছল পরিবারে মানুষ হয়ে বখে গিয়েছিলো। সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনের দুই বন্ধুতে পরিণত বয়সে দেখা হয়েও নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় তারা তখন বিধ্বস্ত। পরে গ্রামের ওই শৈশব স্মৃতিই তাদেরকে আবার কাছাকাছি এনেছিলো– ছবির শেষ দৃশ্যটিও মনে আছে দুজনেই জড়াজড়ি করে বলছে 'আমরা একই গ্রামের ছেলে'। আজকাল একটি কথা সব সময় শুনি গ্লোবাল ভিলেজ, বিশ্বগ্রাম, পৃথিবী সংকুচিত হয়ে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে– ইত্যাদি নানা ভাবে। বিশ্বায়নের ব্যাপ্তি বোঝাতেই এটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়– বিশ্বজোড়া একই চাহিদা, একই লেনদেন, একই সংস্কৃতি, এমনি বোঝাতেই। কিন্তু কেন জানিনা 'একই গ্রাম' কথাটি আমাকে সব সময় ওই কিছুটা অস্পষ্ট সাদা কালো চলচ্চিত্রের ওই একই গ্রামের দৃশ্যগুলোই মনে করিয়ে দেয়, হয়তো শিশুমনে একটি প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে দাগ কেটেছিলো বলে। আসলে বিশ্বকে আমার কাছে গ্রাম মনে হয় একটু ভিন্ন অর্থে– নানা চাকচিক্যের নানা দেশের নানারকম মানুষের পেছনে যেন লুকানো রয়েছে একই রকম আসল মানুষ। বড় বিশ্বখ্যাত নগরীর নাগরিক মানুষটিরও যখন কাছে যেতে পেরেছি দেখেছি তাঁর মধ্যেও আছে একটি মফস্বল মন– একই মফস্বলে, একই গ্রামেই যেন আমাদের অবস্থান। যখন নিজেদের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাগুলো, গল্পগুলো সবার সঙ্গে সুন্দর মিলে যায় তখন ওভাবে চিন্তা না করে উপায় থাকে না। মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গুণগুন করেন:

কত অজানারে জানাইলে তুমি,

কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

স্কুলে থাকাকালীন একটি উদাহরণ দিই। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের মাঠে ১৯৫৯ সালে জমায়েত হয়েছিলো দেশ বিদেশের অনেক বয়স্কাউট– দ্বিতীয় পাকিস্তান জাতীয় জাম্বুরীতে। চট্টগ্রাম স্কাউটসের পক্ষ থেকে আমাদের স্কুলের স্কাউটদের সঙ্গে আমিও ছিলাম, আমি তখন সদ্য দশম শ্রেণিতে উঠেছি। ওখানে বিদেশি স্কাউটরা আমাদের বিশেষ কৌতুহলের অংশ ছিল, আমাদের ক্যাম্পের কাছেই ছিল জাপানের ছোট দলটি, একজন স্কাউট মাস্টারের অধীনে। আমি তাই একাধিকবার ওখানে গিয়েছি, আমার বয়সী ও আরও ছোট জাপানি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তখন তাদের স্কাউট মাস্টারকে দেখেছি ছেলেদের লাজুকতার জন্য ওদেরকে বকাঝকা করতে– জাপানি ভাষায়। আমার কাছে এখন বার বার মনে হচ্ছে আমাদের স্কাউট মাস্টার মখলেস স্যারের সঙ্গে আমি তাঁর কোন পার্থক্যই খুঁজে পাইনি– ঠিক একই রকম সস্নেহ বকা, একই দেহভঙ্গি, সবই। পরে জেনেছি তাঁর নাম মিজনো সান (সান কথাটি মিস্টার বা সাহেবের মত অর্থে, আমাদের জন্য তখন মিজনো স্যারের মত)।

অদ্ভুত এক যোগাযোগে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে মিজনো সানকে আরও কাছে থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে দেখার সুযোগ হয়েছিলো, এবং সেটি তাঁর দেশে জাপানে। বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী ও জাপান জাম্বুরীতে যোগ দেবার জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে মাস খানেকের জন্য জাপানে অবস্থানকালে, একটি বড় সময় মিজনো সান আর তাঁর স্কাউটদের সঙ্গে এক সঙ্গে জাপানের নানা জায়গায় ঘুরেছি। যদিও ভাষার ভীষণ আড়ষ্টতা ছিল, ধীরে ধীরে মনে হয়েছে এটি আমাদের একই দল– আর মিজনো সান আমাদের আর এক মখলেস স্যার ছাড়া আর কেউ নন। তিনিও আমাদেরকে ভিনদেশি কোন আজব ছেলে বলে মনে করেছেন বলে মনে হতোনা– সমানে বকাবকি করতেন, আবার খুশি হলে বাহবাও দিতেন। তিনি যদি আমাদেরকে গাড়িতে চড়তে না দিয়ে লম্বা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন আমরা গতি ধীর করে অনিচ্ছা প্রকাশ করতাম, আর নানাভাবে অসহযোগিতা করতাম। বেশি রেগে গেলে তিনি আর তাঁর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কুলাতে পারতেন না, সোজা জাপানিতে বকতেন, অনেক সময় কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে। আমরা কিছুই বুঝতাম না, আবার অনেক খানিই বুঝতাম, কারণ এই দৃশ্য নিজের স্কুলে আমার অপরিচিত নয়। ওভাবেই একদিন দেখলাম

ঐতিহ্যবাহী নারা শহরের হরিণ-পার্কের কাছে বিখ্যাত মন্দিরের সামনে তিনি আবেগ ভরে আমাকে ও আরও দু'একজনকে উপদেশ দিচ্ছেন জীবনে বড় আকাঙ্খা করার জন্য, কিন্তু সব সময় শান্ত সমাহিতভাবে চিন্তা করতে। জাতীয় স্কাউট দল হিসেবে আমাদেরকে নানা জায়গায় অনেক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে এটা সেটা করতে হয়েছে, জাপানের যুবরাজের থেকে শুরু করে অনেকের বক্তৃতা শুনতে হয়েছে। কিন্তু ওই সময়, ওই মিজনো সানের ও আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া একই বয়সের স্কাউট বন্ধুদের সান্নিধ্যে থাকার সময় আমরা ছিলাম নেহাতই একটি অন্তরঙ্গ একীভূত স্কাউট দল হায়াকু নি-জু রকু নম্বর ট্রুপ (১২৬ নম্বর)– আমাদের মিজনো সানের নির্দেশে লাফ-ঝাঁপ দেয়া বালক বাহিনী। যেন ভুলেই ছিলাম যে আমি বিদেশে আছি, এদের ভাষা, হালচাল বলতে গেলে কিছুই জানি না, এগুলো আমাদের থেকে যত ভিন্ন হতে পারে ততটাই। বরং খালি মনে হয়েছে বরাবরের বন্ধুদের মধ্যেই আছে আমাদের মখলেস স্যারের হম্বিতম্বির ভেতরে। মখলেস স্যার যেভাবে আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে উপদেশ দিতে থাকেন, মাঝে মাঝে তাও চলছে। ওরাও টোকিও থেকে আসা সেরা একটি ট্রুপ নয়, আমরাও জাতীয় দল নই– নেহাতই মফস্বল স্কুলের একটি স্কাউট ট্রুপ– হায়াকু নি-জু রকু। সেই ১৪ বছর বয়সেই দুনিয়াকে অনেক অন্তরঙ্গভাবে ছোট দেখতে পেরেছিলাম; এরপর কখনো আর অন্য রকম মনে হয়নি।

সে তো ছোট বয়সের কথা। আরও অনেক পরে বড় বয়সের আর এক মফস্বল ভ্রমণের কথা বলি। পরিবেশ সংক্রান্ত একটি ফেলোশিপে ১৯৯৫ সালে আমি যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো অঙ্গ-রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে মাস দেড়েক কাটিয়েছিলাম। তার একটি পর্যায়ে আমাকে বিস্তীর্ণ কৃষি প্রধান জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছিলো পরিবেশ বিভাগের একজন সরকারি কর্মচারীর, নাম বব স্মিথ– বয়স আমার থেকে কয়েক বছর হয়তো কমই হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ ও কৃষি সংক্রান্ত; এর বেশ কয়েকটিতে ববের বন্ধুদের দেখা মিলছিলো, কোনটিতে একদিন, কোনটিতে আধ দিন আমাকে কাজ করতে হচ্ছিল। ববের সঙ্গে আমার একটি মিল আছে, আমরা দু'জনেই একটানা কথা বলে যেতে পারি। যাত্রার শুরুর পর অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই দু'জনেই বুঝে গিয়েছিলাম যে পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মন খুলে কথা বলা যায়।

ওভাবে তার চাকরি জীবনের কথা আমার শোনা হয়ে গিয়েছিল– বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে এতে তার বেশকিছু আশা ভঙ্গের কথা। ওর

মধ্যে ঘুরে ফিরে যে কথা এলো তা হলো ক্লিনটন সরকারের ওপর তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা। 'তা ভাই আজকাল দিন এসেছে অন্যদের– যদি মহিলা হতে পারেন, কালো হতে পারেন তা হলে আপনার উন্নতি ঠেকায় কে; কোন যোগ্যতার দরকার নেই।' শুরু থেকেই বুঝতে পারছিলাম তাঁর রাজনীতি যাকে বলা যায় ডানপন্থী। প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন যে এর আগের সুবিধা-বঞ্চিতদেরকে সুযোগ দিতে চাচ্ছেন এটাই তিনি তাঁর ও তাঁর অনেক বন্ধু বান্ধবের বঞ্চনার কারণ বলে মনে করছেন। সেই সূত্রে আরও বহু সুখদুঃখের কথা তাঁর কাছে শোনা গেলো– এ বয়সের সরকারি কর্মচারীদের কথা। যদিও তাঁর মতামত আর আমার মতামত অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না, আমি তা নিয়ে বেশি তর্ক না তুলে বরং তাঁর কথা মনোযোগ দিয়েই শুনলাম, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম তাঁর যুক্তিগুলো। ওভাবেই তাঁর অনেক কাছে চলে আসা। প্রত্যেকবার একটু দূরের পথে যাত্রা শুরু করার আগে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতেন বাথরুম ব্যবহার করে নেবো কি না। তিনি নিজেও ব্যবহার করতেন। আমাকে স্থানীয় দর্শনীয় কিছু দেখানো, মজাদার কিছু খাওয়ানোর দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকতো। এক এক প্রতিষ্ঠানে পৌঁছার পর অনেক সময় কাজের আগে-পরে আমাদের দু'জনের আড্ডা কয়েকজনের আড্ডাতে পরিণত হতো। কলরাডোর ওই এলাকার স্থানীয় অনেক সমস্যা আমার জানা হয়ে গেলো এভাবে– বিশেষ করে এখানকার কৃষিজীবীদের সমস্যার কথা।

তাঁদের অভিযোগ সরকার কৃষির প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। ইতোমধ্যে বব আমার সঙ্গে গল্প করতে ও তর্ক করতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাদের সব কথায় আমার ফোড়ন কাটার ব্যবস্থাও তিনি করে দিচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলাম যে এই পুরো রাজ্যে তাদের কৃষি ডিপার্টমেন্টের নানা প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরণের হলেও এরা সবগুলো মিলে নিজেরাই একটি জগত– কোনটা খামার বাড়ির মত, কোনটি ল্যাবোরেটরি, কোনটি শুধুই দপ্তর। বব যে এখানে সব সময় এতো ঘোরার সুযোগ পায় তা মনে হলো না, কারণ কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়াতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছাসের কোন সীমা নেই, হয়তো নতুন বদলি বয়ে এদিকে এসেছে, তাই বহু বছর পর দেখা। একটি জিনিসে খুব অবাক হলাম এই হঠাৎ দেখা হওয়া বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে ববের জীবনের সব থেকে আবেগের সময়টি কেটেছে ভিয়েতনামে, তাই একথা সেকথা বলার পরই কথা চলে যায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কোন্ সময়টায় কে ওখানে কোথায় যুদ্ধ করছিলো তা নিয়ে। বয়সটি এমন যে তাদের প্রায় সবাইকে ওসময়

ড্রাফ্টের ডাক পেয়ে ভিয়েতনামে যেতে হয়েছিলো। অতি তরুণ বয়সে জীবন-মরণের ওই অভিজ্ঞতাগুলোকে ওরা ইয়ারি-দোস্তের আলোচনায় হালকা করে বললেও এর ভেতরের আতঙ্ক, বিভীষিকা, আবেগগুলো কিন্তু চাপা থাকছিলো না। দানাং, বিন হুয়া, হুয়ে এই সব রণাঙ্গণের কথা এমন ভাবে বলছিলো যেন ওগুলো তাদের স্কুলের শিক্ষা সফরে যাওয়া যায়গা। সবই সর্বত্র একসঙ্গে ভিয়েৎকং গেরিলাদের টেট্ অফেনসিভের (ভিয়েৎদামিদের টেট্ উৎসবের আড়ালে একই সঙ্গে গেরিলাদের বহু জায়গায় মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ) সময়ের কথা ও তার পরপর। ওসময় আমি বৃটেনে থাকাতে টেলিভিশনের পর্দায় রোজ রাতে এই জায়গা ও এই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো দেখে দেখে আমারো মুখস্থ। ওর মধ্যে কোন কোন স্কুল-সাথী আর ফিরে আসেনি তাদের কথাও স্মরণে নিচ্ছিলো, অথচ আড্ডার ভঙ্গিটি এমন যেন ওই শিক্ষা সফর থেকে নিজেদের মফস্বল স্কুলে ফিরে এসে সবাই সবার খোঁজ নিচ্ছে। আমার মূল ষ্টেশন ডেনভারে ফিলে আসার আগে ববের আরেকটি কাজে খুব মজা পেলাম। খামার বাড়ির মত একটি জায়গায় কাজ করা বন্ধুকে বলছিলেন বাড়িতে বাগানের কাজে কিছু খড় পেলে মন্দ হতো না। বন্ধু বললেন সদ্য কাটা গমের খড়গুলো যে গাইট করে করে সারা খেতে ফেলে রাখা হয়েছে তার থেকে যাওয়ার পথে একটি তুলে নিলেই হবে। বব একটু ভদ্রতা করে বলতে চেয়েছিলেন সরকারি জিনিস, একটি গাইট কম পড়লে হিসেবে অসুবিধা হবে না তো। বন্ধু শুধু হোক একটু চোখ নাচালেন। আমরা ববের বিশাল পিক্-আপ ভ্যানে খেত থেকে খড়ের বিশাল একটি চৌকা গাইট তুলে নিয়েছিলাম।

একই গ্রামের মানুষ হলে ওরা সবাই শেষ পর্যন্ত একে অপরের প্রতি একটি বন্ধন অনুভব করে, নিজ গ্রামের মানুষের উপকার করতে চায়। জেনেটিক্সের দিক থেকে এর যে কারণ দেখানো হয় তা হলো কাছের সম্পর্কের ও দূর সম্পর্কের অনেক আত্মীয় নিজ গ্রামে থাকে, সব রকম আত্মীয়ের সঙ্গে কমবেশি কিছু একই জিন সবারই থাকে। আর জেনেটিক্সের নিয়মে প্রত্যেকটি জিন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়, সেটি যার মধ্যেই থাকুক– তার মানে গ্রামবাসীর বেঁচে থাকাতে একটুকুও সহায়তা করতে পারাটি প্রত্যেকের জেনেটিক প্রবণতা। সারা দুনিয়ার মানুষই অবশ্য অন্য মানুষকে এক ভাবে একই গ্রামের মানুষ বলে অনুভব করতে পারে কারণ তারা সবারই একই পূর্বপুরুষের থেকে প্রায় একই জিন পেয়েছে। সেটিই হয়তো আমি অনুভব করেছি– মিজনো সানের মধ্যে মখলেস স্যারকে অনুভব করে, অথবা বব স্মিথ আর তাঁর বন্ধুদের আচরণের মধ্যে আমাদের

দেশের পরিচিতদের দেখতে পেয়ে। আসলে আজকের বিবর্তন-নির্ভর মনোবিদ্যাও একই কথা বলে– দুনিয়ার নানা অঞ্চলের, নানা সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বাহ্যত অনেক পার্থক্য থাকতে পারে– চেহারা, ভাষা, বিশ্বাস, সামাজিক আচার ইত্যাদিতে; কেউ আধুনিক সভ্যতার তুঙ্গে আবার কেউ অত্যন্ত আদিম অবস্থায় থাকতে পারে; কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতির আড়ালে তাদের সবার মৌলিক আচরণগুলো লক্ষ্য করে ও এইগুলো নিয়ে গবেষণা করে আশ্চর্য রকম মিল পাওয়া গেছে। যেমন তাদের সবাই বক্তৃতার ঢঙে কথা বলার সময় ভাষার গম্ভীর শব্দগুলো ব্যবহার করে, সবাই গল্প বলতে ও শুনতে পছন্দ করে, সবার ভাষায় রসবোধের আদর আছে, কষ্ট পেলে বা খুশি প্রকাশ করতে একই রকম উহ্-আহ্ শব্দ করে, একই আবেগে একই মুখভঙ্গি করে, শিশুদের সঙ্গে একইভাবে আধোবুলিতে কথা বলে, শিশুর সঙ্গে আদর করে খেলতে পছন্দ করে। তাদের দুঃখের বা সুখের বা ঘুম পাড়ানি গান শুনলে বোঝা যায় কোনটি কী, প্রত্যেক মানুষের বা জায়গার বা অন্য সব কিছুর জন্য একটি নাম সবাই দেয়, যৌন বিষয়ে কথা বলতে প্রায় একই রকম রাখ-ঢাক করে, ইত্যাদি আরও অসংখ্য আচরণের বিষয়ে অদ্ভুত রকম মিল একেবারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেই নিশ্চিত করা গেছে। এত ভিন্ন মানুষের মধ্যে এত রকম আচরণের মিল কেন? উত্তর সোজা– আমরা সবাই একই গ্রামের মানুষ বলে। বিশ্বটি আসলেই একটি গ্রাম, এবং তার বাসিন্দা সব মানুষ একই পরিবার।

ভিন্ দেশের টেলিভিশন সিরিয়াল:

করোনার বিশ্বমারিতে বহু দিন বাড়িতে আবদ্ধ থাকার সময়ে টেলিভিশনে নেটফ্লিক্সের একেবারেই ভিন্ দেশ ভিন্ সংস্কৃতির সিরিয়াল নাটক দেখা আমার একটি প্রিয় কাজ ছিল। টেলিভিশনে সিরিয়াল মানুষ সাধারণত প্রতি সপ্তায় অথবা প্রতিদিন একটি করে পর্ব দেখলেও, এভাবে আমি পর্বের পর পর্ব একই দিনে দেখে ফেলেছি। এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে ওই ডালাস-ডাইনেস্টি ইত্যাদি দেখার পর থেকে বহুদিন সিরিয়াল দেখা আমার নিজের কোন অভ্যাস আর ছিলনা; অন্যের দেখার সময় বাংলা সিরিয়াল মাঝে মাঝে দেখেছি। সব সিরিয়ালের একই দুর্বলতা– একই কাহিনি ক্রমাগত লম্বা করার জন্য এমন সব কৌশল নেয়া যা যে কেউ ধরে ফেলতে পারে– যেমন একই ধরণের ভুল বার বার করেও কোন শিক্ষা না নেয়া, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সব কথা শুনে ফেলা, এক একটি দৃশ্য অনেক্ষণ ধরে দেখানো, সত্য কথাটি নানা অদ্ভুত কারণে না বলতে পারায়

অকারণ অনেকে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে কাহিনি চল্‌তে থাকা, ইত্যাদি। সম্প্রতি অবসরে যে বিদেশি সিরিয়ালগুলো দেখেছি তাও একই দোষে দুষ্ট, কাহিনির মধ্যেও বলতে গেলে একই সব ফর্মুলা মাফিক পারিবারিক জটিলতা, সম্পর্কের উত্থান-পতন এমনি সব বাক্সবন্দী গতানুগতিক ব্যাপার। তা হলে এতক্ষণ ধরে এসব দেখা কেন? একটিই কারণ– প্রত্যেকটিতে তার নিজ নিজ সংস্কৃতির ছাপ এমন ভাবে পড়ে যে কিছুদিন দেখার পর মনে হয় তাদের সংস্কৃতিটি আমার খুবই পরিচিত হয়ে গেছে, একেবারেই ভিন্ন পরিবেশের মানুষগুলোও পাশের বাড়ির চেনা মানুষ হয়ে যায়; তাদের ভাষা, উচ্চারণ, পরস্পরকে সম্বোধনের বা আড্ডা দেবার ভঙ্গি ইত্যাদিও যেন দারুণ পরিচিত– মনে হয়েছে সিরিয়ালের মাধ্যমে তাদের ঘরোয়া জীবনের যত কাছাকাছি যেতে পেরেছি অন্য কিছুতে তা হতো না। সব সিরিয়ালের কাজই তো হলো মানুষের একেবারে কাঁচা আবেগগুলোর সুযোগ নেয়া– ভালোবাসার আকর্ষণ, অন্যের সাফল্যে হিংসা, ইত্যাদি পরিচিতি আবেগগুলো। সেই সঙ্গে সব থেকে বড় উপলব্ধি যেটি হয়েছে তা হলো এতদিন একে যতটা দূরের সংস্কৃতি বলে মনে করতাম, এটি কিন্তু ততটা দূরত্বে নয়– এখানেও সেই একই গ্রামের মানুষের ব্যাপারটি ধরা পড়ে; তবে এবার দূরে ভ্রমণ করে নয়, আরাম করে সোফায় বসেই সিনেমা দেখে তা ধরতে পেরেছি। সেই মৌলিক মিলের মধ্যে বাহ্যিক ছোট ছোট অমিলগুলো এমন সুন্দরভাবে চোখে পড় যে সেটিই আমাকে চমৎকৃত করে রাখে– মনে হয় সিরিযালটি না দেখলে বৈচিত্রগুলো কোনদিন সঠিকভাবে জানতাম না, মনগড়া ভুল ধারণাই থেকে যেতো।

একটি চীনা, একটি কোরীয়, একটি ইসরায়েলি ও একটি তুর্কী সিরিয়াল থেকে দু'একটি উদাহরণ নিতে পারি। প্রত্যেকটি বেশ ক'দিন ধরে দেখে দেখে এক পর্যায়ে মনে হয়েছে যেন চরিত্রগুলো আমার বহুকালের চেনা। কোরিয়ান সিরিয়ালটি খুব মনে ধরেছিলো বছর পাঁচেকের একটি খুকির জন্য, নাম হিউন জুয়া, খুব নরম ভঙ্গির কোরিয়ান উচ্চারণে সবাই তাকে যে ভাবে ডাকে তাতে আমার কানে যেন আসে আমাদের চাটগেঁয়ে ভাষায় সব খুকিকে যেমন ডাকে অডি-বাচুনি। দুটো মেয়েকে নিয়ে তার মা স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে এখনো ব্যস্ত মানুষ নিজের বাবার কাছে– সুন্দর একটি গ্রামে, যেখানে তিনি একা থাকেন- কারণ হিউন জুয়ার নানিও নানাকে ছেড়ে চলে গেছেন। পাহাড়ের ভেতরে গ্রামটি ভারি সুন্দর, মাত্র কয়েক ঘর প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো-মন্দ বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়েই জটিল কাহিনি। আমার কাছে সবচেয়ে মজার ঘটনাগুলো হিউন জুয়া আর তার

নানার খুবই আদরের সম্পর্ক নিয়ে। নানাকে ওরা ডাকে 'হারা আবোজি' অর্থাৎ বড় বাবা– হারা মানে বড়, বাবাকে অবশ্য সম্মান করে পোষাকিভাবে আবোজি ডাকলেও ঘরোয়াভাবে ডাকে 'আব্বা'। সেটি বুঝি তাদের বাবা যখন মেয়েদের দেখতে মাঝে মাঝে ওখানে আসে তখন। ওই গ্রাম আর কাছের শহরের মধ্যে একটিই বাস দিনে দু'তিনবার মাত্র যাতায়াত করে। একবার নানি এসে কিছুদিন ছিলেন, তখন আদরের নানি ডাকটিও শুনেছি 'হারা এ্যামনি' (শুনতে মনে হয় হারামণি) অর্থাৎ বড় মা। এ্যামনি মায়ের পোষাকি ডাক, ঘরোয়াভাবে মাকে ডাকে 'মা', কখনো কখনো 'উম্মা'। হিউন জুয়ার যত আবদার নানার কাছে, পেতে দেরি হলে এমন ভাবে গাল ফোলায় যে নানা বেচারা খুব দিশেহারা হয়ে পড়েন, কী করে তাড়াতাড়ি নাতনির মান ভাঙ্গাবেন বুঝতে পারেন না। দুই বোন হেলে দুলে লাফিয়ে লাফিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, হঠাৎ দূর থেকে দেখা গেলো গ্রামের পথ ধরে নানা বিপরীত দিক থেকে আসছেন; অমনি হিউন জুয়ার পায়ের ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। নানা বুঝতে পারেন বাকি পথটুকু তাকে কাঁধে চরিয়ে আলাপ করতে করতে নিয়ে যেতে হবে, সে কারণেই এত বাহানা।

বোন সিউং-উ বয়সে সাত-আট বছরের বড়, ছোট বোনকে অসম্ভব আদর করে, রাতে এক বিছানায় থাকে, ওদের গল্প করা আর থামেইনা যতক্ষণ পর্যন্ত না মা এসে ধমক দিয়ে ঘুমাতে বলে। মা দুই বোনকে এমন ভাবে আগলে রেখেছে যে বোঝার উপায় নেই যে সিউং-উ আসলে তার মেয়ে নয়, সৎ মেয়ে। হিউন জুয়া এটা জানেই না। একদিন সিউং-উর আসল মা বর্তমানে নামকরা সিনেমা অভিনেত্রী বহুকাল পরে ফোন করে খুব অনুরোধ করাতে তাকে বাসে শহরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসতে পাঠানো হলো। বহুক্ষণ সিউং উকে না দেখে হিউন জুয়া মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বুঝিয়ে বলে যে বোনের আরেকটা মা আছে, দেখা করতে গেছে। তখন হিউন জুয়ার কথা হলো কী মজা ওর, তার দু'টা মা, ওর মা মাত্র একটা! নানা কঠিন অসুখ হয়ে শহরের হাসপাতালে গেলে ওরা সবাই আপাতত ক'দিন শহরেই থাকে। হিউন জুয়া কিছুতেই নানার হাসপাতাল রুম থেকে যাবে না, সেখানে আরও একজন রুগী থাকা সত্ত্বেও। নানাকে কথায় ব্যস্ত ও হাসিখুশি রাখে, অন্য রুগীও খুব মজা পান। নানার সঙ্গেই তার বিছানায় থাকে। এক ফাঁকে ফুটপাতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিতেই ফেরিওয়ালা থেকে জিনসেং শিকড় (কোরিয়ান বনাজি ওষুধ) কিনে আনে তার জমানো পয়সা দিয়ে নানাকে ভালো করার জন্য। নানা নেহাৎ তাকে খুশি করার জন্য সেটি খান ঠিক যে ভাবে নাতনিকে ফেরিওয়ালা বলে

দিয়েছে। এসব দেখতে দেখতে কোরিয়ান ভাষার ঝঙ্কারগুলো আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ঠেকতে লাগলো– মনে হতে লাগলো এদের বাড়ির আনাচ কানাচ, তাদের প্রতিবেশীরা, গ্রামের রাস্তা ঘাট সব যেন চেনা। মেয়ে দু'জনের বাবাটি বেশ ঘোরপ্যাঁচের মানুষ– কিন্তু যখন মেয়েদের দেখতে এসে তাদের সঙ্গে খেলাধূলায় মেতে যায় আর ওরাও আব্বা আব্বা করে দারুণ উপভোগ করে বাবার এই বিরল উপস্থিতি, তখন খুব মায়া লাগে এমন বাবার জন্যও।

কোরিয়ান সিরিয়ালের পর যখন তুর্কীটি দেখেছি তখন কোরিয়ান আর তুর্কী ভাষার আওয়াজের মিলটি বেশ লক্ষ্য করা যায়– ভূগোলের দিকে তাকালে এটি প্রত্যাশিত নয়, উভয় দেশের দূরত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির বিবেচনায়। অবশ্য কারণটিও পরিষ্কার– দুই ভাষাই একই ভাষা-পরিবার আলতাইকের অন্তর্ভুক্ত। মনে হতে পারে কোরিয়ান ভাষা প্রতিবেশী ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের চীনা ভাষার কাছাকাছি হবার কথা– তা কিন্তু মোটেই নয়, আকাশ-পাতাল পার্থক্য উভয়ের মধ্যে– তারা ভিন্ন ভাষা-পরিবার হবার কারণে। সেটি চীনা সিরিয়ালটি দেখে বেশ বুঝেছি।

স্বাভাবিকভাবেই তুর্কী সিরিয়ালের চরিত্রগুলো ও তাদের আলাপ সালাপ আমার কাছে একেবারেই চেনা মনে হয়েছে– অন্তত তাদের নামগুলো ও সারাক্ষণ ব্যবহৃত আমাদের পরিচিত শব্দগুলোর জন্য। সংলাপে সবার প্রায় প্রতিটি বাক্যই শুরু হয় আল্লাহ-আল্লাহ বলে। যেমন– 'আল্লাহ-আল্লাহ, এ কেমন কথা' 'আল্লাহ-আল্লাহ, তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে ভাই'– ইত্যাদি। নায়কের নাম ওমর, নায়িকার আয়েশম। নায়িকার লোকান্তরিত মা বিলকিস, তার চাচা ইলিয়াস, চাচি সাফিয়া, খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও এক সময়ের রুমমেট রেহানা ও ফারিয়া, আরেক বান্ধবী শবনম– এমনিতরো সব নাম। কথার মধ্যে বাবা, হাওয়া, বাহার (বসন্ত), গাদ্দার (নিষ্ঠুর), ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ, ইয়ানে (মানে), কাবাব, কোফতা ইত্যাদির ফুলঝুরি। শেষের শব্দগুলো কোফতা, কাবাব একটু বেশিই শোনা গেছে– কারণ সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটি শহরের একমাত্র কোফতার দোকানটি আয়েশমের বাবার। তার পরিবেশটি অনেকটা আমাদের ধানমন্ডির রাস্তার ধারের কাবাব হাউসের মত। বাবা নিজে কোফতার মিশ্রণটি হাতে মেখে মেখে এক একটি কোফতা বানিয়ে চুলায় তাওয়ায় দিচ্ছেন, আয় ১৫-১৬ বছরের এক ছেলে ছুটাছুটি করে তা খদ্দেরদের সামনে নিয়ে যাচ্ছে– যারা চায়ে আর গল্পে মশগুল। ওই দোকানের সঙ্গে ছোট বাসায় মা-মরা মেয়ে আয়েশম বাবার হাতেই বড় হয়েছে, লেখাপড়া করেছে। এখন অনেক দূরে

বিশাল নগর ইস্তাম্বুলে একাকী ইউনিভার্সিটিতে যাবে– বাবার কী উদ্বেগ, কী কান্না।

আমার সব থেকে প্রিয় চরিত্র হলো ওই ইউনিভার্সিটিতে হালুক ভাই– ঠিক আমাদের চিরকালের চেনা আদু ভাইয়ের মত, যে কখনো পাশ করেনা সব সময় ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র থেকে যায়। তাঁকে দেখি ওখানকার ক্যান্টিনে তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিতে; ওদের সবার দেখভাল করার দায়িত্ব যেন তিনি নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় নিয়ে নিয়েছেন, আয়েশম, রেহানা, ওমর ওরাসহ সবার ওপর গার্জেনগিরি করেন, সবার সমস্যা তিনি গায়ে পড়ে সত্যি সত্যি সমাধান করেন, হাজার হলেও শিক্ষকদের বেশ কয়েকজন তাঁর সহপাঠি কি না, তবে ছাত্রদের সামনে ওই শিক্ষকদেরকে তুই-তোকারি করা বারণ। অদ্ভুত প্রাণ-খোলা হাসি-খুশি মানুষ এই তুর্কী আদু ভাই– সবার জন্য চায়ের অর্ডার দেন কথায় কথায়। কিন্তু মনে অনেক দুঃখ– বাড়িতে বৌ-বাচ্চা আছে, অনেক অশান্তি, ক্যান্টিনে খাবার পানি সাপ্লাই করার কাজটি পেয়ে মোটামুটি ভালো আছেন একটি কোম্পানির ডিলার হিসেবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আমাদের সবার মধ্যে চায়ের যে ভূমিকা, তুর্কীদের মধ্যে ঠিক তাই– ক্যান্টিনে, বাড়িতে, মেহমানদারিতে, সভা-সমিতিতে কাপের পর কাপ চা খেয়েই চলেছে– ঠিক আমাদের পরিবেশ। তবে সেখানেও সূক্ষ্ম পার্থক্য– সব চা ছোট ছোট স্বচ্ছ গ্লাসে, এবং সুন্দর চায়ের রঙ বাইরে থেকে দেখা যায়, কারণ তা রঙ-চা।

চীনা সিরিয়ালটি আসলে মালয়েশিয়ার চীনা সমাজকে নিয়ে, তাতে আমি যতটুকু দেখেছি একজন মালায়ানও দেখিনি– কুয়ালালামপুরের চীনা এলাকায় নর্তকী নায়িকার পরিবেশেও নয়, আর তার বাবা-মা-পরিবার যেখানে থাকে সেই গ্রামেও নয়; সবাই চীনা, এমনকি রাস্তাঘাটের চলাচলের মানুষরাও। এটি যদি বাস্তব প্রতিফলন হয় তা হলো বলতে হবে মালয়েশিয়ার মালায়ানরা ও চীনারা একই জায়গায় বাস করেও পরস্পরের থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে থাকতে পছন্দ করে। ওলান গ্রামের গরিব পরিবারের মেয়ে, বেশ সাহস করে শহরে এসে নাইট ক্লাবে নর্তকীর কাজ নিয়েছে বাবা-মা'র ঘোরতর আপত্তির মুখে। এখন বেশ স্বচ্ছল হয়ে মাঝে মাঝে বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা-ভাইবোনদেরকে দেখে আসে, কিছু টাকাও দিয়ে আসে। তারা এখনো তাকে সমাজচ্যুত, পরিবারচ্যুত মনে করলেও– খেটে খাওয়া মা, পক্ষাঘাতে কথা না বলতে পারা বাবা, এবং বড় হওয়া ভাইবোনদের প্রতি তার প্রচণ্ড ভালোবাসা আর আনুগত্য তাকে বার বার

গ্রামে ফিরিয়ে আনে। প্রত্যেকটি ভাই আর বোনকে শহরে নিয়ে গিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করে ওলান।

কথাবার্তায় আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে তাদের টোনাল ভাষা– যেভাবে উচ্চ খাদ-নিম্ন খাদে ক্রমাগত ওঠা নামা করিয়ে কথা বলে সেটি। একটি মজার অভ্যাস হলো কথা বলার সময় প্রত্যেকটি বাক্যে যার প্রতি কথা তাকে সম্বোধন করা। যেমন ওলান যখন মাকে কয়েকটি কথা বলছে– 'মা, তুমি আমার চলে যাওয়াটি কখনো পছন্দ করেনি। মা, এখন বাবা আমার সঙ্গে আর কথাও বলতে পারে না। মা, তোমাদেরকে আমি আর কষ্ট পেতে দেবো না।' আবার মা যখন কথা বলেন 'ওলান, তুমি তোমার কাজ ফেলে চলে যে আস তাতে আমরা খুশি হই। ওলান, তুমি সুখে থাক, এটাই আমাদের কামনা। ওলান, তোমার বাবার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেলেও এখনো শুধু তোমাকে নিয়েই সর্বক্ষণভাবেন'– এমনি ভাবে আরও কতগুলো বিষয় বেশ চোখে পড়ে। যেমন শহরের দামী রেস্টুরেন্টে পার্টিতেই হোক, আর গরিব ঘরের সাধারণ শাক-সব্জি-ন্যুডলই হোক, খাবারের রান্না, পরিবেশনা, আগ্রহ ও তৃপ্তি ভরে খাওয়ার পুরো বিষয়টিকে ওরা সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই সম্পর্কে আলোচনাকেও। এক সঙ্গে যখন খেতে বসে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি উপায় হলো চপস্টিক দিয়ে মূল বাটি থেকে অথবা নিজের পাত থেকে ভালো কিছু তুলে অন্যের পাতে দেয়া। খেতে খেতে কথা বলতে বলতে এটি মাঝে মাঝে চলতেই থাকে– প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে দিচ্ছে, মা বাবাকে তুলে দিচ্ছে, ছেলে মাকে তুলে দিচ্ছে– এটি সব রকম পরিবেশেই ঘটছে।

যে মানুষগুলোকে আমার কাছে সব থেকে অদ্ভুত ও সব থেকে অপরিচিত মনে হতো, হিব্রু ও ইদ্দিশ ভাষার মিশ্র কথাবার্তার ইসরাইলি সিরিয়ালটি দেখে তাদেরকেও একইভাবে আপন মনে হয়েছে। ইদ্দিশ আসলে এক ধরণের জার্মান– জার্মানি ও আশপাশ থেকে আসা ইসরাইলিদের ভাষা। অতি-অর্থোডোক্স হাসিদিক গোষ্ঠির ইহুদিদেরকে আমি নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বেশ কয়েকবার থাকার সময় দেখেছি। এদেরকে লক্ষ্য না করে উপায় নেই এতই ব্যতিক্রমী এদের চুলদাঁড়ি ও বেশভূষা, আর ব্রুকলিনে সংখ্যায়ও তারা বেশ। বিশেষ করে শনিবার সাবাতের দিনে তারা নানা ধর্মীয় কাজে এদিক ওদিক যায়, অন্য সব কাজ বন্ধ করে। সিরিয়ালটি ইসরায়েলে এই আলট্রা-অর্থোডোক্সদের সমাজকে নিয়ে, তাতে বেশভুষাগুলো আরও ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছি। একেবারে তরুণরাও দাঁড়ি অনেক লম্বা করে তাতে বেণী করে নেয়। চুলও অনেক

লম্বা, বেণী করা কানের পাশ দিয়ে জুলফি গাল বেয়ে নেমে আসা। মাথায় অদ্ভুত কালো টুপি কোন কোনটি অনেক বড় ও উঁচু। লম্বা কালো কোট, এর দুপাশে দুই পকেট থেকে বিশেষ ধরনের বেণী করা সুতা বের করা– সব সময় যত্ন করে ওটি বের করে রাখে, পাছে কোন সময় আবার পকেটে ঢুকে যায়। মহিলাদের নিজের চুলের ওপর বিশেষ ধরণের পরচুলা পরা, অদ্ভুত ঢোলা এক রকম ড্রেস। এসবের কোনটির পান থেকে চূণ খসার উপায় নেই– একেবারেই আচার-মানা মানুষ সবাই। অথচ এত সবকে ভেদ করেই সিরিয়ালটিতে লক্ষ্য করলাম এরাও একেবারেই আমাদের একই গ্রামের মানুষ।

তরুণ নায়ক তার বিপত্নীক বাবার সঙ্গে থাকে– যিনি একটি ইদ্দিশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব এই সব বেশভূষা-আচার রক্ষার একজন বড় প্রতিভূ– বাইরে তাঁর সেই রূপটি খুবই কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে সবাই দেখে। কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। ওর ভেতরের মানুষটার মধ্যে কিন্তু দারুণ রসবোধ– সেটি এমনকি বাসায় একমাত্র ছেলের সঙ্গে আচরণেও টের পাওয়া যায়। তাঁর প্রতি কথায় যেন সূক্ষ্ম রস ঝরে পড়ে– মনোযোগ দিয়ে না শুনলে বোঝা যায় না। ছেলে ষোলো আনাই বাবার রসবোধ পেয়েছে– সব আচার মানে, আবার একই সঙ্গে সব কিছুকে হালকা করে দেখতে পারে। বেগানা নারীর ছায়া মাড়ানোটি অর্থোডোক্সদের জন্য পাপ। কিন্তু এর মধ্যেই একের পর এক আচার মাফিক বিয়ের ঘটকালী করার চেষ্টার ভেতরে হবু বর-কনের একান্ত আলাপের ব্যবস্থা আছে। সেখানেই টের পাওয়া যায় হবু বরটি রসিক প্রিন্সিপ্যালের উপযুক্ত ছেলেই বটে। কবিতা লিখে, কথায় কথায় জোক বলে অফিসে সহকর্মীদেরকে মাতিয়ে রাখে। বাবার জন্য ছেলে রান্না করে রাখে অর্থোডোক্স কায়দায়, তিনি এলে দু'জনে খায়, আর বাবা ছেলেকে ভর্ৎসনা করেন এখনো কনে জোটাতে ব্যর্থ হবার জন্য। নিজের জীবন কাহিনির কিছু কিছু গল্প তুলে ধরেন– ভাবতে অবাক লাগে কত সংগ্রাম এমন মানুষের জীবনেও। এখন প্রিন্সিপ্যালের চাক্‌রি বোধ হয় থাকছে না, কারণ ওরা তরুণতর কাউকে খুঁজছে। ওর মধ্যে ওই সমাজের আনন্দ স্ফূর্তিগুলো ধরা পড়ে– পরিবারে সাবাতের দিন, অথবা বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিনে সব আত্মীয় স্ত্রী পুরুষ যখন একত্র হয় তখন ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি তিন পুরুষের মানুষ যেভাবে একে অপরের কাঁধে হাত রেখে গাইতে গাইতে নাচে তাও দেখার মত। অথচ এর ভেতরেই সিরিয়ালের সব উপাদান অন্য সবগুলোর মত– ভালোবাসা, কলহ, হিংসা, ভুল বোঝাবুঝি, সবই। শেষ অবধি মানতেই হয়

ওইসব অদ্ভুত ভূষণ অদ্ভুত আচার শুধু বাইরে বাইরে– ভেতরে সব মানুষ হুবহু এক।

একই গভীর গল্প

দেশে দেশে রুমমেটঃ

যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডোতে কার্বনডেল নামে এক গ্রামে সৌরশক্তির ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করেছিলাম বহুদিন আগে। বাকি সবাই ওদেশেরই, একটি মেয়ে শুধু এসেছিলো কানাডা থেকে– রোজালিন্ড। বাংলাদেশ সম্পর্কে সবারই জ্ঞান খুবই সামান্য, শুধু রোজালিন্ড ছাড়া। দু'কথাতেই বুঝে গেলাম ও আমাদের দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে– খাবার দাবার, রান্না, গান, ইতিহাস, গ্রাম, বিয়ে, কী নয়? শিগগির বুঝতে পারলাম, কারণ একটাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার রুমমেট ছিল জাহেদা– বাংলাদেশের মেয়ে। ভাবেসাবে মনে হলো জাহেদা তখন রোজালিন্ডকে মন্ত্র করে রেখেছিলো, এখনো তা কাটেনি, রুমমেটের কাজই তো তাই।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আমার নিজের রুমমেটদের কথা স্মরণ করলেও তো সেটিই দেখি। কাউকে কেউ নাম ধরে তো ডাকেনি- অনেক দূর থেকেও দেখলে ডাক দিয়েছে– 'রুমমেট'। স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়েও শুনি বহু দূরে এক এক জনের সেই 'রুমমেট' ডাক, কত জনের কত রুমমেটই তো সেখানে আছে, তারপরও সেই ডাক– কারণ এর থেকে অন্তরঙ্গ কিছু তো হতে পারে না। সিনেমা দেখা, খেলা দেখা, আড্ডা দেয়া এসবতো আছেই– কিন্তু যে তারুণ্যে যতটি সময় কাছাকাছি কাটিয়েছি তাতে নিজেদের যত গভীর ভাবনা– জীবন নিয়ে, দেশ নিয়ে, বিশ্ব নিয়ে– তারো তো সব থেকে বড় সাক্ষী এই রুমমেটরা। ভাগ্যক্রমে আমি দেশের বাইরেও নানা রুমমেট পেয়েছি, নানা দেশের। যদিও আগের মত অতটা সময় কাটেনি কারো সঙ্গেই, তারপরও তাদের ক্ষেত্রেও রুমমেট চরিত্রের খুব একটি ভিন্নতা দেখিনি, সেই গভীর গল্পগুলোতেও না।

ওভাবে রুমমেট পাবার একটি জায়গা ছিলো ইতালির ত্রিয়েস্তে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের গেস্ট হাউস 'গ্যালিলিও বিল্ডিঙে'। প্রায় প্রতি বছর দু'তিন মাসের জন্য ওখানে গেলে ওই সময় কোন না কোন দেশের কাউকে রুমমেট হিসেবে পেয়েছি। আমি শুধু কয়েকজনের কথা উল্লেখ করবো, তাদের দেশ, নেতা, মানুষ সম্পর্কে যা আলাপ হতো শুধু সেটুকু বলার জন্য। পোল্যান্ডের তরুণ তোমাস স্টাপিনিস্কির কথা আগেই বলেছি তার রেডিও হ্যাম হবার প্রসঙ্গে। ট্রেনে এসেছে বলে সে দেশ থেকে

প্রচুর টিনের খাবার নিয়ে এসেছিলো– বিশেষ করে নানা রকম টিনবদ্ধ মাছ এবং নানা সবজির মিশ্রণ। ইতালিতে কাঁচা ডলার খরচ করার ইচ্ছে ছিলনা বলেই এমন করা– কম্যুনিস্ট পোল্যাণ্ডে তখন একটি ডলারের অনেক মূল্য। সেই মূল্যবান খাবার সে নিয়মিত আমাকে ভাগ নিতে বাধ্য করতো শুধু কথা বলার লোভে। তার আর আমার কথা বলার কোন শেষ হতো না, রাতে শুয়ে শুয়েও সেটি চলতো। শেষে দু'জনে চুক্তি করে চুপ করলেও কিছুক্ষণ পর আবার শুন্‌তে পেতাম– 'জান রাশিয়ানরা কেন আমাদের বন্ধু নয়, ওরা আমাদের ভাই, বন্ধু হলে আমরা বন্ধু বদলাতে পারতাম; ভাই হওয়াতেই মুশকিল হয়েছে, আমরা আট্‌কে গিয়েছি'। তোমাসের ওটাই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু, ঘুরেফিরেই পোল্যান্ডের ওপর রাশিয়ার বজ্রমুষ্টির নিয়ন্ত্রণের কথা আসতো।

সাধারণভাবে এটি যে জানতামনা তা নয়- কিন্তু তোমাস যেভাবে খুঁটিনাটিতে গিয়ে বুঝিয়ে দিতো যে পোল্যান্ডের নেতারা নেহাতই পুতুল নাচের পুতুল মাত্র– সব সূতা সোভিয়েত সরকারের হাতে ধরা। তার কথা হলো এটি যতটা না কম্যুনিজমের ব্যাপার তার থেকে অনেক বেশি হলো ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা পোল্যান্ডের ওপর রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী লোভ, সে জারের রাশিয়া হোক কি স্টালিনের রাশিয়া হোক। এই সুবাদে পোল্যান্ডের ইতিহাস সম্পর্কে তার ভাষ্যটাও আমার ভালোভাবে জানা হয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য উৎস থেকে আমার নিজেরও একটি ভাষ্য জানা ছিলো বলেই আমি তোমাসকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করতে পারছিলাম। এর কয়েক বছর পর ত্রিয়েস্তে তোমাসের সঙ্গে আবার যখন দেখা হয়েছে তখন শ্রমিক নেতা হিসেবে লেস ভালেসার (পরে দেশের প্রেসিডেন্ট) নেতৃত্বে 'সলিডারনোস' (সংহতি) শ্রমিক আন্দোলন ইতোমধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়ে শুধু পোল্যান্ড নয় পুরো পূর্ব ইউরোপের নতুন আবহ সৃষ্টি করেছিলো। সোৎসাহে আমাকে এ সম্পর্কে সর্বশেষ বার্তা দিতে তখন সে মোটেই দেরি করেনি। আমার দুঃখ হয় যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি উগ্র বেসুরো সদস্য হিসেবে আজকের পোল্যান্ডকে সে কীভাবে দেখছে তা আমার এই রুমমেট থেকে জানতে পারছি না, তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে।

রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটি ওখানে আমার আরও এক রুমমেটের মুখে অনেক শুনেছি– সে হলো ইথিওপিয়ার ছেলে হাইলে। হাইলে আর আমি শুধু বেশ কিছুদিন একই রুমে থাকিনি, বরং ইতালিতে এক সঙ্গে বেশ ভ্রমণও করেছি- প্রধানত বলোনিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে গিয়ে কাজ

করতে, তবে আশ পাশের আরও কিছু জায়গায়। সে বয়সে কিছু ছোট, সদ্য মস্কোর লুমুম্বা ইউনিভার্সিটি (আফ্রো-এশীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি করা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পাশ করে, ত্রিয়েস্তে মাস্টার্স করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। রাশিয়া তার ঝলোমলো জগত, অন্যরা যাই বলুক না কেন– ভালো রাশিয়ান শিখেছে, ওখানকার মানুষকে একেবারে রগে রগে চেনে। ত্রিয়েস্তে ও অন্যত্র দেখেছি সে রাশিয়ান পুরুষ বা মহিলাকে দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে দেখলেও ঠিক চিনতে পারে চেহারা দেখে, এবং অবশ্যই গিয়ে সোৎসাহে আলাপ জুড়ে দেয়। সে সময় ত্রিয়েস্তের পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রে বেশ কিছু রাশিয়ান বিজ্ঞানী ছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো রাশিয়ার প্রতি, এমনকি কম্যুনিজমের প্রতিও তার মোটামুটি একটু উৎসাহী মনোভঙ্গি থাকলেও তার নিজের দেশে তখন কম্যুনিস্ট পরিচয় দিয়ে যেই নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী মানুষটি জোর করে বহু বছর ধরে চেপে বসেছিলো সেই মেঙ্গিৎসু হাইলে মারিয়ামকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করতো। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও কিউবার সামরিক সাহায্যে মোঙ্গিৎসু যা করছিলেন, বিশেষ করে ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তার আড়ালে, তাতে হাইলের মতো স্বচ্ছ চিন্তার ছেলের তাঁকে সমর্থন করার কথা নয়। হাইলে বরং ইথোপিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গর্বিত, মনে করে মেঙ্গিৎসু সেই ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। আফ্রিকায় সভ্যতার লীলাভূমি হিসেবে, বিশেষ করে খৃষ্ট ধর্মের আদিতম রূপটি যে সেখানে এখনো বর্তমান এই বিষয়টিকে সে খুব গুরুত্ব দিয়ে আমাকে অনেক দিন বুঝিয়েছে। বেশ বুঝতাম যে তার ওপর লুমুম্বা ইউনিভার্সিটি খুব বেশি আসর করতে পারেনি।

রাশিয়া সম্পর্কে অন্য রুমমেটদের মুখে ঝাল প্রচুর খেলেও, খোদ রাশিয়ান রুমমেট পেয়েছিলাম অল্প কয়েকদিনের জন্য বোরিসকে। তার কথা কখনো ভুলবো না, কারণ সে যা করেছে তা আমার দেশের রুমমেটরাও করবে না। তখন সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সদ্য ভেঙ্গে গেছে, মনে হচ্ছিলো এর নতুন গণতান্ত্রিক হাওয়া দারুণ উপভোগ করছে বোরিস, টগবগে মুখরতায়। অল্প বয়সী এই তরুণকে আমার মনে হয়েছে যেন টলস্টয়ের উপন্যাসের আদর্শবাদী এক চরিত্র হিসেবে– শুধু উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ দেখে। একটি বিষয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিল– তা হলো ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখার মধ্যে আনন্দ পাওয়া। আসার সময় রাতের আকাশে বিমান থেকে ইস্তাম্বুল নগর ও সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোর রেখায় লক্ষ্য করেছি দার্দানালিস সরু প্রণালি কেমন করে কৃষ্ণ সাগরে যুক্ত হয়েছে, রাশিয়ার

দিকে। তাকে বলছিলাম রাশিয়ার ইতিহাসে আমার চোখ প্রথমে পড়েছিলো ঠিক এই জায়গাটির রহস্য নিয়ে– সেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধে গ্যালিপলিতে সৈন্য নামিয়ে ইংরেজদের দার্দানালিস নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা তুর্কীদের থেকে, 'বেটলশীপ পোটেমকিন' সিনেমা– সেই থেকে আমার সঙ্গে এখানকার ইতিহাস, ভূ-রাজনীতি আলাপ করে সে খুব আরাম পেয়েছে। কিন্তু হায় অল্প দিনেই আমার দেশে ফেরার পালা। রাস্তার যেখানে এয়ারপোর্ট যাওয়ার বাস থামে সেটি পাহাড়ি চড়াই-উৎরাইয়ে অনেক খানি হাঁটা পথ। ভোর চারটায় বাস ধরার জন্য রওয়ানা হবার সময় দেখি বোরিসও প্রস্তুত, আমাকে বাসে তুলে বিদায় দেবে। আমার অত্যন্ত ভারি সুটকেসের চাকা ওপথে সহজে টানা যাচ্ছিল না, সে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটি কাঁধে তুলে নিলো, পুরো পথ ওভাবে নিয়ে গেলো– সারাক্ষণ কথা একটুকুও থামেনি।

হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে খেতে নিজ দেশের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মজা করতে দেখেছি আলজেরিয়ার করিমকে, ত্রিয়েস্তে আমার অন্য এক রুমমেট। তার থেকে আমি জেনেছি যে তখনকার আলজেরীয় প্রেসিডেন্ট শাদলি বেনজাদিদকে দেশের সাধারণ লোকরা লোক-হাসানো ভালোমানুষ বলে মনে করে। আলজেরিয়ার একদলীয় শাসনে বেনজাদিদের প্রকৃতিও ছিল একনায়কের। বেন বেল্লা আর বুমেদীনের পর স্বাধীন আলজেরিয়ার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রথম দু'জনের ক্ষেত্রে এমন হাসির উদ্রেক করার মত কিছুই ছিলনা– বরং তার ঠিক বিপরীত, কড়া শাসনের জন্যই তাঁরা খ্যাত। হঠাৎ করে বুমেদীনের মৃত্যু হলে শক্তিশালীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের ফাঁকে বেনজাদিদ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন– সেই নিয়ে করিমের বেশ কিছু জোক। তাছাড়া বেনজাদিদের নানা ঘটনা নিয়ে, উক্তি ও আচরণ নিয়ে তার প্রচুর জোক্ ছিল। করিমের বলার ভঙ্গিটিও খুব মজার, জোকটি বলেই হাসতে হাসতে বার বার বলতো– 'ও শাদলি, ও শাদলি'। জোকের ভাণ্ডার শুনে মনে হতো এগুলো আলজেরিয়ায় তখন খুব প্রচলিত রাজনৈতিক জোক। তবে অন্তরঙ্গ প্রথম নাম শাদলি নাম ব্যবহার, আর সহমর্মিতায় বলার ভঙ্গি দেখে মনে হতো করিম আসলে বেনজাদিদকে মনে মনে পছন্দ করে। কঠিন ব্যক্তিত্বের বুমেদীনের বিপরীতে তাঁর নীতি পছন্দ করারই কথা, তিনি রাজনীতিকে কিছুটা উন্মুক্ত করেছিলেন এক দলীয় শাসনে আলজেরীয় মুক্তিযুদ্ধের জন্য সৃষ্ট দল এফএলএনের (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট) বাইরে অন্য দলকেও সৃষ্টি হতে দিয়ে। করিম ইংরেজি বলতো ফরাসি টানে– বেশ বোঝা যেতো ফরাসি তার মাতৃভাষা, আরবি

নয়। তার কাছে জেনেছি আলজেরিয়ায় শিক্ষিত, অভিজাত মহলের এমন প্রচুর মানুষ এখনো আছেন যাঁরা পুরো পরিবার শুধু ফরাসিতে কথা বলেন, যদিও আরবি জানেন। স্কুলে থাকা কালে আমি আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে তুঙ্গে উঠতে দেখেছি। এই যুদ্ধের নায়কদের শুধু সংগ্রামের কথা নয় নয় বিবাদ-বিসংবাদেরও খবর জানি– বেন বেল্লা, বেন খাদ্দা, বুমেদীন, বুতেফ্লিকা প্রমুখের কাহিনি তখন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতো– এসব শুনে করিম বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলো, তাতে তার দেশ নিয়ে গল্প করার আর জোক্ বলার উৎসাহ আরও বেড়েছে।

অন্য জায়গায়ও আমি ঘনিষ্ঠ রুমমেট পেয়েছিলাম– যেমন সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৭-৭৮ সালে এক বছর গবেষণার কাজ করার সময়। এ সময়টা বাকি আর চার জনের সঙ্গে হোষ্টেলের একটি 'করিডরে' আমার বাস ছিল। করিডর মানে হোস্টেলের এক একটি আপন অংশ, পাঁচজন মিলে একটিই রান্না-খাওয়া-বসার ঘর এবং একটিই টয়লেট ও একটি গোসলখানা, তবে প্রত্যেকের আলাদা রুম। সেই হিসেবে পরস্পরকে রুমমেট বলার কথা নয়, যদিও ওখানে তাই বলতো। সলিমুল্লাহ হলের ভাষায় বলা যেতো সিস্টার রুমমেট, পাশের রুমের বন্ধু। সিস্টার কথাটি আরও এক অর্থে সত্য ছিলো, সত্তর দশকের সুইডেনের সম্পূর্ণ লিঙ্গ বৈষম্যহীন নীতিতে ওই পাঁচজন হতো স্ত্রী-পুরুষ মেশানো। আমাদের করিডরে একজন মহিলা বিরগিত্তা, সে এবং একজন পুরুষ লারস সুইডিশ। বাকি নরেন (ভারতীয়), মোহাম্মদ (মিশরীয়), আর আমি। সবাই মিলে আমরা বিরগিত্তাকে নেতা বানিয়েছিলাম– সেই সাধারণ কাজগুলো ভাগ করে দিতো, নিজেও করতো, ঠিক মতো হলো কিনা খেয়াল রাখতো– বাথরুম পরিষ্কার, রান্নাঘর পরিষ্কার, ময়লা বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে আসা, সবার জন্য মাঝখানের বারান্দায় যে ফোনটি আছে তাতে কার কত পয়সা চার্জ হলো হিসেব করে আদায়, ইত্যাদি। তবে কেউ যেন মনে না করে করিডরে এইই বুঝি আমাদের একমাত্র যৌথ কাজ। ওই যে রান্না-খাওয়া-বসার ঘর সেখানকার নিত্য তর্কের হুল্লোড় শুনলে কেউ একথা বলবে না।

সুইডেনে সেসময় আর্থ-সামাজিক সাম্যনীতির কল্যাণ-রাষ্ট্র নিয়ে যে বিশাল পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিলো ওই রুমমেটদের মাধ্যমেই তা ভেতর থেকেই বুঝতে পারছিলাম। জেণ্ডার সাম্য, মা-শিশুদের জন্য রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব আত্মনিয়োগ, সবার স্বাস্থ্যসেবাকে একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া, কাউকে দরিদ্র থাকতে না দেয়া, ইত্যাদিকে অনেক দিক থেকে দেখার সুযোগ ছিল, এবং তাই খাওয়ার ঘরের আড্ডায় আমরা দেখছিলাম,

যেহেতু নানা দেশের মানুষ। সখ করে সুইডিশ ভাষা কোর্স করে শেখার চেষ্টা করছিলাম, এখানে সেটি ইচ্ছে হলে নিরাপদে প্র্যাকটিস করা যেতো। পরস্পরের অদ্ভুত কায়দা-কানুন বেশ কিছু মেনেও নিতে হতো। বছরের অধিকাংশ সময় চারিদিকে বরফ থাকা সুইডেনে স্কী করতে জানাটি অবশ্য কর্তব্য– কাজেই আমার স্কী প্রশিক্ষক হিসেবে বিরগিত্তাকে করিডরেই পাওয়া গেলো আপাতত। শুধু প্রশিক্ষণ নয়, স্কীর পোষাক, স্কী জিনিসটাই তার নিজেরগুলোই আমার গায়ে-পায়ে ফিট করিয়ে নিতে হলো; সিস্টার রুমমেট বলে কথা। সুইডিশ হাই-স্কুলে নবজাতকের যত্ন বিষয়ক যে অত্যন্ত বিস্তারিত কোর্স প্র্যাকটিকালসহ করতে হয়েছে, আর ইউনিভার্সিটিতে সন্তান মানুষ করার জন্য শিশু মনস্তত্ত্বের, সেগুলো লারস কেমন উপভোগ করেছে, কতখানি কাজে আসবে বলে মনে করছে তা জানার জন্য তাকে কম উত্যক্ত করিনি। স্ত্রীর সনাতন কাজগুলো পুরুষকে শিক্ষা দেয়া আর পুরুষের সনাতন কাজগুলো স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া তখন ছিল সুইডিশ এক্সপেরিমেন্টের অন্যতম বিষয়। ড্যানিশ, নরওয়েজিয়ান আর সুইডিশরা এত কাছের একই ধাঁচের, প্রায় একই ভাষার ও সংস্কৃতির হলেও তাদের একের অপরের সমালোচনায় যে এত কথা আছে যে তা এদের কাছে না শুনলে বিশ্বাস হতো না। এটি অবশ্য বেশি হতো বিরগিত্তার বান্ধবী সোফিয়ার কারণে– সে পাশের আর এক দেশ ফিনল্যান্ডের মেয়ে, যাদের সঙ্গে সুইডিশদের অদ্ভুত এক মিশ্র সম্পর্ক। সোফিয়া আমাদের করিডরের প্রায় সদস্যই হয়ে পড়েছিলো। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়, তার ঝাড়ি খেতে হয়েছে, সে কোন্ দেশের মেয়ে জিজ্ঞেস করাতে। তার কথা হলো 'তোমার চোখ নেই, তুমি আমার চোয়ালের দুই পাশের দুই বিশাল হাড্ডি দেখতে পাচ্ছ না, ফিনিশ ছাড়া এটি আর কারো মধ্যে দেখা যায় নাকি?' সুইডিশদের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করিয়ে দিতে তার জুড়ি নেই। সুইডিশদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি কেন? যা বেরিয়ে এলো তা হলো তাদের একা থাকার প্রবণতা। সোফিয়া বলে এই যে পুরো দেশ জুড়ে বিশাল বিশাল হ্রদের ওপরটা বছরের একটি বড় সময় শক্ত বরফ হয়ে থাকে, তার একেবারে মাঝে একাকী সারাদিন স্কী করাটাই হলো সুইডিশের কাছে সব থেকে তৃপ্তিকর কাজ, বিশেষ করে সুইডিশ পুরুষের।

বাড়তি একটি পাসপোর্ট:

যে পাসপোর্টটি সবার রয়েছে তা দিয়ে অন্য দেশের সীমানা পার হওয়া

যায়, সেই দেশ দেখা যায়। কিন্তু বরাবর আমার আকাঙ্ক্ষাটি একটু বেশি ছিল, ওই দেশের অন্তত অল্প কিছু নতুন বন্ধুর মনের সীমানাটাও পার হওয়া– সে জন্য একটি বাড়তি পাসপোর্ট লাগতো, তা হলো তাদের সম্পর্কে আগ্রহ এবং সেই আগ্রহ প্রমাণ করতে এলোমেলোভাবে হলেও কিছুটা তথ্য। আমার ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো আসতো ইতিহাস আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর রূপ ধরে, কারণ এই দুটিতেই আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। বড় ছোট যে কোন দেশের খবরের সঙ্গে নিজেদের কোন সম্পর্ক দেখা আমাকে আনন্দ দিতো স্কুলজীবন থেকেই– এ খবরগুলো একের সঙ্গে অন্য যোগ করার অভ্যাসও আমার তখন থেকে। এই কাজে সহায়ক হয়েছিলো জওহরলাল নেহরুর 'বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ' অথবা এইচ জি ওয়েল্‌সের 'এ্যা শর্ট হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড' এমনি ধারার বইগুলো দুইয়ে দুইয়ে মিলিয়ে চার করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। সব কিছু যে ইতিহাস নাম নিয়ে এসেছে তাও নয়। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় দৈনন্দিন অগ্রগতি নিয়ে উইনস্টন চার্চিলের চার খণ্ড যে বই তা যুদ্ধের রণ-কৌশল আর দলিল-পত্রে ভর্তি, অথচ তাতে লুকিয়ে রয়েছে অনেকগুলো দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস। টি ই লরেন্সের (লরেন্স অব এ্যারাবিয়া) সেভেন পিলার্স অফ উইসডম নামের বড় বইটি থেকে আরব দেশগুলোর সাম্প্রতিক ইতিহাসের আরবদের দৃষ্টিভঙ্গিটি কিছু পাওয়া যায়, অথচ এটি একটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের মত বই। অংক বা বিজ্ঞান যেভাবে মানুষ একটির ওপর আরেকটি জমিয়ে জমিয়ে গড়ে, আমার এ ইতিহাস জানা এভাবেই জমেছে। যখন কোথাও যাই সেটিই একটি বাড়তি পাসপোর্ট হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস সম্পর্কে একটু ধারণা থাকলে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোও যেন কিছুটা খাপে খাপে পড়ে যায়। আসলে ইতিহাস তো এসব ঘটনা নিয়েই গড়া হয়– এখনকার সমসাময়িক সব ঘটনা নিয়ে।

এই বাড়তি পাসপোর্টটি কীভাবে কাজ করে তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বেশ কয়েকদিনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় গিয়েছিলাম সৌরশক্তি সম্পর্কে একটি সম্মেলনে। আমেরিকান এক তরুণ পলকে চিনতাম– নেপালে থাকে, সেখানে তার সৌর শক্তি ছোট সিস্টেম বিক্রয়ের একটি কোম্পানি আছে। জাকার্তায় দেখা হওয়ার পর জানলাম সে ইতোমধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং সেটিই তাকে তখন অভিভূত করে রেখেছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের দেশের বা বার্মার বা সিংহলের পরিচিত বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ভিন্ন– এটি বজ্রায়ন মন্ত্র-সিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম যা তিব্বতে অনুসৃত হয় ও কিছুটা মঙ্গোলিয়ায় দেখা যায়। পলের মুখেই

এর নানা বৈশিষ্ট শুনলাম যেগুলো তাকে মুগ্ধ করেছে– আমাকে এ ধর্মের রীতি অনুযায়ী খুব যত্ন করে একটি সাদা চাদর আমার গায়ে জড়িয়ে দিলো– যেটি তিব্বত থেকে আনা। খুব সম্ভব একই প্রেরণাতেই পল ইন্দোনেশিয়ার একজন আধ্যাত্মিক গুরুর খুব ভক্ত– সেখানে কনফারেন্সের একদিন ছুটির সুযোগে আমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। এই গুরু খুবই উদারমনা অসংখ্য ইন্দোনেশীয় তরুণ তরুণীদের মধ্যমণি, তাদের জন্য একটি এনজিও গড়ে তুলেছেন শান্তি, জীবদয়া, দরিদ্রসেবার ব্রতে। জাকার্তা থেকে বেশ দূরে জাভা দ্বীপের এক গ্রামে ওই গুরুর কেন্দ্রে যাওয়ার লোভ সামলাতে পালাম না। লোকাল ট্রেনের অসম্ভব ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাভা দ্বীপটির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখছিলাম; গ্রাম্য একটি স্টেশনে নেমে বাইরে দাঁড়ানো কয়েকটি ভাড়ায় যাওয়া মোটর সাইকেলের পেছনের সিটে পল চড়ে বসলো, আর আমাকে আর একটিতে চড়তে ইঙ্গিত করলো। ওভাবেই গ্রামের আধা পাকা রাস্তা দিয়ে অনেক্ষণ গিয়ে ওই আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে বা আশ্রমে এসে হাজির হলাম।

ইন্দোনেশিয়াকে আসল চেনা শুরু হলো ওখানে অনেক তরুণ-তরুণীর জমজমাট আড্ডার মধ্যে গিয়ে। গুরু এখন নেই, তেমন কোন কাজও নেই কারো, কাজেই নির্ভেজাল আড্ডা। সবাই যে একেবারে তরুণ তাও নয়, নানা বয়সীও কেউ কেউ আছে। আপাতত আধ্যাত্মিকতার নাম গন্ধও তেমন দেখলামনা– প্রধান বিষয় টাটকা ইন্দোনেশীয় পলিটিক্স। ওটির তখন একটি লটঘট্ অবস্থা– একনায়ক সুহার্তোর দীর্ঘ দিনের স্টিম রোলার শাসন সদ্য শেষ হয়েছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকল্প নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে। তখনকার প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ওয়াহিদ 'নাহিদাতুন ওলামা' নামক পার্টির নেতা, কোয়ালিশন সমঝোতার অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তাঁকে ডাকনাম গুজদুর হিসেবেই সবাই চেনে, চোখ প্রায় অন্ধ; তাঁর সম্পর্কে সবারই নানা বক্তব্য ছিল। গণতন্ত্রপন্থী অন্য নেতারাও তীব্র প্রতিযোগিতায় ছিলেন– সুকর্ণপুত্রী, হাবিবী এঁরা পরে দু'জনেই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। সুকর্ণ আমাদের দেশে পরিচিত নাম– ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের বড় নেতা, দীর্ঘকাল এদেশের কর্ণধার, জোট নিরেপক্ষ রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে বান্দুং সংহতির একজন উদ্যোক্তা। কিন্তু তাঁর মেয়ে সুকর্ণপুত্রীর রাজনীতির কথা এখানে শুনলাম। ইন্দোনেশিয়ার এর কিছু আগের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো অবশ্য আমার জন্য বেদনাদায়ক ছিল– বিশেষ করে ১৯৬৬ সালে সুহার্তো প্রমুখ সেনা নায়কদের ক্ষমতা দখল করে কম্যুনিস্ট হত্যাযজ্ঞ। দেশব্যাপী কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ সদস্য ও সমর্থকদেরকে পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে ৫ থেকে

১০ লক্ষ মানুষের নির্মম হত্যা– সে সময় আমিও ছিলাম বামপন্থী ছাত্র নেতা, সলিমুল্লাহ হলের ভিপি, কাজেই এসব খবর আমাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বেদনা সৃষ্টি করে। ওই হত্যাযজ্ঞের সময় ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নিহত প্রধান নেতা দ্বীপ আহমদ আইদিতের সম্পর্কেও জানা আছে একথা বুঝতে পারার পর আমাকে বাইরের কেউ মনে করার সুযোগ ছিলনা– আমার বাড়তি পাসপোর্টটি সেখানে আমার প্রবেশাধিকারটি ভালোভাবেই দিয়েছিলো।

আড্ডা যখন তাৎক্ষণিক পলিটিক্স ছেড়ে ইন্দোনেশীয় কালচারের দিকে এগুলো প্রবেশাধিকারটি আরও ভালো হলো। এখানকার মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মীয় মহাকাব্যগুলোর নানা চরিত্রের নাম যে জড়িয়ে আছে সেটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক– যেমন সুকর্ণ নিজের নামটাই মহাভারতের, বা জাতীয় বিমান সংস্থা 'গরুড়' রামায়ণ থেকে– এর উদাহরণ ভুরি ভুরি। সেই নবম শতাব্দীর হিন্দু-বৌদ্ধ 'মাতরম' সভ্যতা ও সাম্রাজ্য এবং আরও বহু পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'মাজপাহিত' হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্য এই দুইয়ের প্রভাবেই এখনকার মুসলিম সংস্কৃতিতেও সেই প্রভাব প্রচুর রয়ে গেছে বিশেষ করে ভাষায়, উপকথায়, নামকরণে, সাংস্কৃতিক সব উপমা, চিহ্ন ইত্যাদিতে। এটি আমার মত ভারতীয় পটভূমির মানুষের জন্য আড্ডার ভালো সুযোগ দিয়েছে। এই আধ্যাত্মিক নেতার প্রভাবে আড্ডার মানুষগুলোর মধ্যে আধুনিক ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা ছিল, ওটি আবার ওদেশের পলিটিক্সে তখন একটি বড় শক্তি। সুকর্ণ যে জাতীয়তাবাদী, ইসলামি, ও কম্যুনিস্টদেরকে 'নাসাকম' (তিনটির আদ্যাক্ষর নিয়ে) নামের ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিতে আনার অদ্ভুত চেষ্টা করেছিলেন নিজের জন্য ব্যাপক সমর্থন আদায় করতে সেই প্রসঙ্গটি আমিই তুললাম– কারণ যে সময় আমাদের ছাত্র রাজনীতির কাছে একে অসম্ভব জগাখিচুড়ি মনে হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত এটি তাই বলেই প্রমাণিত হয়েছিলো।

জনগণের কূটনীতি

প্রত্যেকেই দেশের দূতঃ

নেহাৎ পরিচিত হয়ে যাওয়াতে বাংলায় কূটনীতি শব্দটি এখানে ব্যবহার করতে হলো, নইলে শব্দটির আমি ঘোরতর বিপক্ষে; কূটচাল, কূটবুদ্ধি, এই সব অর্থেই আমরা কূট কথাটিতে অভ্যস্ত– এটি রাষ্ট্রীয় কোন নীতির অংশ হতে যাবে কেন? তাই ইংরেজি ডিপ্লোম্যাসি শব্দটির নতুন অনুবাদের সুযোগ থাকলে আমি করতাম মিলন-নীতি– অন্য দেশের সঙ্গে যথাসম্ভব মিল-

মহব্বত সৃষ্টির প্রচেষ্টা। বহুদিন ধরেই বিশ্ব-শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তাশীল মানুষরা অনুভব করেছেন যে দেশে দেশে পররাষ্ট্র বিভাগগুলো যে ধরণের কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় তা আজকের দিনের প্রয়োজনের দিক থেকে মোটেই যথেষ্ট নয়, আসলে কখনোই এটি আদর্শ কোন ব্যাপার ছিল না। কূটনৈতিক তৎপরতা সাধারণত তার অত্যন্ত নিয়ম-কানুনে ঘেরা আনুষ্ঠানিকতা ও গোপনীয়তার জন্য বিখ্যাত। অনেক রাষ্ট্রনায়কও ঠেকে ঠেকে বুঝেছেন যে দুই দেশের মানুষের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে না উঠলে এসব আনুষ্ঠানিক তৎপরতা শেষ পর্যন্ত সার্থকও হয় না, স্থায়ীও হয় না, কারণ সম্পর্কটি বিশেষ সরকার পর্যায়ে ওপরে ওপরেই থেকে যায়, কখনো গভীরতা পায় না। সে জন্যই জনগণের কূটনীতির ধারণাটি বেশ আগে থেকেই এসেছে।

জনগণ বললে যে রকম রাজনৈতিক জনতার কথা মনে পড়ে এটি সে রকম কিছু নয়। বরং এর সঙ্গে মিল বেশি নাগরিক-কূটনীতিকের সঙ্গে, ওই নাগরিক-বিজ্ঞানী ইত্যাদির মত– অন্য দেশের সমমনা মানুষদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সেতুবন্ধ স্থাপনটিই এখানে বড় কথা। নিজের জীবন, নিজের শহর বা গ্রাম, নিজের পেশা, সুখদুঃখ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি তাদের কাছে অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরা ও তাদেরগুলোরও জানার জন্য উৎসাহ দেখানো। দুদেশের পরস্পর সম্পর্কে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকলেওওই বন্ধুদের মধ্যে তা থাকবে না। বিরোধের বিষয় নিয়ে আলাপ করে যাওয়াও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের আবহেই সবচেয়ে ভালো করা সম্ভব। এদেশের অনেক মানুষ যদি ওদেশের অনেক মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত এমনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক চালিয়ে যায় তাহলে এটিই ধীরে ধীরে জনগণের সাধারণ চিন্তাভাবনার অংশে পরিণত হতে পারে। কেউ যে কূটনৈতিক আলোচনার জন্যই এটি করবেন তা নয় বরং অন্য দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সব সময় আসা-যাওয়া, কাজের সহযোগিতা, এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য এগুলো ঘট্‌বে।

যদি ওই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব যাঁরা করছেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি হয় তা হলে এটি আরও সহজে জনগণের মধ্যে ছড়াবে। তবে সাধারণ পর্যটক, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, শিল্পী, খেলোয়াড়, ব্যবসায়ী, অভিযাত্রী– তাঁরাও হতে পারেন এক এক চমৎকার কার্যকর রাষ্ট্রদূত। ওদের সংখ্যা ও কাজ যত বাড়বে, সম্মিলিত ফলগুলো যত সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে ততই দু'দেশের মানুষ পরস্পরের কাছে আসবে। তারাই পারস্পরিক বিষয়গুলোতে উভয় দেশের মানুষের উপকার যাতে হয় সেদিকে

লক্ষ্য রাখবে। উভয় দেশের কোন কায়েমী স্বার্থের উপকারের জন্য নয়, বরং সে রকম কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার যাতে না ঘটে সে জন্য অন্য দেশের বন্ধুদের পাশে দাঁড়াবে।

দেখা যায় যে ঐতিহাসিকভাবে বৈরি দুই দেশের মধ্যেও এভাবে জনগণের মৈত্রী তৈরি হয়ে গেছে যার ফলে দু'দেশের ভেতরের কেউ বা তার বাইরের অন্য কেউ সেই ঐতিহাসিক বৈরিতার সুযোগ সহজে নিতে পারে না। অনেক মানুষের একেবারেই ব্যক্তিগত অভ্যাস থেকেই এটি গড়ে উঠতে পারে, যেমন কাজ উপলক্ষে বা বেড়াতে বিদেশেগেলে সেখানকার মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার প্রবণতা, বন্ধু সৃষ্টির প্রবণতা; নিজের দেশে যে সব বিদেশির সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটে তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করার প্রবণতা– যেমন বাড়িতে বা কর্মস্থলে দাওয়াত করে, তাকে তার কাজে সহায়তা দিয়ে ইত্যাদি। প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উভয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ তো দুভাবেই হতে পারে– একটিতে কাজের জন্য যতটা কাছে যাওয়া দরকার ততটাই গেলাম, বিদেশিকে বিদেশি হিসেবেই খাতির করলাম– দূরত্ব বজায় রেখে; অন্যটিতে কাজকে বরং কাছাকাছি যাওয়ার একটি সুযোগ হিসেবে নিলাম, পরস্পরের যে নতুনত্ব ও যে বৈচিত্র তাকেও উপভোগ করলাম, উভয়ের বন্ধুত্বের ও জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃত করলাম। এই শেষোক্তি মনোবৃত্তি থেকেই জনগণের কূটনীতির জন্ম হয়। এর মধ্যে থাকে দু'দেশের মধ্যে আসা যাওয়া, পরস্পরের দেশে লেখাপড়া করা ও কাজ করা, ওদেশে জীবনের কোন একটি সময় কাটানো, নিত্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগ– বিশেষ করে তারুণ্যের সময়। দেশের স্কুল-কলেজে শিক্ষাক্রমের মধ্যে পরস্পরের মানুষ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্জন সম্পর্কে বিষয় মমতার সঙ্গে থাকা ওই মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করবে।

দু'দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের দিক থেকে বেশ কার্যকর হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিওদের সংযোগ। এদেশের গরিব মানুষ ওদেশের গরিব মানুষের মধ্যে যে ঐক্য, দু'দেশের একই সমাজে সমস্যার যে মিল তাকে গুরুত্ব দিয়ে ওরা উভয় দেশে কাজ করে, এক দেশের সাফল্য অন্য দেশের ওপর প্রয়োগ করে দেখার চেষ্টা করে। একই রকম সহযোগিতা দুই দেশের নারী-শিশু-প্রতিবন্ধীদের সমস্যা, শিক্ষা বিস্তার, দুর্যোগে আত্মরক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি নানা বিষয়ে হতে পারে, এবং এসবের মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সংহতি সৃষ্ট হয় তার কোন তুলনা হয় না। মানুষের কাছে অন্য দেশের কোন সেবা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে তার আন্তরিক সেবার জন্য এর কর্মীরা হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ত আপন জন। কখনো

কোন দেশে কোন নির্যাতিতরা যদি রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয় এবং তখন তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করে অন্য দেশের মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে– এগুলো মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। এমনি বন্ধন সৃষ্টি হলে অন্তত সাধারণ মানুষ মনে করতে পারেনা ওটি একটি বৈরি দেশ হতে পারে। বরং মনে করবে কোথাও একটি ভুল বুঝাবুঝি আছে, বা তাদেরকে কেউ ভুল বুঝাচ্ছে; আর সে রকম কোন স্বার্থের বিরোধ দু'দেশের মধ্যে থাকলেও সে বিরোধে নিয়ে যুদ্ধংদেহি হবার থেকে সে বিরোধ মিটাবার চেষ্টার দিকেই তাদের আগ্রহ থাকবে বেশি। অন্য দেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দ্বারাই সে দেশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা সৃষ্টি হয়, ওই দেশের সরকারের দ্বারা নয়।

এগুলো কোন তাত্ত্বিক কথা নয়, বা জ্ঞানীগুণীদের আপ্তবাক্য মাত্র নয়– দেশে দেশে সম্পর্ক এভাবে উন্নত হবার প্রচুর উদাহরণ আছে। রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক যখন খুব আড়ষ্ট হয়ে যায় তখন এই জনগণের কূটনীতিই সম্পর্কটি ধরে রাখতে পারে। এটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে যে সব দেশের মধ্যে বিরোধের কারণে কূটনৈতিক সম্পর্কটুকুও নাই সে সব ক্ষেত্রে। তখন ব্যক্তি পর্যায়ে, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়– যেমন ইরানের সঙ্গে, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর নিত্য যোগাযোগ এভাবেই হচ্ছে। ইরানের ক্ষেত্রে শত বিরোধ সত্ত্বেও ওখান থেকে ছাত্রদের পড়তে আসা, বেশ নাম করা ইরানি পরিচালকদের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও জনপ্রিয় হওয়া এগুলো চমৎকার একটি সম্পর্ক ধরে রেখেছে- কারো কাছে সেই অর্থে ইরান অপরিচিত দেশ নয় বা তার মানুষদের দেখে মুগ্ধ হওয়াটি অবাক হবার কোন ব্যাপার নয়। এসবের সূত্র ধরেই সম্পর্কগুলো আবার গড়ে উঠতে পারে।

সমৃদ্ধ দেশগুলো অন্যান্য দেশে তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করে আসছে বহুদিন ধরে– আমাদের দেশের বৃটিশ কাউন্সিল, আমেরিকান সেন্টার, অলিয়েঁজ ফ্রান্স (ফ্রান্সের), গোয়েতে ইন্‌স্টিটিউট (জার্মানির) তার বিশিষ্ট উদাহরণ। ছোটবেলা থেকে এরকম দু'একটির লাইব্রেরী ও ফিল্ম শো আমার নিজের জীবনকে যথেষ্ট ঝলোমলো করেছে, এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত বড় বেলাকেও করেছে। ওখানে এতদিন তাদের নিজ দেশের প্রচারধর্মিতাটি পশ্চাদপটে ছিলো, মুখ্য কাজ ছিল স্থানীয় মানুষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবা দেয়া– বই পড়া, ভাষা শেখা, সাংস্কৃতিক অবগাহন করা। এখন সেটি বদলে গেছে, সেবা কমে গেছে, প্রচার বেড়েছে– বিশেষ করে

নিজ দেশের বাণিজ্যের প্রচার। হয়তো তাদের রাষ্ট্রীয় নীতি এখন সেবার থেকে লাভজনকতার দিকে বেশি। কিন্তু সেবার বিনিময়ে তা করা সম্পর্ক সৃষ্টিতে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এখন এই সেবার কাজটি রাষ্ট্রীয় নয় জনগণের কূটনীতিই নিতে পারে, তাও এক পাক্ষিকভাবে নয়, দ্বিপাক্ষিকভাবে। এনজিও বা অন্য যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেই সেবা ভালো দিতে পারে তা নিজ দেশেও দেবে, অন্য দেশেও দেবে, কখনো সে দেশের সমমনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে। ওভাবেই তারা পৌঁছে যাবে পরস্পরের দেশের মানুষের মনের মধ্যে। উভয় সরকারের উচিত এমনি ভাবে সেবা দিতে যেতে ও আসতে সব প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ করে দেয়া, বা বাধা প্রত্যাহার করা। এটি দেশে দেশে মিলন সৃষ্টিতে ম্যাজিকের মত কাজ করবে।

অনেক সময় সরকার নিজে সম্পর্ক রাখতে পারেনা বলে বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগের পথটি খোলা রাখে। যেমন চীনে সব কিছুর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বেশি হলেও সেখানে সরকারই এক ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যাকে বলা হয় সরকার আয়োজিত বেসরকারি সংস্থা (GONGO)। এদের অনেকখানি স্বাধীনতা রয়েছে বিদেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার। এর সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে বহু কর্মকাণ্ড গড়ে তুলতে পেরেছে যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, বৈজ্ঞানিক তথ্য বিনিময়, মানব কল্যাণ এমনকি মানবাধিকার রক্ষার মত বিষয়গুলোতে পর্যন্ত সহযোগিতার সুযোগ আছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের অনেক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও। এই সুযোগটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখন সেভাবে নিচ্ছে না, উভয় পক্ষ সেখানে আড়ষ্ট শুধু নয়, বরং সক্রিয়ভাবে অন্যান্য দেশে পরস্পর বিরোধী প্রভাব বলয় গড়ে তোলায় রত। কিন্তু সেখানেও সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলনে পরিবেশ সচেতন মানুষদের মধ্যে সচেতনতার ঐক্য দেখা গেছে এই উভয় দেশের দিকে থেকেই, যার ফলে এদিকে কিছু অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। একে জনগণের কূটনীতির সাফল্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আরব-ইসরায়েল সমস্যা, তিব্বত সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদির মত বিষয় যেখানে রাষ্ট্রীয় কূটনীতি হাল ছেড়ে দিয়ে রেখেছে বহুদিন, সেখানেও কিন্তু মানুষে মানুষে যোগাযোগ ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোকে অনেক গুণে বাড়ানো সম্ভব একেই কখনো বলা হয় জনগণের কূটনীতি, কখনো বেসরকারি উদ্যোগের কূটনীতি, কখনো নাগরিক কূটনীতি, কখনো দ্বিতীয় প্রবাহের কূটনীতি। এদের একটিই বৈশিষ্ট– এরা

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থেকে আসেনি, সাধারণ মানুষের হৃদয় থেকে এসেছে। ওই যে বলা হয় আমরা প্রত্যেকেই বিদেশে গেলে হয়ে উঠ্‌তে পারি দেশের এক এক জন দূত– কথাটিকে কিন্তু আমার কাছে কখনো অতিরঞ্জিত মনে হয়নি। মানুষ কিন্তু অন্য কোন দেশকে বিবেচনা করে সে দেশের যে দু'একজন মানুষকে তিনি নিজে দেখেছেন তাদের নিরিখেই। সে ক্ষেত্রে একজন সাধারণ ভ্রমণকারী বা কর্মীও তাঁর আচরণ, মর্যাদাবোধ, সহমর্মিতা দিয়ে নিজ দেশ সম্পর্কে অন্যের ধারণাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে পারেন।

রাষ্ট্রাচার বনাম হৃদয়-বন্ধনঃ

আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে রাষ্ট্রীয় যে কূটনীতি তাকে ইচ্ছে করেই সব সময় মানুষের খোলামেলা ছোঁয়ার থেকে দূরে রাখা হয়েছে; আর অন্য সব কিছুর সঙ্গে অতিরিক্ত সব আনুষ্ঠানিকতা ও রাষ্ট্রাচার সৃষ্টিও এর একটি পদ্ধতি। ঔপনিবেশিক যুগের বহু পর আজও রাষ্ট্রদূতকে হিজ এক্সেলেন্সি, হার এক্সেলেন্সি, মহামান্য ইত্যাদি সম্বোধন, সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের বিদেশ সফরের সঙ্গে গার্ড অব অনার ইত্যাদি নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রায় বাধ্যতামূলক হওয়া, কার সঙ্গে কে কথা বলতে পারেন তার একেবারে চুলচেরা নিয়ম এসবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মর্যাদাকে উচ্চে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয় বটে, কিন্তু এতে দূরত্বও বাড়ে। যেখানে যাচ্ছি তার পুরো দেশটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে আমি বিদেশ থেকে এসেছি, আমাকে ও আমার দেশকে সমঝে চলবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পাল তোলা জাহাজের দিনলিপি পড়ে দেখেছি পশ্চিমা বড় বণিক ও রাজপুরুষরা যখন দুনিয়ার নানা সমুদ্রে পাড়ি দিতেন তখন বিভিন্ন বন্দরে তাঁদের ঢোকার ও ছেড়ে যাওয়ার সময় কতবার কামান দাগার স্যালুট দেয়া হলো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে করা হতো। দশবার, না একুশবার, না অন্য কোন সংখ্যা সেটি মনোপূত না হলে তাঁরা সেই বন্দর বয়কট করতেন। সে সময় দেশে দেশে সম্পর্ক এসব দিয়ে নির্ধারিত হতো। আজও হয়তো সরকারগুলোর মধ্যে তা হয়, কিন্তু জনগণের সম্পর্ক কি এখন এভাবে নির্ধারিত হয়? জনগণের কূটনীতির সুবিধাই হলো যে তাতে এসবের বালাই নেই, চট্ করে সোজা মনের কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়, এবং চেষ্টা করলে এমন বোধও জন্মানো যায় যে আমরা একই গ্রামের ছেলে। আমার মনে হয় রাষ্ট্রীয়কূটনীতি ও জনগণের কূটনীতিকে এতটা আলাদা হিসেবে না রেখে প্রথমটি কিছুটা দ্বিতীয়টির মত হয়ে উঠ্‌লে

ভালোই হতো। সাম্প্রতিক সময়ের কথা যদি বলি যে বৃটেনের রাজতন্ত্রকে বা বৃটেনকেও যতটা একজন প্রিন্সেস ডায়ানা নানা দেশে গ্রহণযোগ্য করতে পেরেছেন, রাজতন্ত্রের যত শান-শওকত কি তা করতে পেরেছে? হাসপাতালে শিশুদেরকে আপন ভাবে আদর করে, বিপজ্জনক মাইন ক্ষেত্রের মধ্যে মাইন-উদ্ঘাটক যন্ত্র হাতে নিয়ে মাইন-সরানো সৈনিকদের মতই হেঁটে, আর এইড্স রোগীদের সঙ্গে হ্যান্ড শেইক করে, এবং এর সব কটি হৃদয় থেকেই করছেন এমন গ্রতীতী জন্মিয়ে তিনি এটি সম্ভব করেছেন।

অবশ্য যেখানে জনগণের কূটনীতির একটি স্বীকৃতি আছে সেখানেও রাষ্ট্রীয় কূটনীতিকেই আসল কাজ বলে মনে করা হয়, জনগণের কূটনীতি বড়জোর তাকে কিছুটা সাহায্য করে এমনটিই মনে করা হয়। যুক্তি হলো রাষ্ট্রীয় কূটনীতি দেশের সরকারি পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের উপায়, জনগণের নীতি সর্বাংশে তা নয়, এটি কোন নীতিই হয়তো মেনে চলে না। রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে যা সিদ্ধান্ত হয় তা বাস্তবায়নের সুযোগ আছে, ব্যক্তি বা বেসরকারি পর্যায়ে কে কাকে কী বললো তার বাস্তবায়নের গ্যারান্টি কোথায়? ওখানে শত লোক শতভাবে সম্পর্ক গড়ছে, সবার কাজ যে এক লক্ষ্যে হচ্ছে তাও নয়; এমনকি এগুলোর কোন কোনটি সরকারি নীতির বিরুদ্ধেও যেতে পারে। আমার মনে হয়েছে এসব কথা ওঠে তার কারণ জনগণের কূটনীতিকে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির একটি উপাঙ্গ মাত্র হিসেবে দেখার প্রবণতা থেকে– যেন রাষ্ট্রীয় যখন যা সিদ্ধান্ত হবে তার ওপর জোর দেবার জন্যই জনগণও কাজ করবে, কখনো যেন তার অতিরিক্ত কিছু না হয়। এমনই যদি হয় তা হলে বেসরকারি মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নিজে তাতে কী অবদান রাখবে? তাই জনগণের কূটনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে মনের টানে তারা সম্পর্ক উন্নত করার জন্য তাদের মত করে যতটুকু করতে পারে তা করতে দেয়া উচিত– যে কাজ দু দেশের সরকার-কেন্দ্রিক না হয়ে দুই দেশের মানুষ-কেন্দ্রিক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জনগণের সহায়তা নিয়ে সম্পর্কের অবাস্তবতাকে কমিয়ে আনা যায়, বিশেষ করে যাঁরা বা যে সব প্রতিষ্ঠান ওই বিদেশে বেশি জনপ্রিয়, বন্ধু সুলভ কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন, ওখানকার জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছেন তাঁরাই সেখানে বোঝাতে পারেন সমাধানটি দুই পক্ষের জন্য সুখকর উপায়ে কীভাবে করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে উভয়ের প্রয়োজনীয়তাটি কীভাবে এক জায়গায় আনা যায়? এই অনুসন্ধানে উভয় দেশের জনগণের কূটনীতিবিদরা এক সঙ্গে কাজ করবেন। আপাতত যদি তাঁদের চেষ্টাও সফল না হয় তাহলে অন্য নানাভাবে নানা মানুষ আলাপ

চালিয়ে নেবে, আরও নানা বিকল্প ভেবে বের করবে। ইতোমধ্যে এমন একটি স্থিতাবস্থার পরিস্থিতি বজায় রাখবে যাতে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপাতত দুপক্ষের জন্যই কাজ চলতে পারে।

উভয়দিকের জনগণ যদি আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয় তা হলে সরকার দুটি যত আন্তরিকতাই ঘোষণা করুক তাতে কোন কাজ হবে না। পুরো ব্যাপারটিই সাধারণ সব মানুষের মনের ধারণার ব্যাপার, যা তাঁরা দেখছেন, পাচ্ছেন তাকে সরল বিশ্বাসে আপাতত খুশি মনে মেনে নিয়ে উৎসাহ সহকারে সমাধানের চেষ্টা করার ব্যাপার। ওই চেষ্টার সব কিছু দুই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে করছে এই বিশ্বাস জন্মানোর ওপরেই সব নির্ভর করবে। কোন অবস্থাতেই কারো কাছ থেকে অন্য দেশের মানুষের প্রতি অবন্ধুসুলভ আচরণ মানুষ মেনে না নিলে সেটি সহজে হতে পারবে। অন্তত গণতান্ত্রিক আবহে এমনটি হবার কথাও নয়। সব মানুষকে দেশকাল পাত্র ভেদে অন্য দেশের মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ করাটাই জনগণের কূটনীতির মূল লক্ষ্য। যখন বলা হয় জনগণের কূটনীতির কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই; এক এক জন বা এক এক প্রতিষ্ঠান এক এক দিকে, এক এক বিষয়ের ওপর, গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে তখন সে কথার উত্তর হলো ওই দেশের মানুষের প্রতি বন্ধু সুলভ হওয়াটাই তাদের সবার নীতি। বলতে গেলে সব কাজের পেছনে এটিই একমাত্র নীতি যা সব মানুষের প্রতি, কোন বিশেষ গোষ্ঠির মানুষের প্রতি নয়, কোন বিশেষ সরকারের প্রতিও নয়।

তিলে তিলে জনে জনে বন্ধুত্ব গড়াঃ

বিভিন্ন দেশের মানুষকে সব উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে শামিল রাখা সহজ কাজ নয়; কোন একটি সরকারের পক্ষে যেমন সহজ নয়, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একার কাজের মাধ্যমেও সম্ভব নয়, যদিও তারা প্রত্যেকে এতে অনেক অবদান রাখতে পারে। যদি পুরো জাতির এদিকে লক্ষ্য থাকে এবং এ জন্য ছোট বড় নানা আয়োজন, ব্যবস্থা, রীতিনীতি গড়ে তোলে তবেই সামগ্রিকভাবে এটি সম্ভব হয়; তাও দীর্ঘকালীনভাবে এই ট্র্যাডিশন চলতে থাকলে।

একেবারে স্কুলে থাকা কৈশোরে এমন রীতিনীতির আমার যে অভিজ্ঞতা সেটি বেশ সরাসরি– সেটি স্কাউটিং উপলক্ষে অন্য দেশের স্কাউটদেরকে নিজের শহরেই পাওয়া, তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বেশ কয়েকদিন তাঁবু বাস করা, মেলামেশা করা; আবার বিদেশের স্কাউট জাম্বুরীতে গিয়ে নানা দেশের

স্কাউট, নানা দেশের বালক এবং বয়স্কদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং বেশ ক'জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা; সেই সঙ্গে দেশগুলোকেও একেবারে কাছে থেকে দেখা। আমার অভিজ্ঞতা বলে বাল্যকালের এই দেখা ও মেলামেশা ও বন্ধুত্ব গড়া এটি পরবর্তী সুযোগগুলোর থেকে বেশি ইতিবাচক ছাপ রেখেছে, এ দেশগুলোর সম্পর্কে জীবনভর উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। আমার ক্ষেত্রে সুযোগটি স্কাউটিঙের মধ্যে এসেছিলো, কিন্তু আরও নানাভাবে এটি যে হতে পারে তা অন্যদের মধ্যে দেখেছি। একটি সুযোগ হলো স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব পর্যায়ে শিক্ষা জীবনের কিছুটা সময় একটি বছর অথবা অন্তত কয়েকটি মাসের একটি শিক্ষাটার্ম দেশে নিজের বিদ্যালয়ে না করে অন্য কোন দেশের বিদ্যালয়ে করা। বিভিন্ন দেশে এরকম ছাত্র বিনিময় স্কীমের কথা শুনেছি, কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজেও দেখেছি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একে অনেক দেশে খুব উৎসাহিত করা হয়। আমাদের দেশে রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে স্কুলের ছাত্রকে কানাডার স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে দেখেছি, ওখানকার একটি পরিবারে অতিথি হয়ে আর সেই পরিবারের একটি ছেলে এখানে। এতে কোন পক্ষেই বেশি কোন আর্থিক বা অন্য চাপ অনুভব করেনি। কে কোন্ দেশের কেমন স্কুলে গিয়েছে সেটি নির্বিশেষে ওই সময়টি যে কোন ছাত্রের জন্য জীবনের একটি মূল্যবান সময় হতে পারে, আর সেই দেশ হতে পারে সব সময়ের স্মরণীয় বন্ধু দেশ।

ইউরোপের এবং আমেরিকা ও কানাডার কিশোর-কিশোরীদের জন্য, ও আরও খানিকটা বড় বয়সীদের জন্য একটি চমৎকার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে ওখানে চালু রয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। একে বলা হয় 'আউ পেয়ার' হিসেবে অন্য দেশে কোন পরিবারে থাকার, কাজ করার ও সেদেশের ভাষা শেখার সুযোগ; হয়তো ভাষা ছাড়া অন্য বিষয়ও। 'আউ পেয়ার' ফরাসি শব্দটির মানে হলো সমান-সমান। যে পরিবারে গিয়ে সে থাকবে সেখানে পরিবারের সদস্য হিসেবেই থাকবে, সমান-সমান হিসেবে, সেটি বোঝাতেই ঐতিহাসিকভাবে এ নামটি চালু হয়ে গেছে। এর আগে অনেক স্বচ্ছল পরিবারে গৃহকর্মী নিয়োগ করার সুযোগ ছিল–থাকা-খাওয়া ও বেতনের বিনিময়ে, তারা পরিবারের সদস্য গণ্য হতো না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সামাজিক অবস্থা ও সঙ্গতি এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে গৃহকর্মীর পাট অনেকটা চুকে গিয়েছিলো। পার্থক্যটি বোঝাতেই আউ পেয়ার বলা। আউ পেয়ার ব্যবস্থাটি তখন থেকে খুবই জনপ্রিয়–আউ পেয়ার হয়ে ফরাসি ছেলে-মেয়েরা জার্মানিতে গিয়ে থেকেছে, ওখানকার

পরিবারে থেকে জার্মান ভাষা শিখে কাটিয়েছে, প্রয়োজনে ভাষা কোর্সও করেছে এক বছর বা তারো বেশি সময়ের জন্য; জার্মান সংস্কৃতির জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে; অনেক দিনের জন্য, এমন কি জীবনভর যোগাযোগের মত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছে। ঠিক একইভাবে অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়েছে আউ পেয়ার হয়ে। আমেরিকা-কানাডার মধ্যেও এটি হয়, আবার ওই দুই দেশের সঙ্গে ইউরোপেরও। এভাবে ভাষা শেখা অনেক সহজ, সেটি হয় অনেক আনন্দের অভিজ্ঞতা। বিনিময়ে আউ পেয়ার ঘরের হালকা নানা কাজ করে– বাচ্চা রাখা, শিশুদের সঙ্গে খেলা, কখনো কখনো রান্নায় গৃহকর্মীকে টুকটাক সাহায্য করা। অনেক ক্ষেত্রে আউ পেয়ারকে কিছু পারিশ্রমিকও দেয়া হয়। ইউরোপে নানা পরিবারের বাসায় যখন গিয়েছি এমনি আউ পেয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছি। যাদের আউপেয়ার দরকার আর যারা আউ পেয়ার হতে চায়, তারা এ সংক্রান্ত যে এজেন্সিগুলো আছে তাদের মাধ্যমে খবর পায়। এভাবে দীর্ঘ সময় ও বিশাল অঞ্চল জুড়ে সুন্দর একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে যাতে তরুণ বয়সেই ভিন্‌দেশের সঙ্গে একটি বড় বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের।

পরিবেশ, ইতিহাস অনুসন্ধান, কালচার, উন্নয়ন ইত্যাদি এক একটি বিষয়কে লক্ষ্যবস্তু করে লক্ষ্যনিষ্ঠ বিশেষ পর্যটন এখন দিন দিন বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে মানুষের মধ্যে এসব বিষয়ে সচেতনতা ও উৎসাহ বাড়ার ফলে। কাজেই অনেকে যাঁরা বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেন শুধু বেড়িয়ে চলে আসছেন না ওই বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত মানুষদের সঙ্গে উদ্যোগগুলোর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপন করছেন, অনেক সময় তাঁরা সেই উদ্যোগগুলোতে অর্থদান করছেন, নানাভাবে অংশও নিচ্ছেন– যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ, সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়ন, যে সব আর্ট কালচার হারিয়ে যাচ্ছে তাদের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদিতে। এই প্রসঙ্গে বিদেশে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার কথাও বলতে পারি, যেটি আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই এসেছে। দেশে দেশে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এভাবে স্বেচ্ছাসেবী হওয়াটি এখন খুবই জনপ্রিয়। কোন কোন উন্নত দেশ একেবারে সরকারিভাবেই সরকারি সংস্থার আয়োজনে এবং প্রণোদনায় তাদেরকে নানা দেশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এই ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে। এতে তাদের বাস্তব জীবন-শিক্ষাটি যেমন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন লাভ করে তেমনি তারা নিজ দেশের সেবা-দূত হিসেবে দেশকেও গন্তব্যের দেশে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করে। আমি বিদেশি যে সব তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষাৎ দেশে

পেয়েছি তারা কিন্তু সবাই স্বপ্রণোদিত, সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে বাংলাদেশে এসেছে, নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়েছে, নিজেকে নতুন শিক্ষায় সমৃদ্ধ করেছে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রে যেমন ঘটেছে, তেমনি অন্য প্রতিষ্ঠানে এসেও কারো কারো সঙ্গে আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। একজন কোরিয় তরুণী আমাদের দিনাজপুর কেন্দ্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে, ভিসা শেষ হয়ে গেলে তাকে তিন মাস পর চলে যেতে হয়েছিলো, কিন্তু সে আবার পরের বছর এসেছে এবং তিন মাস পর দীর্ঘ মেয়াদে থেকে যাওয়ার জন্য ভিসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে– সেই একই জায়গায়, একই গ্রামে, ওখানকার মানুষের সঙ্গে এতই একাত্ম হয়ে গিয়েছেলো। সেখানকার জীবন নিয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিরও চেষ্টা করেছে। এভাবেই বোধহয় মানুষ দুর দেশে গিয়েও একই গ্রামের মানুষ হয়ে ওঠে।

আজকাল পরস্পরের দেশে গিয়ে পেশাগতভাবে কাজ করাটাও বেশ সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। জীবনের একটি বড় সময় যদি কেউ অন্য একটি দেশে নিজের পেশায় কাটিয়ে দেন তাহলে তো তিনি বহু অর্থেই সেদেশেরই একজন হয়ে পড়েন। ওখানকার ঘটনাবলি, আইনকানুন, আনন্দ-বিষাদ নিশ্চয়ই তাঁর জীবনকে অনেকটা প্রভাবিত করে। ব্যাপারটি দুদিক থেকেই ঘটে, তাঁর প্রভাবও নিশ্চয়ই ওদেশের অনেকের ওপর পড়ে, সেখানে পদে পদে তাঁকে নিজের দেশের দূতের ভূমিকা নিতে হয়। পরস্পরের এই জানাশোনা এভাবে অনেকের সম্মিলিত ভূমিকায় দুই দেশের মানুষে মানুষে কাছে থেকে জানাশোনায় পরিণত হয়। কোন কোন দেশের কর্তৃপক্ষ অতীতে ওরকম 'অতিথি কর্মীদেরকে' নিজের নাগরিকদের থেকে একটু আলাদা রাখার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু সেটি দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

আলাদা রাখার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, অতিথি কর্মীদের একেবারে মিশে যেতে আমি দেখতে পেয়েছি কোন কোন ভিন দেশে বাস করা বিদেশি সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে, যাঁরা হয় নিজ দেশের কোন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে অথবা স্বাধীন সাংবাদিক হিসেবে ওই ভিন দেশে বাস করেন। বহু দিন ধরে অভিজ্ঞতায় থাকা একটি উদাহরণ দিই। ছাত্র থাকা কাল থেকেই আমি বিবিসি রেডিওতে মাঝে মাঝেই একটি প্রোগ্রাম শুনে এসেছি যার নাম 'লেটার ফ্রম আমেরিকা', এটি একজন সাংবাদিকই প্রতি সপ্তায় ১৫ মিনিটের জন্য আমেরিকা থেকে বলতেন– বৃটিশ ও বিদেশি শ্রোতাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেদেশের সমসাময়িক ঘটনার কিছু কিছুর সুন্দর, বিশ্লেষণমূলক, কিন্তু রস সমৃদ্ধ বর্ণনা। এই মানুষটি হলেন আলিস্টেয়ার কুক। বেশ কয়েক দশক ধরে অদ্ভুত এই প্রোগ্রামটি থেকেই

যুক্তরাষ্ট্রের নানা দিক, সেখানকার জীবন সম্পর্কে আমার জানাটি সম্পন্ন হয়েছে– যদিও আরও বহু বিকল্প পথেও সে সম্পর্কে জানছিলাম। ২০০৪ সালে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোগ্রাম শেষ হবার সময়েই জানতে পারি যে কুক ১৯৪৬ সাল থেকেই একটানা প্রতি সপ্তায় এটি চালিয়ে গেছেন– মূলত বিদেশি মানুষের চোখে আমেরিকা, স্বদেশি ও অন্য বিদেশিদের জন্য একেবারেই চাঁছাছোলা ব্যক্তিগত বর্ণনা। বাংলাদেশের মানুষ বিবিসির আর একজন সাংবাদিক মার্ক টালিকে অত্যন্ত প্রাণমন দিয়ে চেনেন তাঁর মুক্ত যুদ্ধকালীন সম্প্রচারের জন্য। তিনি ১৯৬৫ থেকেই ছিলেন দিল্লিতে বিবিসি'র প্রতিনিধি– পুরো দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁর কাজ। পাকিস্তানেও তিনি বহুবার গিয়ে সাংবাদিকতার কাজ করেছেন– এই পুরো অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যখন যে দেশ সম্পর্কে বলেছেন– নির্ভয়ে তা তথ্য-নির্ভর করেছেন, সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের আসল অনেক খবর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে প্রায় নিয়মিত ভিত্তিতে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটি এতটাই এগিয়েছিলো যে বিবিসি থেকে অবসর নেবার পর তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে থেকে যান ও স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা চালিয়ে যান। সাংবাদিক হওয়াতে আমরা বেশি মানুষ তাঁদের কথা জানতে পেরেছি, নিঃসন্দেহে অন্যান্য কাজ করেও এমনি ভাবে অন্য দেশ ও নিজের দেশকে একাকার করে অনেকেই নিয়েছেন।

এখন আমার একটি প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান হচ্ছে 'ডেইট লাইন লন্ডন'। বিবিসি'র এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে প্রত্যেকবার জনা চারেক বেশ অভিজ্ঞ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন যাঁরা বিদেশে সাংবাদিক হিসেবে এখন বৃটেনে বাস করেন সেখান থেকে বৃটিশ ঘটনাবলি এবং আর্ন্তজাতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেন। আলোচনার বিষয় থাকে ওই সপ্তায় বৃটেনের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার বিশ্লেষণ– অর্থাৎ বিদেশির চোখে বৃটেনকে দেখা সেই সঙ্গে তার সঙ্গে নানা আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক ও আর্ন্তজাতিক বিষয়ও। অনুষ্ঠানটি ভালো লাগার কারণ হলো নানা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অন্তত ১৫-২০টি দেশের সাংবাদিককে নানা সময় দেখেছি এতে; যাদের মধ্যে আরব, চীনা, জাপানি, পূর্ব ইউরোপিয়, ফরাসি, ভারতীয়, রাশিয়ান সব রকম দেশ রয়েছে। সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান পরিচালকের প্রশ্নের জবাবে তাঁদের মতামত অত্যন্ত খোলামেলাভাবে দিয়ে ওই দেশের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন, সমালোচনা করেছেন, এমনভাবে যেন তাঁরা এদেশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চেনেন– এদের রাজনীতিবিদদের,নেতাদের, এখানকার মানুষকে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইত্যাদি। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয়, একটি দেশের

পক্ষে এখন মোটেই শুধু নিজের দেশের মানুষের কথা নয়, অন্যান্য দেশের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের কথা চিন্তা করতে হয়; আমাদেরকে নিয়ে কে কি ভাবছে তাও জানতে হয়। জীবনটাই এখন বিশ্বায়িত– পরকে আপন ভেবে টেনে নিতে পারলেই সবার জন্য সবদিক থেকে মঙ্গল।

মানুষনীতি

ক্ষমতা নয়, সহমর্মিতা

পলিটিক্সের অনুবাদ করা হয়েছে রাজনীতি, আমার মনে হয়েছে এটি শুধু ভুল নয়, এটি রীতিমত ক্ষতিকর অনুবাদ। পলিটিক্সের অর্থকেএটি এমন দিকে নিয়ে যায় যা কাম্য নয়। 'রাজ' কথাটি রাজাকে মনে করিয়ে দেয়, অথবা বৃটিশ-রাজকে। এমনিতেই দেশে দেশে পলিটিক্স ক্ষমতার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, এই নাম তাকেই যেন জোরদার করে। 'পলিটিক্স' শব্দটি নিজে এসেছে গ্রীক পোলিস বা নগর থেকে। নগরের অর্থাৎ যে কোন জনপদের মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবনা ও কাজের বিষয়টিই পলিটিক্স। কেমন ভাবনা, কেমন কাজ হওয়া উচিত তা নিয়ে আদি বইটি এরিস্টোটলের লেখা– তিনি যে বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'পলিটিক্স'। তাঁর বিখ্যাত একটি উক্তি হলো 'মানুষ পলিটিক্যাল জীব'। একথা যে ঠিক তা আমাদের সবার জানা; মানুষ একা থাকতে পারে না, যে ক'জন এক জায়গায় এক সঙ্গে থাকে তাদের মধ্যে মিলেমিশে চলা নিয়ে নানা কথা থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। এটি রাজনীতি হলো কেমন করে? হওয়া উচিত মানুষনীতি– যে কোন জনপদের মানুষরা নিজেদের জন্য যে নীতি অনুসরণ করে তা। অভ্যাসবশত শব্দটি যদি রাজনীতিই রাখি, কাজের ক্ষেত্রে তা রাখা উচিত নয়। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সবাই দাবি করেন যে তাঁদের রাজনীতি ক্ষমতার জন্য নয়। কিন্তু কাজের বেলায় সেটি কতটা সত্য? খুশির খবর হলো রাজনীতিকে এখন কেউ কেউ সত্যিই মানুষনীতি হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করছেন– মানুষ নিয়েই যেখানে সব কথা, ক্ষমতা নিয়ে নয়।

ক্ষমতার রাজনীতিতে মানুষের ওপর ক্ষমতা পাওয়াই উদ্দেশ্য থাকে; বলা হয় সবার ভালো করার জন্যই ওই ক্ষমতাটি দরকার। আসলে দেখা যায় ক্ষমতার কতটা নিজের জন্য রাখা যায়, তারপর কতটা ওই জনপদের নানা গোষ্ঠির মধ্যে বেঁটে দেয়া যায় সেটিই তার কাজ হয়ে পড়ে। বহু দল যদি থাকে ক্ষমতার ভাগটি কোন দলকে কত দেবে, বহু জাতিসত্ত্বা যদি

থাকে তা হলে কোন্ জাতিসত্ত্বাকে কত দেবে, এমনিভাবে কোন সামাজিক স্তরকে বা পেশাকে, বা ধর্মকে। ওভাবে কাকে কত দেবে তার নির্ধারণ ক্ষমতাধরের বড় ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায়। এর ভেতর কেউ যদি অন্তত চেষ্টা করে ওটি সব মানুষের মধ্যেই সমানভাবে দিতে, অর্থাৎ সব মানুষকে ক্ষমতায়িত করতে, তখনই সেটি মানুষনীতি হয়ে ওঠে। তা ওরকম মানুষনীতি হোক বা না হোক সব ক্ষমতাধর জোরের সঙ্গে বলেন যে এ নীতি জনগণের জন্য, জনগণের রাজনীতি। জনগণ কথাটি প্রায়ই এতই বিমূর্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় যে বনের মধ্যে গাছ খুঁজে না পাওয়ার মত সেখানে মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনটি হয় বলেই অনেকের কাছে পলিটিক্স কথাটাই অপ্রিয় রূপ লাভ করে; ক্ষমতার কলা-কৌশলে পরিণত পলিটিক্সে মানুষের আগ্রহ থাকবে কেন? ওটি যত অন্তরঙ্গ পর্যায়ে ঘটে তত বেশি অপ্রিয় রূপে প্রকাশ পায়– তাই 'পলিটিক্স' শব্দটাই তাদের জন্য নেতিবাচক, আর 'ভিলেজ পলিটিক্স' অথবা 'প্যালেস পলিটিক্স' আরও নেতিবাচক। ক্ষমতার কলা-কৌশলের কথা অবশ্য এর কোনটাতেই বলা হয়না; দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যে কথাগুলো সব সময় উচ্চারিত হয় তা হলো জনকল্যাণ, সুবিচার, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, আইন ও শৃঙ্খলা, এবং অবশ্যই সুরক্ষা। তবে ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রায়শই এগুলো হয় দোহাই দেবার বিষয়, এগুলোকে সত্যিকার বিষয় হতে হলে মানুষের সঙ্গে তার স্পর্শ ঘটতে হয়। মানুষনীতির ম্যাজিকটি ওখানে।

আমি এদিক থেকে ভাগ্যবান কারণ যেইটুকু রাজনীতিতে সরাসরি অংশ নিয়েছি তা হলো ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি– যাতে ছাত্র পর্যায়েও ক্ষমতার রাজনীতির লেশমাত্র ছিল না, তা সম্ভবই ছিল না। ছাত্র ইউনিয়ন দলটির মধ্যে এ রাজনীতি করে ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভিপি নির্বাচিত হয়ে কিছুটা কাছে থেকে দেখেই সেটি বলতে পারছি। বেশ ক'টি দলের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা, এই বছর এ দল নির্বাচিত হচ্ছে তো পরের বছর আরেক দল– কায়েমী কোন কিছুই নেই; বুদ্ধিদীপ্ত এক রাশ ছাত্রকে কে কতখানি আকৃষ্ট ও উজ্জীবিত করতে পেরেছে তা নিয়ে কথা। সবারই লক্ষ্য এক ছাত্র-ঐক্য, আদর্শবাদ, নির্ভেজাল গণতন্ত্র, আর সকলেরই তাৎক্ষণিক সামনের টার্গেটও এক– প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেনা-সমর্থিত আইয়ুব-শাহী– দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে যাওয়া একনায়ক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কঠিন টার্গেট; তাই উত্তেজনাটিও বেশি। আদর্শবাদগুলোর সবই সবার কাছে প্রিয়– ভাষা আন্দোলনের আদর্শ, উদার জাতি গড়ার আদর্শ, দুনিয়ার মেহনতি মানুষের অধিকারের আদর্শ– দলভেদে কেউ এটির

ওপর গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে, কেউ ওটির ওপর। সব দলের জন্যই একটিই মহাপাপ; সেটি হলো কোন না কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা কারো ছায়াটিও মাড়ানো। এমনকি নেহাৎ গুজবেও যদি এমন কোন কথা কারো সম্পর্কে এসেছে তা হলে সেই ছাত্রনেতার রাজনীতি ওখানেই শেষ হতো।

আজকাল অনেকে সে যুগের কথায় এনএসএফ নামের ছাত্র দলটিকে আইয়ুব খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু সেটি আরও পরের ঘটনা ১৯৬৬ এর দিকের– যখন তাদের গোপন আঁতাত প্রকাশ্য হয়েছে, সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় ওদের কেউ কেউ বেপরোয়াও হয়েছে। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত কে কত কার্যকর আইয়ুব বিরোধী তা নিয়ে এনএসএফ অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো, একবার ছাত্রলীগের সঙ্গে জোট করে ছাত্র ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে– কারণ ছাত্ররা তাদের আইয়ুব বিরোধিতায় কোন খাদ দেখেনি। তখনকার মত এনএসএফের আদর্শবাদকেই তারা বেছে নিয়েছিলো, আমাদেরটি নয়। ১৯৬২ সনে এর ফলে এনএসএফ থেকেই চৌধুরী শফি সামির মতো একজন প্রতিভাদীপ্ত ভিপি আমরা পেয়েছিলাম (আমি সেবার তাঁদের দলের বিপক্ষে একটি পদে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছি)। বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ যখন এলো তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হলের সামনে একটি চেয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজিতে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন আমি এরকম আবেগপূর্ণ একটি সুন্দর শোক-বক্তৃতা খুব বেশি শুনিনি। শফি সামি পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তাই বলছিলাম ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে লেশমাত্র সম্পর্ক না রেখেও শুধু সব মানুষের কথা মনে রেখেও দুর্দান্ত রাজনীতি হতে পারে এবং সেটিই আসল রাজনীতি– মানুষনীতি। এজন্যই তখনকার ছাত্র রাজনীতি দেশের দুর্দিনে মানুষের কাছে আলোক বর্তিকার মতো হয়ে উঠতে পেরেছিলো। পরে দেশের ও বিশ্বের রাজনীতির একজন আগ্রহী ছাত্র হিসেবে আজ অবধি এমন মানুষনীতির ঝিলিক কোথাও কোথাও দেখতে পেয়েছি, এটিকেও সৌভাগ্য মনে করি, ক্ষমতার রাজনীতির ভিড়ের মধ্যেও।

রাজনীতি কী হওয়া উচিত তার মর্মকথাটি পরে একাধিক মনীষীর কাছ থেকে জেনেছি, তবে আমার সব থেকে বেশি মনে ধরেছে একজন বয়োবৃদ্ধা মার্কিন কংগ্রেস-ওয়ামেনের কথাটি। জীবনের দীর্ঘ সময় রাজনীতিতে ব্যয় করে তাঁর কাছে মনে হয়েছে রাজনীতি শুধু তারই করা উচিত এক একজন ব্যক্তি-মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতাটি যার স্বাভাবিক ধর্ম।

সোজা কথায় মানুষের কান্নায় যাঁর প্রাণ কাঁদে, মানুষের হাসিতে যাঁর মুখে হাসি ফোটে, রাজনীতি শুধু তাঁর কাজ। রাজনীতিতে আমি এই একটি মাত্র কারণে আসবো– মানুষের হাসি বাড়াবার আর কান্না থামাবার চেষ্টা করতে। ওরকম এক একটি মানুষের জন্য যদি তা পারি তাহলে আমি যে পরিসরে রাজনীতি করছি সেটি গ্রাম হোক, নগর হোক, দেশ হোক, দেশের জোট হোক, শেষ পর্যন্ত তার মঙ্গল আমি করতে পারবো। এখানে ওই একজন মানুষটি গুরুত্বপূর্ণ– 'জনগণ' নয় 'জনসাধারণ' নয়। সেই মানুষটি যে কেউ হতে পারে– সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাদের ভোট আমার দরকার তাদের মধ্য থেকে নাও হতে পারে; হতে পারে সংখ্যালঘুদের একজন, প্রতিপক্ষ দলের একজন, প্রতিবন্ধীদের একজন, সমাজের কিনারায় থাকা একজন, এমনকি অপরাধীদের একজন।

অন্যদিকে যিনি শুধু বড় বড় অর্জনের কথা বলেন, পুরো জনগণের কল্যাণে সবকিছু করার দাবি করেন, জনগণ বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁর ভোটারদের কথাটাই ভাবেন, ওই বৃহত্তর জনগণের জন্য এবং তার ভেতরে তাঁর নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠির জন্য বাকি মানুষদেরকে তুচ্ছ করতে পারেন, এমনকি নিচু তলার অনেককে ওই বৃহত্তর স্বার্থে ছিটকে পড়ে যেতে দিতেও যাঁর আপত্তি নেই, তাঁকে আর যাই হোক রাজনীতিবিদ বলতে ওই কংগ্রেস-ওয়ামেনের খুবই আপত্তি। বড় জোর তিনি নেপোলিয়ন গোছের সেনাপতি হতে পারেন যাঁর অর্থহীন দিগ্বীজয়ের জন্য হাজার হাজার সৈন্যকে বিনা কারণে প্রাণ দিতে হয় সে রকম; রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গুলি হেলনে কিছু মানুষের অপমান, দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু ডেকে আনা যদি রাজনীতিবিদের কাছে সামান্য ক্ষতি হয় তাহলে তাঁরা আসলে রাজনীতির উপযুক্ত নন– এরিস্টোটলের পলিটিক্সের অর্থেও নন, আজকের যে প্রত্যাশা সেই মানুষনীতির অর্থেও নন।

তাঁরা সেই মধ্যযুগীয় কবিতায় দিগ্বীজয়ী ডিউকের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন, অনুবাদে যা দাঁড়ায়:

ডিউক হাঁকিছে– জয় জয় আমাদের জয়
তাতে কার কী লাভ, ছোট্ট ছেলে পিটারকিনে কয়।
ডিউক বলে– তাতো নেই বাছা জানা
তবে বড়ই জবর আমার এই জয়খানা।

যে রাজনীতি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনা তা ডিউকের এই জয়ের মতই অন্তসারশূন্য। এক একজন মানুষের অশ্রু মোছাবার রাজনীতির কথা বললে ঝানু অনেক রাজনীতিবিদ বলবেন সেটি তো মাদার তেরেসার

কাজ, রাজনীতির কাজ নয়। আবেগ দিয়ে রাজনীতি চলনো, বড় কিছু অর্জন করতে হলে তা নীতি-সাফল্যের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। প্রয়োজনে ক্ষমতার ব্যবহার, কূটচাল সব ব্যবহার করতে হবে যাতে সার্বিক স্বার্থ রক্ষিত হয়। বড় মানুষের উন্নতি হলে তার সুফল একসময় ছোট মানুষের কাছেও গিয়ে পৌঁছবে। শুরুতে সব মানুষের মুখ চেয়ে কাজ করলে চলবে না, দেখতে হবে বড় দৃশ্যপটটি– সার্বিক শৃঙ্খলা, সুরক্ষা, উন্নয়ন, সমৃদ্ধির স্বার্থে মনকে শক্ত করে এগুতে হবে।

এসব লিখতে লিখতেই টেলিভিশনে এরই একটি নমুনা দেখতে পাচ্ছিলাম। নাইজেরিয়াতে বেশ কিছু দিন ধরে 'বোকো হারাম' নামের জঙ্গী গোষ্ঠির একটু প্রত্যন্ত জায়গাগুলোর মেয়েদের ও ছেলেদের স্কুলে হামলা চালিয়ে ১৫-১৬ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়াটা নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুক্তিপণের জন্য একই কাজ করা মাফিয়া গোষ্ঠিরা। টেলিভিশন খবরে দেখছিলাম এমনি অপহরণ হওয়া কিছু ছেলেমেয়েদের বাবা-মা'রা এদেরকে উদ্ধারের দাবি জানাতে স্থানীয় প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যথাসময়ে মুক্তিপণ না পাওয়ায় তিনচারজন ছেলেমেয়ের লাশ পাওয়া গেছে– তাদের বাবা-মাও ওখানে ছিলেন। তাঁদের বুকফাটা যে কান্না ও অন্য বাবা-মা'দের চোখে মুখে আতঙ্ক সেটি বলার মত নয়। অন্যদিকে গভর্নর সাহেব তাঁর রাজনৈতিক নেতা সুলভ লম্বা জোব্বার পোষাকে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে বলছিলেন কোন কোন বাবা-মা অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করাতেই উদ্ধারে দেরি হচ্ছে। ছেলেমেয়ে মারা যাওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত, তাঁরা চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের উদ্ধার করতে পারেননি বটে কিন্তু যদি সবাই অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিরত থাকেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দুষ্কৃতকারীরা এই জঘন্য কাজ ছেড়ে দেবে। এখন থেকে যে বাবা- মা যোগাযোগ করে মুক্তিপণ দেবার চেষ্টা করবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেয়া হবে। বৃহত্তর জনসাধারণদের স্বার্থে অপহৃত ছেলেমেয়েদের বাবা-মাদেরকে এটি মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ রাজনীতিবিদ বলছেন নিজের ছেলের বা মেয়ের সম্ভাব্য মৃত্যুকে বাবা-মায়ের মেনে নিতে হবে, উদ্ধারের চেষ্টা না করে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে হবে, সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকেও মেনে নিতে হবে। এটি তিনি বলতে পারছেন কারণ মায়ের দুঃখ বাবার দুঃখ তাঁর কাছে একটি সুদূর ঘটনা।

১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে যখন ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিওতে গিয়েছি, হোটেলে জায়গার অভাবে স্থানীয় এক তরুণের বাসায় পেয়িং গেস্ট

হিসেবে থেকেছি। তিনি খাস রিওর বাসিন্দা, এই নগরের অনেক কিছু আমাকে অকপটে জানিয়েছেন। একটি কথা ভাসা ভাসা শুনেছিলাম, তিনি একেবারে ওই জায়গায় আমাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন এখানে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কীভাবে নানা স্তরের রাজনৈতিক যোগসাজশে বখাটে ছেলেমেয়েদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয় নিয়মিত। এরা পথশিশু, অনেকে ড্রাগে আসক্ত, সেজন্য পর্যটকদের পকেট মেরেই ড্রাগ কেনে– কেউ কেউ আবার এইড্‌স আক্রান্ত। বড় বড় দোকানগুলোর দোকান মালিক সমিতি বখাটেদের উৎপাতে যেন পর্যটক খদ্দেরদের আসা বন্ধ না হয় এজন্য নিয়মিতভাবে ভাড়াটে খুনী দিয়ে এই বাচ্চাদের দু'একজন করে মেরে ফেলে, একে ধামাচাপা দেবার কাজ করে পৌর সরকার ও জাতীয় পুলিশ– একটি গোপন রাজনৈতিক সমঝোতায়। নিজেদের গর্বিত নগরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য এ কাজে সব স্তরের রাজনীতিবিদের হাত আছে। শুনেছি সে সময় ব্যাপারটি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, তার পরে পরেই এই অমানুষিক কাজ বন্ধ হয়েছিলো। কিন্তু ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট দুয়াতার্তে আজকের দিনেও তো একেবারে জাতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর দেশের তরুণ ড্রাগ সেবীদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে দলে দলে খুন করিয়ে জনপ্রিয়তার রাজনৈতিক পুঁজি সংগ্রহ করছেন।

এমন কাজকে অনেকে রাজনীতি বলতেই রাজি নন্, বড়জোর ক্ষমতার চর্চা। এখন রাজনীতির জবাবদিহিতা 'জনগণ' নামের একটি বিমূর্ত ধারণার কাছে নয়, এটি প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের কাছে দায়ী। ওই বখাটে ছেলে বা ড্রাগ আসক্ত যুবক তার বাইরে নয়, অন্য সব ছেলের মত তারও স্নেহ, সহানুভূতি ও সুরক্ষা পাওয়ার দাবি আছে রাজনীতির কাছে। আর সেই জবাবদিহিতা নিজের রাজনীতির ভৌগলিক সীমায় শেষ হয়ে যায় না– অন্য দেশের মানুষের কাছেও তা বিস্তৃত হয়– মানুষ মাত্রেরই দুঃখ ঘুচানোর চেষ্টা রাজনীতির প্রাথমিক দায়িত্ব। এই কাজটিকেই যদি লক্ষ্যবস্তু করা যায় তাহলে তার কারণেই অর্জিত হয় বিচার, আত্মমর্যাদা, শৃঙ্খলা, সুরক্ষা ও সত্যিকার সমৃদ্ধি। একেবারে নতুন কোন ধারণাও এটি নয়। প্রায় ২৩ শত বছর আগে প্রাচীন ভারতের সম্রাট অশোক এটি অনুসরণ করেছেন। তিনি পাথরের ওপর লিপি উৎকীর্ণ করে তা গোটা উত্তর ভারত জোড়া তাঁর সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে স্থাপন করেছেন, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের একবারে সীমান্তের নানা জায়গায় যাতে বাইরে মানুষও দেখে। এসব 'অশোক লিপি' থেকে আমরা জানতে পারছি তিনি ধর্মের পথে জীবে দয়া ও মানুষে দয়ার ভিত্তিতে সব কিছু করার চেষ্টা করছেন, আর সব মানুষকেও

একই চেষ্টা করতে অনুরোধ করছেন। সব থেকে অধঃপতিত মানুষটির ক্ষেত্রেও যে এই দয়া বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন সেটি তিনি দেখিয়েছেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত জঘন্য অপরাধীর উদাহরণ দিয়ে।

সহমর্মিতার রাজনৈতিক উৎসারণ

প্রশ্ন হলো কোটি মানুষের দেশে এক এক জন মানুষের সঙ্গে সহমর্মী হবার মানে কী, আর তাতে সবার সমৃদ্ধি কীভাবে আসবে। যাঁরা রাজনীতিতে সহমর্মিতার কথা বলেন তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে সহমর্মিতার যে প্রেরণা তা একটি মানুষে শুরু হয় বটে কিন্তু ওখানে শেষ হতে জানে না। ওই প্রেরণাটি অত্যন্ত শক্তিশালী জিনিস– ওই এক মানুষের দুঃখ মোচাতে গিয়ে এটি অসাধ্য সাধন করে– রাজনীতির সকল শক্তিকে উৎসারিত করে, মানুষের সুবুদ্ধিগুলোকে কল্যাণের সাধনায় নিবদ্ধ করে। সত্যিকার সহমর্মিতা যখন ঘটে যখন তা অবধারিতভাবে রাজনৈতিক দায়িত্বে পরিণত হয়, সে দায়িত্বের প্রথম কাজটিই হলো বাকি সবার মধ্যে সেই সহমর্মিতা সঞ্চার করা এবং সবার শক্তিকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা। একেবারে শুরুতে রাজনীতিবিদের মধ্যে এক এক মানুষের জন্য সেই সহমর্মিতা সৃষ্টি না হলে এগুলোর কিছুই হয়তো হতো না। অন্য পেশা ও দায়িত্বের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা যে সৃষ্টি হয়না তা কিন্তু নয়, তাঁরাও দুঃখ মোচনে তাঁদের মত করে দারুণ সফল হতে পারেন। তারপরও রাজনীতিবিদের কথাটি বিশেষভাবে আসছে কারণ এটিই তাঁর জীবনের ব্রত হওয়ার কথা, আর তাঁরই কাজ রাজনৈতিক শক্তিটি এর পেছনে সুসংবদ্ধ করা।

রাজনীতি তো গ্রাম থেকে শুরু করে নগর, জেলা, প্রদেশ, দেশ সব স্তরে হতে পারে– এক স্তর থেকে অন্য স্তরের পার্থক্য হলো ভৌগলিক এলাকায়, জন সংখ্যায়, দায়িত্বের প্রকৃতিতে– প্রত্যেক স্তরের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে, একটি দিয়ে অন্যটি পূরণ হয় না। পলিটিক্স বলতে সেই যে একটি জনপদের মানুষের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত কাজ করে সফল হওয়া, সেটি প্রত্যেক স্তরের যে জনপদ তার জন্য আলাদাভাবেই প্রযোজ্য। অনেকে সারা জীবন একটি স্তরের রাজনীতি করে অসম্ভব রকমের তৃপ্তি ও সাফল্য লাভ করেন, অনেকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যান– কিন্তু প্রত্যেক স্তরে সবার মূল প্রেরণা একটিই থাকতে হবে এক এক জন মানুষের প্রতি সহমর্মিতা। এই স্তর-বৈচিত্র নিয়ে এক্ষেত্রে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, কেউ ভাবতে পারেন ওসব ব্যক্তিগত সহমর্মিতার কাজ গ্রাম স্তরেই সম্ভব হতে পারে;

ওখানে সবাই সবাইকে চেনে, সবকিছু চোখের সামনে ঘটে– কাজেই সহমর্মিতা জাগাটি স্বাভাবিক। কিন্তু বড় স্তরে গিয়ে– বড় নগরে, প্রদেশে, দেশে সেখানে রাজনীতি অন্য রূপ নেয়, সেখানে নীতি নির্ধারণ, বড় আকারে প্রচার, হাজারো-লক্ষ মানুষের জন সমুদ্রকে উদ্বুদ্ধ করা, বিশাল আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক নির্দেশনা দেয়া এসবই কাজ, জনে জনে সহমর্মিতা জানানো নয়। এটি কিন্তু অত্যন্ত ভুল কথা– সহমর্মিতার কোন স্তরভেদ নেই; কোন স্তরেই এটি ছাড়া চলে না, সবক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেই রাজনৈতিক শক্তি তা ওখানকার সহমর্মিতার প্রেরণা থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। অথচ একজন মানুষ তিনি একই সঙ্গে গ্রামেরও নাগরিক, জেলারও নাগরিক, প্রদেশ বা দেশেরও নাগরিক– তাই সব স্তরের রাজনীতির সহমর্মী স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগবে, লাগা উচিত। সেখানেই ওই সব রাজনীতি সার্থকতা পায়, এক বিন্দুতে মিলিত হয়, যাকে বলা হয় 'সিনারজি' বা সব শক্তি এক স্রোতে লীন হওয়া– সেটি ওই প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের ওপরেই ঘটে, তিনিই জনগণ– জনগণ বলে আলাদা কোন সম্মিলিত তাত্ত্বিক জিনিস নেই, এরকম এক এক মানুষ নিয়েই জনগণ।

কিন্তু এই যে ব্যক্তি-মানুষকে স্পর্শ করার মত সহমর্মিতার জীয়ন কাঠি তার স্বরূপ কী রকমের হতে পারে? অবশ্যই এটি দুঃখীর দুঃখের দিকে মনোযোগ দিয়ে নিজে সেই দুঃখটি অনুভব করা এবং এই সমব্যথী হিসেবেই বাকি কাজ করা। রাজনীতিবিদ যতক্ষণ এভাবে সমব্যথী হতে পারবেননা ততক্ষণ তার জন্য শক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের ঝুঁকি তিনি নিতে যাবেন না; বিশেষ করে সেই মানুষটি যদি তাঁর রাজনৈতিক সহযোগী বা নিজস্ব মানুষ না হয়, অথবা সমর্থক সংখ্যাগরিষ্ঠের এক জন না হলে তো মোটেই না। সমব্যথী হওয়া মানে অবশ্য টেলিভিশনে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ছবি, বা বোমায় ছিন্নভিন্ন মায়ের দেহের সামনে শিশুর কান্না দেখে দুঃখ পাওয়া, এবং কিছুক্ষণ পর ভুলে গিয়ে তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু করা নয়। কারো কারো দ্বারা এমনো বিশ্লেষণ হয়ে থাকে যে নিজের দোষে এরা দুঃখী হয়েছে, দরিদ্র হয়েছে আলস্যের কারণে, অথবা অপহৃতা হয়েছে নিজেদের বেশভূষার কারণে। এরকম বিশ্লেষকদের দুঃখ পাওয়া সমব্যথী হওয়া নয়, সমব্যথী হওয়ার অর্থ তাদের দুঃখের অনুভূতিটি কষ্টটি নিজের মধ্যেও অনুভব করা, এবং সেই অনুভূতি বুকে জিইয়ে রাখা– যেন নিজেই তিনি এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। কাজটি কঠিন– যেমন পাচার হয়ে যৌনদাসীতে পরিণত হওয়া নারীর জায়গায় নিজেকে স্থাপন করা, তাঁর অপমান, তাঁর কষ্ট নিজের

অনুভব করতে পারাটি সহজ হবার কথা নয়। কিন্তু নিজেকে দুঃখীর জায়গায় স্থাপন করতে না পারলে সমব্যথী হওয়া হয় না।

সমব্যথী হবার পথে একটি বাধা হতে পারে দূরত্ব। মানুষটি যতদূরের হবে তার ব্যথা আমার কাছে তত কম হয়ে বাজবে। সেটি ভৌগলিক দূরত্ব হতে পারে, ভিন দেশের মানুষের দুঃখ টেলিভিশনে দেখে আমরা কতটাই বা বুঝি? সেই ভিন দেশ যদি সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দূরের হয় তা হলে তো আরও কম, এতে একেবারেই নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাই অনায়াসে নিজের টেবিলের সামনে বসে আফ্রিকার ম্যাপের ওপরে হাজার মাইল লম্বা সরল রেখা টেনে দেশ ভাগের সোজা সীমান্ত চাপিয়ে দিয়ে অসংখ্য মানুষের চরম দুর্যোগ ঘটাতে পেরেছে; এখনো ম্যাপে দীর্ঘ সরল রেখাগুলো দেখলে বোঝা যায়। নিজের দেশের ভেতরে কাছেই থাকা মানুষও মানসিকভাবে অনেক দূরের হতে পারে– অন্য দল, অন্য মতাদর্শ, অন্য ধর্ম, অন্য জাতিসত্ত্বা, বা সমাজে নিম্নতর স্তরের বলে বিবেচিত এমনি সব মানুষ। তাদের চরম ব্যাথা-বেদনাও সহজে পৌঁছতে চায় না। অন্যদিকে আপন মানুষের ব্যথা চট্ করে নিজের ব্যথায় পরিণত হয়– নিজের পারিবারিক গোষ্ঠির হলে তো কথাই নেই, তাছাড়া সমগোষ্ঠির, সমব্যবসায়ীর, সম-রাজনীতির, সম-পেশার মানুষের। এসব সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু যিনি রাজনীতিবিদ হতে চান তাঁকে এই দূরত্ব-নির্বিশেষে সমব্যথিত হতে পারতে হবে; আসলে তা তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতিতেই পরিণত হতে হবে– কোন সত্যিকার রাজনীতিবিদই পারেননা 'পলিটিক্যাল' বিবেচনায় কোন কাজ করতে, তাঁর সহমর্মিতা তাঁকে বাধা দেবে।

এটি রাজনীতিবিদ কীভাবে করবেন? সরল উত্তর হলো প্রধানত সরাসরি সেই দুঃখীকে দেখে ও তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। হতে পারে এই সমস্যা নিয়ে এই একটি মানুষই আছে, তার কথাও শুনতে হবে। সাধারণত তেমনটি হয় না, এই একটি মানুষের পেছনে তাঁর মত হয়তো শত-হাজার মানুষ আছে; তাই সরাসরি এই দেখা, এই শোনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যতটা সরাসরি সম্ভব ততই ভালো, তবে আজকাল প্রযুক্তি, মিডিয়ার এবং উন্নত সাংবাদিকতার কল্যাণে ইচ্ছে করলে প্রায় সরাসরির মতই দেখা যায়, শোনা যায়। যা শুনবো তাতে আমার নিজের প্রতিই প্রচুর অভিযোগ থাকতে পারে, হয়তো ওই দুঃখের কারণ হিসেবে অঙ্গুলি নির্দেশ আমার দিকেই আসছে– সে সব আমার পছন্দ হবার কথা নয়। তাছাড়া আমার অপছন্দের আরও বহু কারণ থাকতে পারে– ভিন্ন দল, ভিন্ন মতাদর্শ,

ভিন্ন জীবনাচরণের মানুষ হতে পারেন তিনি, আমার একেবারেই অপছন্দের জিনিসিগুলো করেন; তাছাড়া সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছেও এই মানুষটি 'অপ্রিয়' ব্যক্তি। কিন্তু তারপরও তিনি যদি কষ্টে থাকেন, তাঁর যদি সমস্যা থাকে, তিনি যদি নিগৃহীত হন, বৈষম্যের শিকার হন, তাঁর মানবাধিকার যদি লঙ্ঘিত হয়, তা হলে তাঁর কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, এবং দুঃখের কারণ দূর করতে হবে– সেটিই সত্যিকার রাজনীতি, সত্যিকার মানুষনীতি।

ওপরে ওপরে সহমর্মিতা দেখালেন কিন্তু দুঃখমোচনের জন্য যে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার, যা বাস্তবায়ন করা দরকার তা করলেন না, তাকে কি বলবো? সেদিকে কোন চেষ্টাও করলেননা কারণ জনমত এর পক্ষে নয়, অথবা নিজের মানুষদের জন্য বা নিজের রাজনীতির জন্য সেটি সুবিধাজনক নয়, তাহলে সেটি হবে নেহাতই জনতুষ্টি, সুবিধাবাদ, ক্ষমতার কৌশল; সত্যিকার রাজনীতি নয়। সত্যিকার রাজনীতিবিদ শুধু জনমতকে অনুসরণ করেন না জনমতকে গঠনও করেন। যাঁরা রাজনীতি জিনিসটাকেই সহমর্মিতায় গড়া বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে ওই সহমির্মতা মানে কুম্ভীরাশ্রু নয়, বরং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ব্রত। সহমর্মিতায় প্রেরণাতেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন যাতে সবার কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এটি বাস্তবায়নে যে সব কাজ তাঁকে করতে হয়, এর পথে যে সব সমস্যা অতিক্রম করতে হয়, ওই প্রেরণা দিয়েই তিনি তাতে সমর্থ হন। হয়তো এর জন্য তাঁকে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে হয়, সে ঝুঁকিকে তিনি তাঁর কাজের স্বাভাবিক অংশই মনে করেন; এতে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে, তাও তিনি মেনে নেন, কারণ তিনি জানেন শেষ পর্যন্ত মানুষের রাজনীতির জয় হবে। দেশে দেশে যে রাজনীতি আমরা দেখে এসেছি তাতে এমন সহমর্মিতার রাজনীতি কমই রয়েছে। কিন্তু এখন বিশ্বজোড়া মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে, এমন রাজনীতিই তাদের কাম্য; তাছাড়া তাদের এমন কামনা একেবারে অপূর্ণ থাকছে না। সত্যিকার গণতন্ত্রসমূহে এখন সহমর্মিতা, এবং মানবাধিকারকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতিতে খুব বড় নিয়ামক হিসেবে এসেছে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসীদেরকে নিজ দেশে ঢুকতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি। একদিকে আন্তর্জাতিক আদর্শবাদী সহমর্মিতার প্রশ্ন, অন্যদিকে নিজ দেশে জনতুষ্টি ও সুবিধাবাদের রাজনীতি এই দুইয়ের টানাপোড়েনে এখানকার অনেকগুলো দেশের রাজনীতি খুবই

চাপে রয়েছে। প্রধানত সোমালিয়া, সুদান, ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান থেকে আসা এসব অভিবাসীদের ঠেকানোর প্রশ্নটি ওই পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর কোন কোনটিতে নতুন ধরণের জনতুষ্টির এবং ডানপন্থী সরকার ও দলের জন্ম দিয়েছে। অথচ আজকের দিনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট আন্তর্জাতিক নিয়ম ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা ওই কোন কোন দেশ কৌশলে এড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই মানুষগুলোকে ওদের নিজ দেশে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নিহত, আহত, ও সর্বহারা হতে এবং তারপর উদ্বাস্তু শিবিরে বহু মাস, বহু বছর ধরে আমানবিক পরিস্থিতিতে থাকতে যারা দেখেছে তারা অভিভূত না হয়ে পারেনি। তাদেরই হয়ে উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজ দেশের সরকার ও বিরোধী দল উভয়কে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেছেন তাঁরা অভিবাসীদেরকে দূরে রাখার দোহাই হিসেবে ব্যবহার করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রমকে, দেশকে নিরাপদ রাখাকে। ওই মৃত-প্রায় মানুষগুলোকে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হিসেবে দেখাতেও তাঁদের বাধছে না। অষ্ট্রেলিয়ায় নামতে দিয়ে সেখানে অভিবাসন অনুমতির জন্য অপেক্ষা করার বদলে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অন্য দেশের দ্বীপ-কারাগারে অমানুষিক অবস্থায় থাকার জন্য। যদি তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার বদলে সহমর্মিতাকে উর্ধে রাখতেন তাহলে আসলে কোন সমস্যাই হতো না। সরকার ও বিরোধী দল একযোগে মানুষকেও সমব্যথী করে তুলতে পারতো, কিন্তু তারা তা না করে উভয়েই সহজ সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়েছে। ওই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এই একই সুবিধাবাদের কারণে তারা নিজ দেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের দুঃখেও নির্লিপ্ত থাকতে পেরেছে।

কিন্তু এই একই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও দেখতে পেয়েছি। প্রধানত এর প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলর) এঙ্গেলা মের্কেলের উদ্যোগে জার্মানি দেখিয়ে দিয়েছে রাজনীতি জিনিসটি কেমন হওয়া উচিত। ২০১৫ থেকে ২০১৭ এই স্বল্প সময়ে এই একই যুদ্ধবিধ্বস্ত দূর দেশের মানুষদের প্রায় ১৪ লক্ষ জনকে জার্মানিতে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদেরকে দেশের বাকি মানুষের মধ্যে আত্মস্থ করে নেবার মাধ্যমে। মের্কেল চরম রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন আবার বিশ্বে সহমর্মিতার রাজনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ২০১৫ সালে এই মানুষগুলো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জীবন হাতে নিয়ে গ্রিস ও বলকান দেশগুলো হয়ে স্রোতের মত জার্মানির দিকে আসছিলো, অসহায় বিধ্বস্ত কপর্দকশূন্য নারী-পুরুষ-শিশুদের স্রোত– অনেকে পানিতে ডুবে

মারাও যাচ্ছিলো। যে সব দেশ পথে পড়ছে, যেদিকে এগুচ্ছে তারা সবাই সন্ত্রস্থ হয়ে এই স্রোতকে ঠেকাতে ব্যস্ত। গ্রিসের সমুদ্র পারে যত্ন করে পোষাক পরানো তিন বছরের সিরীয় শিশু আলান কুর্দীর উপুড় অবস্থায় থাকা ছোট্ট মৃতদেহের ছবি তখন সারা দুনিয়ায় দুঃখের মাতম সৃষ্টি করেছিলো। অসংখ্য মানুষ থেকে অসংখ্য সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা এ প্রসঙ্গে এসেছে; একজন লিখেছেন– 'আলান এতক্ষণে সৃষ্টিকর্তাকে কানে কানে বলে দিয়েছে যে মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে'। তবে একজন রাজনীতিবিদ মের্কেল ছোট্ট একটি কথায় তাঁর মত প্রকাশ করলেন– 'আমরা পারবো'। তাঁর সকল রাজনৈতিক সহযোগীদেরকে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলোকে এবং দেশের মানুষকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হলেন যে জার্মানি পারবে– এ বোঝাতে পারাটি চাট্টিখানি কথা নয়। হঠাৎ বিজাতীয় এই কপর্দকশূন্য মানুষগুলো জার্মান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারে– আপাতত ক'দিন পূর্ণ আতিথ্য দিয়ে অতি শিগগির তাদেরকে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে আত্মীকরণ করতে হয়েছে, জার্মানির নানা শহরে-বন্দরে তাদেরকে স্থিত করার প্রশ্ন আছে, তাদের সামাজিক পারিবারিক জীবন জার্মানির মানানসইভাবে শুরু করার ব্যাপার আছে, ভাষা শেখার ব্যাপার আছে, কর্ম সংস্থানের ব্যাপার আছে– সব কিছু করতে হয়েছে অতি দ্রুত, কোথাও বড় রকমের ঢেউ না তুলে।

এজন্য জার্মানির সকল প্রতিষ্ঠানকে এ কাজে তৈরি করতে হয়েছে। জার্মানির সব দল ও সব মানুষ যে এটি মেনে নিয়েছে তা নয়, তারা একে পাগলামি সিদ্ধান্ত বলেছে, বলেছে এ মের্কেলের রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সর্বত্র ভেঙ্গে পড়বে ইত্যাদি। তাঁর নিজের দলে, সহযোগীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচুর অসন্তোষ; ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য সদস্যরা ভয় পেয়ে গেলো এরপর বুঝি তাদের ওপর এমন করার চাপ আসে। কিন্তু মের্কেল অবিচল– টেলিভিশনের কল্যাণে আমরা দেখেছি মিউনিখ, বার্লিন ইত্যাদি নগরের ট্রেন ষ্টেশনে কীভাবে অসংখ্য জার্মান পরিবার ওই অর্ধমৃত মানুষগুলোকে হাস্যোজ্জ্বলভাবে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। পরে বিশ্লেষকরা দেখিয়েছেন এর জন্য কতখানি উচ্চ মূল্য শুধু জার্মানিকে নয়, পুরো ইউরোপকে দিতে হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ওখানে বেশ কিছু দেশে অভিবাসন-বিরোধী ডানপন্থী দলগুলোর উত্থান ঘটেছে, কোন কোনটিতে তারা সরকারও গঠন করেছে, বা সরকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জার্মানিতেও ডান-পন্থী নব্য-নাৎসীদের তৎপরতা বেড়েছে। অনেকেই এসবের জন্য মের্কেলকে দায়ী করেছে; কিন্তু তিনি দুঃখী মানুষের

প্রতি তাঁর সহমর্মিতাকে অনুসরণ করেছিলেন, যা সব রাজনীতিবিদের করা উচিত। গতানুগতিক রাজনীতির দিক থেকে সমালোচিত হলেও তাঁর এই কাজ জার্মান জাতির জন্য গৌরব ছাড়া আর কিছু বয়ে আনেনি– নিজে ঝুঁকি নিয়ে তিনি জাতিকে গর্বিত করেছেন।

মের্কেল কি শুধু অভিবাসীদের ক্ষেত্রে সহমর্মী হয়েছিলেন? না সেটি সম্ভব নয়, মানুষের জন্য যার হৃদয় কাঁদে তা সব সময় কাঁদে। এই মূল প্রেরণায় তিনি একটির পর একটি ঝুঁকি নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর দেশ তাঁকে ষোলো বছর ধরে একের পর এক নির্বাচনে জয়যুক্ত করে সমর্থন দিয়ে গেছে, নিজে স্বেচ্ছায় পদ ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত। বিদায়ের সময় যে সব বিশ্লেষণ দেখেছি তাতে তাঁর সময়ে আরও দুটি বড় কাজের জন্য তিনি কারো কাছে বিশেষভাবে নন্দিত ও আবার কারো কাছে সমালোচিত হয়েছেন। দুটিতেই তা মানুষের জন্য সহমর্মিতাকে অনুসরণ করার ফল। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া চরম মন্দার সময় এবং এর পর ২০১২ সালের ইউরোজোন সংকটের সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশ– গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন ও আয়ারল্যান্ডে যে ধস নামে, সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হাহাকার সৃষ্টি হয়, জার্মানি বিশাল অংকের ঋণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। এই ব্যপারে করণীয় নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য ধনী দেশগুলোর সঙ্গে মের্কেলের বিশেষ মতভেদ দেখা দিয়েছিলো। জার্মানির ওটি করার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল বটে কিন্তু তা জার্মান অর্থনীতিতে প্রচুর চাপ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। বিশেষ করে গ্রিসের অবস্থা তখন এতই খারাপ হয়েছিলো যে তার পক্ষে ইউরোজোনে অন্যান্যদের সবল অর্থনীতির সঙ্গে একই মুদ্রানীতিতে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো, ইউরোজোন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে তার বের হয়ে যাওয়া প্রায় অবধারিত হয়ে পড়েছিলো। মের্কেল একদিকে সেই পরিণতি থেকে জোটকে বাঁচিয়েছিলেন অন্য দিকে গ্রিসকে রক্ষা করার শর্ত হিসেবে তাকে অত্যন্ত কড়া আর্থিক শৃঙ্খলা ও কৃচ্ছ সাধনা মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। এর ফলে এক পর্যায়ে ওখানকার সরকার ও মানুষ তাঁর ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে রীতিমত আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু মের্কেলের উদ্দেশ্য অভিনন্দিত হওয়া ছিল না, ছিল মানুষকে আর্থিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো। সে কারণেই গ্রিস এখনো ইউরোপীয় ইউনিয়নের গর্বিত ও সমৃদ্ধ সদস্য।

অন্য বড় বিষয়টি ছিল এনার্জি নীতি নিয়ে। জার্মানি তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক রিয়্যাক্টরগুলোর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতো।

পূর্ব পেশায় একজন সফল গবেষক পদার্থবিদ হিসেবে মের্কেল পারমাণবিক শক্তির ওপর খুবই বিশ্বাসী ছিলেন এবং চ্যান্সেলর হিসেবে ২০১০ সালে এর বড় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ২০১১ সালের মার্চ মাসে জাপানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ও সুনামিতে সেখানে ফুকুশিমায় পারমাণবিক রিয়্যাক্টর ভেঙ্গে গিয়ে, পানির সঙ্গে ও বাতাসে অত্যন্ত বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে গিয়ে, যে মৃত্যু ও দুর্দশায় দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা মের্কেলের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনে। সহ-রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিলে তিনি দেখলেন এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যে কোন সময় মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যক্তি-মানুষের সম্ভাব্য দুর্দশার কথা চিন্তা করে এনার্জি- নীতিতে বিরাট পরিবর্তন আনা হলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রধান নয়টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন তিনি এবং বাকিগুলো পরের বছরের মধ্যে। অবশ্য কয়েকটি কেন্দ্র রয়ে গিয়েছিলো যার তিনটা ২০২১ এর শেষে বন্ধ হয়েছে এবং বাকি তিনটা ২০২২ এ বন্ধ হবে। এতে জার্মানির এনার্জি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হয়েছে, বেশ কিছু বিরূপ ফলও হয়েছে, যেমন ফসিল জ্বালানিকে আপাতত বাড়াতে হয়েছে যা জার্মানির মত পরিবেশ সচেতন দেশে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়; ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য কিছু দেশের সঙ্গে এ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তিতে দ্রুত বিনিয়োগ বাড়িয়ে জার্মানিকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তার কড়াকড়ি নীতিতে নিয়ে আসতে হয়েছে। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরগুলো বন্ধ না করলে এভাবে গলদ্‌ঘর্ম হতে হতো না। আরও বড় কথা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মালিক কোম্পানিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর সব মামলা ঠুকে দিয়েছে তার থেকে উদ্ধার পেতে মের্কেলকে হিমসিম খেতে হয়েছে। কিন্তু বরাবরের মত মের্কেল তাঁর চ্যান্সেলর সত্ত্বা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নেতার সত্ত্বা, ইত্যাদির ওপরে স্থান দিয়েছেন মানুষের প্রতি সমব্যথী সত্ত্বাকে।

মানুষনীতি থাকবে সব মানুষের হাতে

নীতি যেহেতু মানুষের জন্য তা সব মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত হওয়া উচিত; একমাত্র নির্ভেজাল গণতন্ত্রের মধ্যেই সেটি হতে পারে। এই নীতি স্থির করার, সমর্থন করার ও বাতিল করার ক্ষমতা যদি ওই মানুষের হাতেই থাকে তাহলে পলিটিক্সের পক্ষে মানুষনীতি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। প্রত্যেক মানুষের পর্যায়ে যখন এটি আসে তখন তিনি সহমর্মী নীতিই বেছে নেবার সম্ভাবনাই বেশি কারণ প্রত্যেকে কোন না কোনভাবে

কোন কিছুর ভুক্তভোগী। প্রত্যেক নাগরিক যদি সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নীতি নির্ধারণে ও নীতি বাস্তবায়নে নিজের মত দিতে পারতো সেটিই হতো আদর্শ গণতন্ত্র। সেটি প্রাচীন গ্রিসে কোন কোন নগর-রাষ্ট্রের মানুষরা চত্বরে সমবেত হয়ে নিজেদের মতামত দেবার মাধ্যমে সম্পন্ন করতো। সেই ঐতিহ্যে এখনো কোন কোন জায়গায় এমনটি নানাভাবে হয়ে থাকে– খুব ছোট গ্রামের স্থানীয় সরকার পরিচালনায় যেমন হয়, তেমনি পুরো দেশে সরাসরি গণভোটের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ করেও হয়। এখনো সুইজারল্যান্ডের মত দেশে ছোট বড় অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নেবার ভার সব মানুষের ওপর ছেড়ে দেয়া হয় প্রশ্নগুলো ঘন ঘন অনুষ্ঠিত গণভোটে দিয়ে। অন্যান্য দেশেও যখন কোন নীতির প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, তখন তা গণভোটই দেয়া হয়। যেমন বৃটেনে সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে গণভোট হয়েছে, আবার স্কটল্যান্ডের বৃটেনে থাকা নাকি স্বাধীন হয়ে যাওয়া এ নিয়েও হয়েছে। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও অন্যান্য নির্বাচনের সময় এমনি নানা নীতি নির্ধারণী প্রশ্নও ভোটারদের সরাসরি সম্মতির জন্য ব্যালটে প্রশ্ন রাখা হয়।

যেহেতু দৈনন্দিন নীতি নির্ধারণ ও শাসন পরিচালনার জন্য গণভোটে সবার মতামত নেয়া সম্ভব নয়, সে জন্য তার বদলে সবার নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তা করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। কোন কোন দেশে নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে যে একবার নির্বাচিত হবার পর এই প্রতিনিধিরা তাঁদের মেয়াদের মধ্যে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করে যান; তাঁরা যাই করেন মনে করা হয় যে ওটাই তাঁদের ভোটারদের মতামত। উন্নত গণতন্ত্রে এটি হয় না, প্রতিনিধিরা সব সময় তাঁদেরকে যাঁরা নির্বাচিত করেছেন তাঁরা নানা বিষয়ে কী ভাবছেন তা তাঁরা নানাভাবে জানার চেষ্টা করেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেভাবে নিজের সিদ্ধান্তগুলো নেন, যাতে ওদের আস্থা তিনি না হারান। তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর আর তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মত নাও মিলতে পারে, সে ক্ষেত্রে তিনি ভোটারদেরকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে নিজের মতে চলেন না– বরং নিজের মতটি তাঁদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। অবশ্য কখনো প্রয়োজন মনে করলে তাঁদের মতের বিরুদ্ধে গিয়েও নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন। একইভাবে তাঁরা নির্বাচকদের প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ, দুঃখকষ্ট, আশা-আকাঙ্খাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে সেগুলোর ওপর কাজ করার চেষ্টা করেন।

রাজনীতিবিদ হিসেবে কতটা সহমর্মিতার সঙ্গে তিনি তা করেন সেটিই বড় কথা। এখানেই প্রত্যেক মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষ, এমনকি প্রতিপক্ষের মানুষ, অপছন্দের মানুষেরও প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর কর্তব্য। কাজেই সব সময় সব ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নয়, বরং তাঁর বিচারবুদ্ধি ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই তাঁকে নিজের কর্তব্য ঠিক করতে হয়। এজন্য নির্বাচকরা যদি পরের বার তাঁর বিপক্ষেও চলে যায় তবুও এই ঝুঁকি তাকে নিতে হয়। কোন কোন দেশে অদ্ভুত নিয়ম করা হয় যে তাঁর দলের নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি কোন বিষয়ে তাঁর সমর্থন দিতে পারেন না, সেটি তাঁর নির্বাচকরা চাইলেও নয়, নিজের বিবেক বললেও নয়; এমনকি এ সম্পর্কে ভোটদানে তিনি অনুপস্থিতও থাকতে পারেন না। এটি স্পষ্টত গণতন্ত্রের বিপক্ষে যায়– কারণ এতে মানুষের আর নিজের মত দেয়ার সুযোগ থাকছে না, একটি দলকে নির্বাচিত করেই মেয়াদকালের জন্য নিজের মত দেবার সব অধিকার ভুলে যেতে হচ্ছে, যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের অধিকারও।

প্রতিনিধির মাধ্যমে গণতন্ত্র পরিচালনা ছাড়াও সরাসরি প্রত্যেক মানুষের নিজেদের নীতি পরিচালনার উদাহরণ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার প্যারিসের কাছে একটি অতি ছোট ফরাসি শহরের (গ্রামও বলা যায়) পৌর সভায়। দেখেছি প্রায় সব নাগরিককেই নীতি নির্ধারণী বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশ নিতে। আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন ফরাসি সহযোগী মহিলা জোসিয়ানের অতিথি ছিলাম; তিনি ওখানকার বাসিন্দা,শহরের সব নাগরিকের ওই সভায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলাম ৫০-৬০ জন নানা বয়সী স্ত্রী-পুরুষ দারুণ উত্তেজনা নিয়ে তর্কাতর্কি করছিলেন, মাঝে মাঝে সবার অট্টহাসি, কখনো কেউ একটু বক্তৃতার মত দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার মাঝেই প্রায়ই বাধা আসছে। মেয়র ভদ্র-মহিলা, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন, এক একজনকে নির্বিঘ্নে কথা বলতে দিতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন; নিজেও নানা কথা বলছিলেন, মাঝে মাঝে সবাই এক একজনের কথা খুব মনোযোগ দিয়েও শুনছিলেন। জোসিয়ান নিজেও এই আলোচনায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসি ভাষা আমার অবোধ্য, পাশে জোসিয়ান সুযোগমত আমাকে বিড় বিড় করে কিছু কিছু অনুবাদ করে দিচ্ছেলেন তার থেকে কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছিলাম, এই উত্তেজনা কী নিয়ে। মাঝে মাঝে হাত তুলে ভোট নেয়া হচ্ছিলো– বেশ সরবেই সবাই সবার ভোট দিচ্ছিলেন, এবং সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হচ্ছিলো। ওটি ছিলো রাতের বেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

পরে জোসিয়ানের সঙ্গে দিনের বেলা তাঁদের শহর দেখতে বেড়িয়েছি– শ'খানেক বাড়ি অনেক মাঠ-ক্ষেত এসবের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে, দোকানপাটসহ বড় রাস্তা একটাই। যেখানে সভা হলো সেটি একটি সুদৃশ্য বাড়ি– টাউন হল। জোসিয়ান সে রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে পুরো সভাটি ব্যাখ্যা করছিলেন। মাস দুয়েক আগে নতুন পৌরসভা নির্বাচিত হয়েছে– মেয়র এবং কয়েকজন কাউন্সিলর। এটি ছিল নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম জবাবদিহিতার পালা এবং তাঁদের কিছু কিছু নীতি নির্ধারণী প্রস্তাবে সব বাসিন্দার বিতর্ক ও সমর্থন নেবার পালা, নাগরিকদের পক্ষ থেকেও নতুন প্রস্তাব আসার সুযোগ ছিল। পুরো শহরের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রায় পুরোটাই হাজির ছিলেন, অল্প কিছু মানুষ যারা আসতে পারেননি তাঁরা ছাড়া। বোঝা যাচ্ছে শহরের ভালোমন্দ নিয়ে সবার ভাবনা আছে। অনেক কিছু নিয়ে আলাপ হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়টি ছিলো কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি নিয়ে; এর উন্নয়নে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল দুই মাসে তার তেমন কিছুই হয়নি, এ নিয়ে অনেকের ক্ষোভ ছিল। ওখানে বিরোধী দল কারা, তা তারা আলাদাভাবে না বসলেও কথাবার্তার ধরণ দেখে ঠিকই টের পাচ্ছিলাম। নির্বাচিত কাউন্সিলের চেষ্টা ছিল তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোর পক্ষে সমর্থন ধরে রাখা– অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচুর বিতর্ক সত্ত্বেও তা তাঁরা পেরেছেন, তবে কিছু কিছু পরিবর্তন এনে। কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি তার মধ্যে একটি। টাউন হলের সামনে একটি ভাস্কর্য বসানো হবে তার জন্য আপাতত যে ডিজাইনটি ঠিক হয়েছে তার মডেল ছিল, প্রতিযোগিতায় এর কাছাকাছি এসেছে এমন অন্যগুলোরও মডেল ছিল। এ নিয়ে অনেকের অনেক মন্তব্য ছিল– ডিজাইনটির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত প্রয়োজন ছিল, হাজার হলেও সবাইকে প্রতিদিন এটি দেখতে হবে, তাই সবার পছন্দ হওয়া চাই।

জোসিয়ানের কাছে শুনেছি প্যারিসের কাছে সম্পন্ন মানুষদের কাউন্সিল হওয়াতে এখানকার সমস্যাগুলো এ ধরণের। কিন্তু সারা ফ্রান্সের অসংখ্য এরকম শহরের একই চিত্র নয়। মানুষের রুটি-রুজির অনেক সমস্যা সেখানে– তরুণ-তরুণীরা বেকার তাই ওরা ওখানে থাকতে চাইছে না, ওই শহরের অর্থনীতি এতে মার খাচ্ছে, ব্যবসা মন্দা। অন্য দিকে অবসরপ্রাপ্তদের সমস্যাও অনেক, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন নীতিতে তাঁরা সংক্ষুব্ধ। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া প্রয়োজন। তাই পৌর করের টাকা কীভাবে ব্যয় হবে সেই বাজেট বিতর্কেই অনেক কিছু ঠিক হয়ে যায়। একটু বড় শহরগুলোতে তরুণ-তরুণীদের

মধ্যে মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা সব সময় একটি সমস্যা, যার জন্য কাউন্সিলকে অনেক কিছু করতে হয় তারুণ্যকে সঠিক খাতে নেয়ার জন্য। তাছাড়া সব রকম স্কুলের পরিচালনার ওপর, ব্যবসা পরিচালনা ওপর কাউন্সিলের অনেক ক্ষমতা। সেখানেও এমনি করে সাধারণ সভায় সবাই মত দিচ্ছে। জোসিয়ানের কাছে জানলাম প্রতিনিধির মাধ্যমে হলেও প্যারিসে জাতীয় সংসদেও ব্যপারটি অনেকটা এভাবেই হয়– খুব উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় নীতিগুলোই শুধু ওখানে আসে, প্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে ভোট দেন, মতামত রাখেন। তবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় সরকারই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মানুষের অংশগ্রহণ আরও ঘনিষ্ঠ।

সুইজারল্যান্ডে লুজান শহরে আমি অনেকবার গিয়েছি, ওখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহযোগী আলোউইস বহু দিনের ব্যক্তিগত বন্ধু; কাছে একটি ছোট শহরে থাকেন। তাঁর কাছে নিজের শহরের কাউন্সিল, আর নিজেদের ক্যান্টন (প্রদেশ) সরকার সম্পর্কে অনেক শুনেছি– ওদেশে এরকম ২৬টি ক্যান্টন আছে, লুজান অঞ্চলের ক্যান্টনটির নাম সুগ। বলতে গেলে প্রায় সবকিছুই তারা ক্যান্টন পর্যায়েই সেরে ফেলেন– বিভিন্ন ক্যান্টনের নিয়মনীতিতে অনেক পার্থক্য, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান ভাষাও, যদিও ওদের চারটি জাতীয় ভাষাকেই সব ক্যান্টনের কাজে ব্যবহার করা যায়। সমস্ত কর কিন্তু শহর কাউন্সিল পর্যায়েই সংগ্রহ করে ফেলা হয়, ওটি তারই দায়িত্বে। তারপর কাউন্সিল তার পৌরকরের ভাগটি রেখে বাকিটা সঠিক অংশ ক্যান্টনের বাজেটে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে পাঠিয়ে দেয়। সবকিছু হয় নিচ থেকে ওপরের দিকে, ওপর থেকে নিচে নয়। লক্ষ্য করেছি রাজনৈতিক সব আলোচনা শহর কাউন্সিল আর ক্যান্টন সরকারকে নিয়েই; কেন্দ্রীয় সরকারের কথা যেন মনেই রাখে না।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রত্যেক মানুষের ওই ভোটটি– একেবারে ভাত-কাপড়-বাসস্থানের মতই গুরুত্বপূর্ণ, ওটি থাকলে বাকি সব কিছু আছে, ওটি না থাকে ওসবের আর কোন অর্থ থাকে না। ব্যক্তি-মানুষের দুঃখ-কষ্ট সব কিছু লাঘবের উপায় কোনভাবে বেরিয়ে আসে যদি তাঁর ওই ভোটাধিকারটি থাকে। সেটিই গণতন্ত্রে ম্যাজিকের মত কাজ করে। মানবাধিকার অর্জনের সেরা সংগ্রামগুলোর মধ্যে ইতিহাসের কিছু ভোটাধিকার-আন্দোলন আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে আছে; এখনো এ সম্পর্কে নতুন কিছু পেলে জানার চেষ্টা করি। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব বিরোধী এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিলো তাদের ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রাম–ওটি এখনো মহাকাব্যের মতো শেষ হয়েও

শেষ হচ্ছে না। এর মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গকে ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাওয়ার পরও মহাকাব্যের রেশ শেষ হয়ে যায়নি, যার কারণে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দক্ষিণের রাজ্য সরকারগুলোর কৌশলে ভোটার রেজিস্ট্রেশনকে কঠিন করে কৃষ্ণাঙ্গ ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। তাছাড়া লড়তে হচ্ছে রাজ্যগুলো থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণার অদ্ভুত সব আইনের বিরুদ্ধে যা ফলাফলকে নাকচ করে দেবার উপক্রম করেছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠকে ভোটের অধিকার ও মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য কীরকম মূল্যই না দিতে হলো। ১৯৭৬ এর সোয়েতো উত্থানের সময় স্কুলের ছেলে-মেয়েরা গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে বের হয়ে এলে তাদেরকে কীভাবে গুলি করে মারা হলো তার ভিডিও দেখেছি। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাছে তারা মানব সন্তান ছিল না, ছিল পাখির ঝাঁকের মত। ওটিকেই তারা রাজনীতি বল্‌তো, আর বৃটেনসহ দুনিয়ার অধিকাংশ উন্নত দেশ তাকে স্বীকৃতি দিতো।

ভোটাধিকারের জন্য সব থেকে ব্যতিক্রমী আন্দোলন যা আমার মন কেড়েছে তাহলো গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটেনে ও আমেরিকায় নারী ভোটাধিকারের জন্য 'সাফ্রোজেট' আন্দোলন। ব্যতিক্রমী এ জন্য যে যাদের ভোটাধিকারের জন্য এ আন্দোলন, এবং যারা এটি করেছেন তাদের অধিকাংশই স্বচ্ছল, শিক্ষিত, এমনকি সমাজের ওপর মহলের সদস্য– শুধু নারী বলেই তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। তাঁদের পুরুষ সহযোগীদের কেউ কেউ পার্লামেন্টে, কংগ্রেসে, আইন এনে এই অধিকার অর্জনের চেষ্টা করছিলেন; আর তাঁরা করছিলেন রাস্তার আন্দোলনে। অনেকের জীবন, সংসার এতে তছনছ হয়ে গেছে– কিন্তু আন্দোলন থামেনি। সরকার, বিরোধীদল, সমাজের বড় অংশ তাঁদের বিরুদ্ধে, কাজেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে মোটেই কাজ হচ্ছিলো না; তখন তাঁদের অস্ত্র হলো ধ্বংস যজ্ঞ; নানা স্থাপনায় আগুন লাগিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তছনছ করে, এবং শেষ পর্যন্ত রাস্তায় ছুটন্ত ঘোড়ার সামনে আত্মাহুতি দিয়ে, তাঁরা এটি আদায় করেছিলেন। যে নারীরা জীবনে কোন দিন কষ্ট দেখেননি তাঁদেরকে এসব করতে হয়েছে, অনেকে দীর্ঘকাল জেলে ছিলেন। পার্থিব কোন অভাব তাঁদের ছিল না, ছিল শুধু একটি অভাব আত্মমর্যাদার, ও নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ার জন্য ভোটের অধিকারের।

নিশ্ছিদ্রভাবে সবাইকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিজে দেখেছি বিভিন্ন নির্বাচনে বৃটেনে,ইউরোপে, আমেরিকায়;আর জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ অন্য বেশ কিছু দেশের ভোটের বিস্তারিত টেলিভিশনে দেখেছি। কোথাও

কোন হৈ চৈ নেই, আওয়াজ নেই– এখানে ওখানে ছিলো কিছু ব্যানার, পোস্টার নির্দিষ্ট জায়গায়; টিভি না দেখলে সারা শহর ঘুরে নির্বাচন যে হচ্ছে তা বোঝাও যেতো না। ভোটের দিন কাছাকাছি জায়গায় লাইন বেঁধে নীরবে ভোট দিয়ে এসেছে– অনেক জায়গায় অফিসও ছুটি থাকে না। অন্যদিকে অন্য চিত্র– আজকের পৃথিবীর অনেক দেশের বড় বড় সমস্যা, সুবিচারের অভাব, নির্যাতন ইত্যাদির মূলে দেখতে পেলে একটি জিনিসকেই বেশি দায়ী করা যাবে তা হলো গণতন্ত্র নাম ধারণ করেও সেখানে মানুষকে নিজের ইচ্ছেমত নিরাপদে ভোট দিতে দেয়া হয় না। তাই সেখানে শাসন পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে কচিৎ হয়, হলেও তার সঙ্গে আন্দোলনও দরকার হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা রূপ নেয় সহিংস আন্দোলনের। নইলে যেমনি চলছে তেমনি চলে, জবাবদিহিতার কোন উপায় থাকে না। মানুষের প্রতি সম্যব্যথী হবার বা নজর দেবার কোন গরজ কারো থাকে না।

আর কিছু দেশে ভোট প্রক্রিয়া ঠিক থাকলেও ভোট দেবার জন্য প্রার্থী কাকে পাওয়া যাবে তার ওপর কোন মতামত মানুষের থাকে না– সেটি দল ওপর থেকে ঠিক করে দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াগুলো অবশ্য হয় খুব দেখার মত, মানুষের ভিড়ের, মহা জৌলুশের, আমাদের দেশের ভাষায় যাকে বলা যায় গণজোয়ার, উৎসবমুখর পরিবেশ ইত্যাদি; সহিংসতাটিও অত্যন্ত উচ্চ পরিমাণে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারি আয়োজনেই সহিংসতা। এর সবই ব্যক্তি-মানুষের সমস্যার কাছে অর্থহীন। কিন্তু যে সব নিশ্ছিদ্র নির্বাচনের কথা ওপরে বলেছি তাতে দলের মধ্যে মনোনয়নও স্থানীয় মানুষরাই দিয়েছে, অন্তত দলের স্থানীয় সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক পর্যায়েই কোন না কোনভাবে সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। মানুষের সামনে সবরকম বিকল্প নিয়ে এসে সব দলও দলহীন ব্যক্তির নিজের প্রতি সমর্থন চাওয়ার অধিকার আছে– অতি বাম, অতি ডান, ধর্মীয়, ধর্ম নিরপেক্ষ, সবারই। এমনকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়ে যেতে চায় এমন দলও, যেমন বৃটেনে স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি, যারা ওই রাজ্যে এখন ক্ষমতায় আছে। বেছে নেবার দায়িত্ব মানুষের, ওপর থেকে অন্য কারো নয়।

তাছাড়া আরও একটি ব্যাপারে তাদের গণতন্ত্র অত্যন্ত মজবুত– সেটি হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা; সব দলেরই সমর্থক পত্রিকা রয়েছে, যে কোন সমালোচনা করতে পারে, তথ্য দিতে পারে– সেগুলো বিশ্বাস করা না করার বা গুরুত্ব দেয়া না দেয়ার দায়িত্ব মানুষের। রেডিও, টেলিভিশনের নিজস্ব ঝোঁক রয়েছে কোন না কোন দিকে, কিন্তু সবাইকে সবার কথা বলতে হয়, নইলে মাধ্যমটি কারো কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। আর রাষ্ট্রীয়

গণমাধ্যমকে তো একেবারে মেপে মেপে সব দলের কথা বলতে হয়, খুব সাবধানে থাকতে হয় কোন এক দিকে হেলে গিয়ে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় কি না। আর বিচারের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোরভাবে স্বাধীন। প্রত্যেকটি মানুষেরই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমন সব দেশ থেকেই ওই মানুষের রাজনীতি, সহমর্মিতার রাজনীতি সম্পর্কে আশার সঞ্চার হয়।

তবে ওই নিশ্ছিদ্র গণতন্ত্রেও কিছুটা ছিদ্র চলে আসে যখন টাকার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে– যেমন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে সুন্দর, ছোট ছোট টাউন হল আলোচনায় সীমাবদ্ধ নির্বাচনী প্রচারণা যখন শহরে দেখছি তখন টেলিভিশন আর রেডিওতে চলছে মহাঝড়– কে কত মিলিয়ন ডলার খরচ করতে পারে মুহুর্মুহু বিজ্ঞাপনে; তাছাড়া সাংবাদিক, গবেষক, কর্মী, নিজস্ব বাস বহর, বিমান বহর খরচের হাজারো রাস্তা। যাঁরা নিজেরা অসম্ভব ধনী নয়, অথবা যাঁরা বাণিজ্য কর্পোশেনগুলো থেকে অথবা নানা প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ মানুষ থেকে ওভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার তুলতে না পারবেন তাঁদের পক্ষে রাজনীতিতে আসা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য নির্বাচন করা প্রায় অসম্ভব। হয়তো একেবারে ছোট শহরের স্থানীয় নির্বাচনে পারেন, অন্যত্র নয়। দলের প্রার্থী হবার জন্য বিশাল সংখ্যক দলীয় ভোটারদের প্রাইমারিতে আগে জিততে হয়, সেখানেই এক দফা বিরাট ব্যয় হয়ে যায়, সেটি শুধু নিজ দলের অন্যান্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে গিয়ে। প্রতিপক্ষ দলের কথা তো আসে পরে। প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার ব্যাপারে, প্রার্থী হবার ব্যাপারে সবাই স্বাধীন, কিন্তু অর্থের প্রশ্ন উঠলে খুব অল্প মানুষই এতে পেরে ওঠে। তারপরও ব্যতিক্রম ঘটে। কেউ যখন মানুষের কাছে জনপ্রিয় হতে আরম্ভ করে তখন ধনী না হলেও মানুষই তার জন্য টাকার ব্যবস্থা করে দেয়, যেমন প্রেসিডেন্ট ওবামার ক্ষেত্রে হয়েছে– তাঁর টাকার অধিকাংশই এসেছিল কর্পোরেশন থেকে নয়, অতি সাধারণ মানুষের দশবিশ ডলার দেয়ার মাধ্যমে, যাকে তথ্য প্রযুক্তির ভাষায় বলা যায় ক্রাউড ফান্ডিং– জনতার টাকা। আরও ভালো গণতন্ত্রে উন্নত অন্যান্য অনেক দেশে কিন্তু অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারটাই নেই, ব্যয়ের কোন সুযোগই নেই, তবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সছিদ্র গণতন্ত্রের দেশগুলোতে অবশ্য ভিন্ন কথা।

বোঝাই যাচ্ছে সেই 'মানুষ আমরা', সেই ব্যক্তি-মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে প্রত্যেক দেশে সত্যিকার মানুষনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে। আর এও বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বসমাজ একযোগে দেশে দেশে মানুষের এই অধিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করলে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ব্যবস্থাটি সছিদ্রই

থেকে যাবে, নিশ্ছিদ্র কখনোই হবে না। কোথাও সেই ছিদ্র হবে অতি সূক্ষ্ম, কোথাও হবে বড় বড়, আর অনেক জায়গায় হবে পুরোটাই ছিদ্র। ছিদ্র যখন বড় হবে, ওই দেশে কিছুই মানুষের স্বার্থে হবে না, সব হবে শক্তিমানের স্বার্থে। কতগুলো মৌলিক মানবিক শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় বিশ্বসমাজ গড়ে তোলাটি যে আশু কর্তব্য হয়ে পড়েছে তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে– কোভিড-১৯-এর মত বিশ্বমারি থেকে বিশ্বের মানুষকে বাঁচানো, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো, দ্রুত অগ্রসরমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে সৃষ্ট বিশ্বজোড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এড়ানো, ইত্যাদি কারণ তো এখন স্পষ্টই দেখছি, কিন্তু সবার আগে মানুষনীতিটি প্রতিষ্ঠা করাটাও এর একটি জরুরি কারণ।

বিশ্ব ইউনিয়ন

কার্যকর বিশ্বঐক্য

অতীতে মানুষ সব সমস্যা নিজ নিজ রাষ্ট্রসীমার মধ্যেই সমাধান করার চেষ্টা করেছে; কালেভদ্রে পারস্পরিক স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, অথবা ঝগড়া বাধিয়ে যুদ্ধ করেছে। তার ভেতরেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু দেশ একত্র হয়ে সামরিক জোট ইত্যাদি করেছে, আবার কখনো শত্রু-মিত্র সবাই বৈঠক করে সমরাস্ত্রের সীমা নির্ধারণ, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ ইত্যাদির বিষয়ে চুক্তি করেছে– প্রায় সবই বড় বড় শক্তির পরস্পর প্রতিযোগিতা ও দুর্বল দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ প্রসঙ্গে। সমঝোতার লক্ষ্য ছিল ওই সব শক্তিমানদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পরিস্থিতি বদলে গেছে, তখন বিশ্বশান্তি ও বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে এক ধরণের স্থায়ী বিশ্বসংস্থা গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্‌স এসেছিলো, সেটি সফল হয়নি। প্রথমে স্থানীয় যুদ্ধ ও পরে আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ যুদ্ধ এড়াতে এটি ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাই এসেছে জাতিসংঘ– তার সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, তার বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ (শিশু তহবিল), ডব্লিউ এইচ ও (স্বাস্থ্য সংস্থা), ডব্লিউ টি ও (বাণিজ্য সংস্থা), এফ এ ও (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা), আই এল ও (শ্রম সংস্থা), ইউনেস্কো (শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা), ইউএনএইচসিআর (অভিবাসী সংস্থা) ইত্যাদি মিলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্যাণের জন্য বিশ্বজোড়া উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে প্রায় সব দেশকে এর অংশীদার করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অর্থায়নে সহায়তা ও বিশ্ব আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ (অর্থ তহবিল) কিছুটা সমান্তরাল সংস্থা হিসেবে গঠন করে। দেশে দেশে শান্তিরক্ষাটি জাতিসংঘে প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যা করা হয়। এই পরিষদেরই কিছুটা ক্ষমতা আছে সদস্য দেশের বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যবস্থা নিতে; তবে সেখানে বড় বড় শক্তিগুলোর জন্য বিশেষ ক্ষমতা রক্ষিত। নানা ক্ষেত্রে গত পঁচাত্তর বছরে জাতিসংঘ যা করেছে তা সামান্য

নয়।

ছোটবেলা থেকে আমার নিজেরও জাতিসংঘ সম্পর্কে খুবই আগ্রহ– সবকিছু গোটা বিশ্বের জন্য হচ্ছে এটি ভালো লাগতো; সব দেশের পতাকা নিয়ে এর যে পোস্টার সেটি পড়ার টেবিলে সামনে লাগিয়ে রেখেছিলাম। সেটি দেখে দেখে পতাকাগুলো একেবারে মুখস্থ চিনে রাখার চেষ্টা করতাম। বিভিন্ন সময় নতুন নতুন পতাকা তাতে যোগ হয়েছে নতুন পোস্টারে তাও দেখেছি। পরে এক সময় ঢাকায় জাতিসংঘের কয়েকটি অফিসের সঙ্গে কাজও করেছি– একেবারে শুরুতে আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীতে ইউনিসেফের নিয়মিত অর্থ সহায়তা আমাদের কাজকে দারুণ সাহায্য করেছিলো, তারো পরে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো এবং ইউএনডিপির অল্প কিছু কিছু কাজ; এনজিও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায়ও গিয়েছি– সিঙ্গাপুরে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে, এর ঢাকা দফতরেও নানা সম্মেলনে। আমাদের কিশোরী কর্মসূচির আদলে ইউনিসেফ বেশ কয়েকটি দেশে একই রকম কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছিলো। সে সব দেশের মেয়েদের নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেটের পলিং নামের শহরে কর্মশালা করেছিলাম। ওভাবে এদের কাজের কিছুটা ধরণ কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

আজ অবধি জাতিসংঘের ভূমিকা আমাদের দেশের ও বিশ্বের অন্য সব ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে জাতিসংঘ বা জাতিসংঘের ভঙ্গিতে গড়া কোন সংস্থা পুরো বিশ্বকে কার্যকর ঐক্যে আনতে সমর্থ হবে না। যে রকম ঐক্যে থাকলে ভবিষ্যতের বিশ্বমারি, অর্থনৈতিক ধস, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমাত্রায় ধন বৈষম্য, নিষ্ঠুর কোন একনায়ক বা অত্যাচারী গোষ্ঠির সৃষ্ট গণহারে মৃত্যু, ধ্বংস, নির্যাতন ইত্যাদি দমন করতে পারে এবং অন্যদিকে বিশ্বের সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। জাতিসংঘের ভঙ্গিটাই এমন যে এটি এই প্রত্যেকটি বিষয়ে সাধ্যমত সহায়তা দিতে পারে, নৈতিক উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে, সব দেশকে শান্তি ও সমঝোতায় আনার চেষ্টা করে যেতে পারে– কিন্তু কোন কিছুই নিশ্চিত করতে পারে না। সেটি বর্তমান ও অতীতের তার সব কাজ থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সব কিছু রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছার ওপরেই নির্ভর করছে, এবং প্রকারান্তে সেগুলোর সরকারের উপর।

বহু ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অবদান অপরিহার্য। শুধু আমাদের দেশের

দিকে লক্ষ্য করলেই দেখি ইউনিসেফের সহায়তায় শিশুদের টিকা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডব্লু এইচ ও'র উদ্যোগে বসন্ত রোগ নির্মূল, ইউএনএইচসিআর এর বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর দেখাশুনা– এসব কাজের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি বিশ্বজুড়ে কত খানি সাফল্য তার নিজস্ব সামর্থের মধ্যে জাতিসংঘ দেখিয়েছে। বিভিন্ন দেশে কাজ করা তার বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের অভিজ্ঞতাও অতুলনীয়। কিন্তু জরুরি সব পরিস্থিতিতে নানা দেশে নানা সংস্কৃতির মধ্যে কাজ করতে গিয়ে জাতিসংঘের দুর্বলতাগুলোও চট্ করে চোখে পড়ে। তাকে ওই দেশগুলোর সরকার ও কর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হয়, আবার সবার ওপরে নিজস্ব একটি কর্ম-সংস্কৃতিও ধরে রাখতে হয়। ফলে নিজের জন্য আপন-ভূবনের একটি ঘেরা-বেড়া দেয়া আমলাতন্ত্র তাকে সৃষ্টি করতে হয়েছে যা প্রায়শ সদস্য দেশের আমলাতন্ত্রের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা, বাহুল্য ও অপচয়ের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। একটি উভয় সংকটের শিকার হয় এগুলো– একদিকে তার জন্য ওই দেশের মানুষের খুব কাছাকাছি আসার, তাদেরকে স্পর্শ করার প্রয়োজনীয়তাটি বড় হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তা করতে হয় তার নিজস্ব আমলাতন্ত্র এবং ওদেশের নিজস্ব আমলাতন্ত্রকে ভেদ করে সেগুলোর ভেতর দিয়ে। এটি পুরো জাতিসংঘেরই সমস্যা। ভুলে গেলে চলবেনা যে এটি জাতিসমূহের অর্থাৎ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রসমূহের সংঘমাত্র, ওই সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলোর কাছেই তাকে জবাবদিহিতা করতে হয়; ওসব দেশের মানুষের কাছে নয়।

তার মধ্যে জাতিসংঘকে আবার ওই সরকারগুলোর কাছেই বেশি জবাবদিহি করতে হয় যেগুলো ধনী হওয়ার কারণে তাদের অর্থের সিংহ ভাগের যোগান দেয়। জাতিসংঘের সত্যিকার নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা ও তার আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাশালী অংশকে নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ওই ধনী সরকারগুলোর ওপরেই বর্তায়। ওসব দেশে কারা সরকারে আছে সেই অনুযায়ী অদ্ভুত সব ঘটনাও ঘটতে পারে, জাতিসংঘের ব্যয় নির্বাহের অর্থ কমেও যেতে পারে। আর নিরাপত্তা পরিষদে যে সব বিষয় যায় সেগুলোর উপর বলতে গেলে সত্যিকার ক্ষমতা থাকে পৃথিবীর শক্তিধর কয়েকটি দেশের সরকারের, যেগুলো এর স্থায়ী সদস্য। পঁচাত্তর বছর আগে তখনকার কারণে স্থায়ী সদস্য হবার পর এর মধ্যে আর কোথায় কী ঘটে গেছে তার দিকে তাকাবার সুযোগও জাতিসংঘের হয়নি। কাজেই জাতিসংঘের নিজেরই গণতন্ত্র নেই; সদস্য রাষ্ট্রের সব সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে নেই, তাদের মানুষের ক্ষেত্রে তো একেবারেই নেই, সেক্ষেত্রে বিশ্বের সব মানুষের

অধিকার, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানুষনীতি সেটি কীভাবে নিশ্চিত করবে? আসলে সেই অর্থে জাতিসংঘ কিছুই নিশ্চিত করতে পারে না, সদস্য-সরকারগুলো তার থেকে এতটাই স্বাধীন যে কোন নিয়ম-নীতি পালন করতে বাধ্য করার সুযোগ তার খুব সামান্য, এমনকি যদি সেটি বাকি সব রাষ্ট্রের সম্মিলিত সিদ্ধান্তও হয়। সেটি কিছুটা চাপিয়ে দিতে পারে তা হলো শক্তিধর কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্র যখন অন্য কোন দেশকে শাস্তি দেবার জন্য সে দেশ আক্রমণ করতে চায় (যেমন গাল্‌ফ ওয়ারে ইরাক আক্রমণ করার), এমনকি কোন রাষ্ট্রের মানুষের অধিকার খর্ব করে সেখানে আরেকটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চায় (যেমন ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টিতে), এবং তা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাশ করাতে পারে, জাতিসংঘ সেই কাজকে বৈধতা দিতে পারে একটি প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে। তবে সেটিও নিরাপত্তা পরিষদের প্রকৃতির কারণে সহজে হবার ব্যাপার নয়। এক কথায় বলতে গেলে শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে ডিঙ্গিয়ে জাতিসংঘ কোথাও কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

কাজেই জাতিসংঘ সত্ত্বেও সবার চোখের সামনে সিরিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান, রুয়ান্ডা, বসনিয়া ইত্যাদিতে চরম অরাজকতা, চরম নিষ্ঠুরতা, প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া, ও মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা রোধ করা সম্ভব হয়নি। বড়জোর জাতিসংঘ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর শরণার্থীদের কিছু সহায়তা দিতে পেরেছে। অথচ ওপরের কাজগুলো করার জন্য অন্তত তার আওতাধীন বিষয়গুলোতে সদস্য রাষ্ট্রকে ডিঙ্গিয়ে করার মত ক্ষমতা কার্যকর একটি বিশ্ব-কর্তৃপক্ষের থাকতে হবে, নইলে তাকেও ঠুটো জগন্নাথ হয়েই থাকতে হবে। আর বিশ্বমারি, জলবায়ু পরিবর্তন, ব্যাপক সন্ত্রাস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নির্বিচার প্রয়োগে বৈষম্য সৃষ্টি করে বিশ্বে আর্থ-সামাজিক চরম সংকট, ইত্যাদির মোকাবেলায় ওরকম ঠুটো জগন্নাথ বিশ্ব সংস্থা দিয়ে বিশ্বের মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এপর্যন্ত জাতিসংঘ যে অনেক কাজ করেছে, এখনো করছে, সেটি জোড়াতালি দেয়া পথে– ওই যে উনবিংশ শতাব্দীতে নানা শক্তিশালী দেশের সরকারগুলোকে কোন রকমে সময় সময় সমঝোতায় এনে দুনিয়াতে শক্তির ভারসাম্য রাখার চেষ্টা সেই আদি পথ থেকে জাতিসংঘ নীতিগতভাবে খুব একটি সরে আসতে পারেনি– কাজের পরিধি শতগুণে বিস্তৃত হলেও। বর্তমানের যে সঙ্কট সেগুলোকে পুরো বিশ্ব মিলেই সমাধান করতে হবে, তাতে শুধু কয়েক রাষ্ট্রের সমঝোতায় চলবে না। এজন্য চাই নতুন পথ।

একটি নতুন পথ কোথায় পাওয়া যাবে? তার জন্য কল্পনার ফানুস

ওড়াবার দরকার নেই, সম্ভাব্য একটি সীমিত মডেল আমাদের সামনেই আছে, আপাতত ভালোই কাজ করছে– সেটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ওরা ইউরোপের সব দেশকে একটি ইউনিয়নে নিয়ে এসেছে– যাকে তাদের সার্বিক আশা-আকাঙ্খার বড় সত্ত্বা হিসেবে গড়ে তুলেছে। এটি শুধু সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ইউনিয়ন নয়, এসব দেশের সব মানুষের ইউনিয়ন। এটি শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলোকে প্রতিফলিত করে নয় পুরো ইউরোপীয় উদার আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিদিন প্রতিফলিত করে ইউনিয়নের জন্য প্রায় স্থায়ী কিছু মূল্যবোধ, আদর্শ, নিয়মনীতি, খাদ্য-পণ্য ইত্যাদির গুণাগুণ ও পারিবেশিক স্ট্যান্ডার্ড, বিচারব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এর ব্যতিক্রম কোন দেশের কোন সরকার ইচ্ছে হলেও করতে পারবে না, এমনকি সে দেশে সেই ব্যতিক্রমটির পক্ষে জনমত সৃষ্টি হলেও। একই সঙ্গে সব দেশের সব নাগরিক, ছাত্র, কর্মপ্রত্যাশী, ভ্রমণকারী, সবার জন্য পুরো ইউরোপকে অবাধে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এমনকি অভিন্ন বাণিজ্য ও পণ্যনীতি এবং মুদ্রানীতি ও মুদ্রার মাধ্যমে সবার অর্থনীতিতেও এক রকম সাম্য ও সুরক্ষা আনার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে আলোচনা বা দর কষাকষি করে ইউনিয়নের কাজ শেষ হয়ে যায় না, সরাসরি সব মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে ওরা জোর দিয়েছে সব মানুষের মতামত ও মঙ্গলের দিকে- এজন্য কড়া নিয়মকানুন করতে পিছপা হয়নি। এতে কি ইউরোপের ঐতিহাসিক জাতি-রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব কমে গেছে? কিছুতো কমেছেই– সেটুকু তারা স্বেচ্ছায় ইউনিয়নের হাতে সোপর্দ করেছে, শুধু যেসব ক্ষেত্রে দরকার সেগুলোই সোপর্দ করেছে, অন্যগুলো নয়। বিনিময়ে তারা পেয়েছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে প্রত্যেকের নিজেদের স্বকীয়তাগুলোকে উপভোগের নিশ্চয়তা।

হাজার বছরের গর্বিত ফরাসি কি তার ফরাসিত্ব বিন্দুমাত্র ত্যাগ করেছে, অথবা গর্বিত জার্মান জার্মানিত্ব? এদের যে জাতীয়তার গর্বের হাতে সারা দুনিয়া ইতিহাসে বার বার কেমন নাকানি চুবানি খেয়েছে তার ধার কখনো কমেনি। এখন অন্যকে নাকানি চুবানি না খাওয়ালেও নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, বৈশিষ্ট, নিজের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম-শহরগুলো নিয়ে এখনো তাদের গর্বের কোন সীমা নেই। শুধু তারা কেন– ইতালিয়, স্প্যানিশ, পতুর্গিজ, আইরিশ, পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরিয়ান– ওরাও বা কম যায় কোথায়? ওদেরকে যারা চেনে তারা বিলক্ষণ জানে যে এরা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেনা তারা কেমন আইরিশ বা হাঙ্গেরিয়ান। এর পতাকা তুলে ধরার

জন্য ওরা করেনা এমন কিছু নেই। নিজের জাতীয়স্বার্থে তারা কাউকে এক চুলও ছাড় দেয় না, ইউনিয়নের মধ্যেও সেটি নিয়ে দর কষাকষি চালিয়ে যায়। কিন্তু পার্থক্য হলো সেই সঙ্গে তারা আরও একটি পতাকা গর্বের সঙ্গেই ওড়ায় সেটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীল জমিনে সোনালী তারা চক্রের পতাকা। এর মাধ্যমে তারা ইউরোপীয় সমৃদ্ধি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও সুরক্ষাকে নিশ্চিন্তে উপভোগ করে। অথচ ইউনিয়নে আসার আগে এগুলো অনেকের জন্য নিশ্চিত ছিল না।

ইউরোপের এক রকম একই ধাঁচের ও একই পূর্ব ইতিহাসের, মোটামুটি সমৃদ্ধ মানুষগুলোর জন্য যা সম্ভব হয়েছে তা কী পুরো বিশ্বের এতটা ভিন্ন প্রকৃতির সব দেশের জন্য আদৌ সম্ভব হবে? সেটি মোটেই সহজ হবে না, কিন্তু সেটিই হতে হবে, এছাড়া আমাদের সামনে উপায় নেই। সেদিকেই আমাদেরকে যেতে হবে, হয়তো হুবহু ইউরোপীয় ইউনিয়ন হবে না, হয়তো তার কাছাকাছি হবে, চাই কি তার চেয়ে ভালোও হতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে সেই পথেই হাঁটতে হবে। প্রথম যাঁরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন তখন তাঁদেরকেও একই দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সদ্য পরস্পরের রক্তে স্নাত হয়ে আসা, পরস্পরকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া এই দেশগুলো এরকম একটি ইউনিয়নে আসতে পারবে– বিজয়ী-পরাজিত সবাই একত্র হয়ে– সেটি কোন পাগলেও তখন বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সেটি হতে সময় লাগেনি। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে অভিন্ন নীতির মধ্য দিয়ে শুরু হলেও পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে তারা কেমন করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সবাই মিলে চট্ চট্ লাফ দিয়ে দিয়ে একরকম কার্যকর একটি ইউনিয়ন তৈরি করে ফেলেছে। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় সেই সুবচন ওরা হাতে নাতে প্রমাণ করে দিয়েছে।

তাই ইউরোপীয় ইউনিয়নকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছে আমাদের পুরো বিশ্বকে সেই পথেই হাঁটা উচিত, এবং সেটি খুব দ্রুত লয়ে, কারণ সমস্যাগুলো আমাদের মাথার ওপর এসেই পড়েছে। ঢাকার দেয়ালে চিকা লেখায় বা হাতে লেখা পোস্টারে যখন দেখি 'ভিসামুক্ত বিশ্ব চাই'– তখন তার মধ্যে বিদেশে যেতে অক্ষম বেকার যুবকের আর্তনাদ দেখি, কীভাবে কোথাও একটি কাজ সে খুঁজে পাবে তার ফরিয়াদ দেখি বিশ্বের কাছে। কোন সমস্যাটি মাথর উপর এসে পড়েনি? কোভিড-১৯ই কি শেষ বিশ্বমারি? দেড় ডিগ্রির মধ্যে ভূ-উত্তাপ রাখা কি শুধু প্রতিশ্রুতিতেই থেকে যাবে, আমাদের মত দেশগুলোকে, এবং পুরো দুনিয়াকে তার জন্য কি চরম মূল্য দিতে হবে? দুনিয়ার সব সম্পদ কি গুটিকয়েক ডিজিট্যাল

কোম্পানির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে চলেছে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সব সম্পদকে কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে কতদিন বাকি? যদি বিশ্ব ইউনিয়নের পথে হাঁটতে চিন্তাশীলদের চিন্তা এগিয়ে যায় তার পথের বিস্তারিত মানচিত্র বিজ্ঞজনরা দেবেন, আপাতত এখানে আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে একটু তাকাতে চাই তার পটভূমি, ইতিহাস, অগ্রগতি, সমস্যাগুলোর দিকে; এমনকি তার মধ্যে ভাঙ্গনের যে সব উপাদান দেখা যায় সেগুলোর দিকেও, ব্রেক্সিটের রূপে যেই একটি ভাঙ্গন খুব সম্প্রতি ঘটে গেছে তার দিকেও। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নই আমার চিন্তায় 'বিশ্ব ইউনিয়নের' একটি মডেল– নামটিও তার অনুকরণেই আপাতত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু খুঁটিনাটি থেকে হয়তো ওই বিশ্ব ইউনিয়নের পথে হাঁটার কিছু পাথেয় খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঐক্যের পথে পথে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্য আঞ্চলিক জোটগুলোর মতই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু সেভাবে বেশিদিন থাকেনি, পুরোপুরি ইউনিয়ন হয়ে উঠেছে। ওরকম আঞ্চলিক জোট অনেক আছে কিন্তু সেগুলো ইউনিয়ন হয়নি, হতে চায়ওনি। ওগুলো তাদের সীমিত সহযোগিতার মধ্যেই রয়ে গেছে– শুল্কমুক্ত বাণিজ্য, কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ নীতি ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন কোনটি তো এখন নামে মাত্রেই পর্যবেশিত হয়েছে, যেমন আমাদের বহু স্বপ্ন দেখা সার্ক। এগুলোর মধ্যে বেশি সফল বলে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ানের কথাই যদি বলি এর সদস্য রাষ্ট্র থাইল্যান্ড ও মায়ানমারে গণতন্ত্রের দারুণ ব্যত্যয় বার বার ঘটলেও এ নিয়ে আসিয়ানের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। মায়ানমার তার দেশের রোহিঙ্গা অধিবাসীদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে প্রধানত বাংলাদেশে এবং অপর কিছু কিছু দেশে অসহায় শরণার্থী হতে বাধ্য করলেও, এমনকি সেভাবে আশ্রয় দানকারীদের মধ্যে আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্র থাকলেও, এর জন্য আসিয়ান কিছুই করতে পারেনি, খুব একটা চেষ্টাও করেনি। এসবকে যার যার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে ছেড়ে দিয়েছে– আসিয়ানের সদস্য হিসেবে মায়ানমার তার সকল সুযোগ সুবিধা বজায় রেখেছে। শুধু অতি সম্প্রতি মায়ানমারের সামরিক সরকার তার নিপীড়নের জন্য সারা বিশ্বে নিন্দিত হলে আসিয়ান তার সরকার প্রধানকে আসিয়ানের সভায় উপস্থিত থাকা থেকে বিরত রেখেছে কিন্তু তারপরেই আবার আসিয়ানের অন্যতম নেতা তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন। এমন জোট যে কিছু অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক

সুবিধা লাভ ছাড়া আর কোন ঐক্য অর্জন করতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য– তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত ইউনিয়ন আরও অনেক কিছু পারে।

যে কোন পর্যায়ে মানুষ যখন সুদূর সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে মনস্থ করে তখন সেই ঐক্যকে তারা যত ইচ্ছা শক্তিশালী করতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে এই ইউরোপীয় ইউনিয়নেরই দুটি খুব প্রধান সদস্য রাষ্ট্র ইতালি ও জার্মানির কোন অস্থিত্বই ১৮৭১ সালের আগে অবধি ছিল না। একই ভাষা ও ঐতিহ্যের অনেকগুলো ছোট ছোট দেশ স্বেচ্ছায় ও নানা রকম বাধা অতিক্রম করে ওভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার মাধ্যমে ইতালি ও জার্মানি সৃষ্টি করেছিলো। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেখানে কিছুদিন থাকার সময় ইতালির নানা শহরকে কাছে থেকে দেখেছি। তখন সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা তত সোচ্চার হয়নি, এই ইউনিয়ন গড়ার নায়কদের কথাও সেখানে শুনিনি– কিন্তু তার প্রতিটি শহরে পথে পথে দেখেছি কয়েকটি নাম একটু পরে পরেই ঘুরেফিরে আসছে– মাৎসিনি, গ্যারবাল্ডি, কাভুর। প্রত্যেক জায়গায়, এমনকি প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি রাস্তা, একটি চত্বর, একটি মুর্তি তাঁদের নামে থাকবেই, এঁরা হলেন ইতালির ঐক্যবদ্ধ করণ প্রক্রিয়ার বড় নায়ক– সে প্রক্রিয়াকে তারা বলে রিসরজিমেন্টো অর্থাৎ পুনর্জাগরণ; সুদূর অতীতে রোমান সাম্রাজ্যে তারা এক দেশ ছিল তারই আবার জাগরণ। কোন কোন জায়গায় চত্বরের নামটাই রিসরজিমেন্টো। আজকে যা ইতালি ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত তা অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিলো– কোন কোনটি স্বাধীন, কোন কোনটি কার্যত পরাধীন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ এই বছর বিশেকের একটি অত্যন্ত জোরালো সামাজিক আন্দোলন এই পুরো অঞ্চলে দেখা দেয় যার ফলে ইতালি আজকের এক রাষ্ট্রের রূপ লাভ করতে পেরেছিলো।

এর ওই যে তিন বড় নায়ক তাঁদের প্রত্যেকের কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। মাৎসিনি ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনকারী– বিপ্লবী পত্রিকা বের করে, গোপন নানা গ্রুপকে সক্রিয় রেখে, ওখানকার প্রত্যেকটি দেশে 'জিওভানি ইতালিয়া' (তরুণ ইতালি) নামের যুব সংগঠন গড়ে তুলে, তিনি আন্দোলনটিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন, এজন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে, দীর্ঘ সময় বিদেশে পালিয়ে থাকতে হয়েছে; কিন্তু যেখানেই থাকুন ২০টি বছর পুরো এলাকাকে রিসরজিমেন্টোর পক্ষে অস্থির করে রেখেছেন নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে। অন্যদিকে গ্যারিবাল্ডির মূর্তি যত দেখেছি সবই ঘোড়সওয়ার বীরের বেশে– সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তিনি লাল কোর্তা বাহিনী নামের একটি গেরিলা দল গড়ে তুলেছিলেন– শুরুতে ইতালির পুরো

প্রায় দক্ষিণাংশ জুড়ে থাকা বিদেশি শক্তির মদদপুষ্ট 'দুই সিসিলি' নামের রাজ্যটিতে। লালকোর্তা বাহিনী মানুষের এত সমর্থন পেয়েছিলো যে ওই রাজ্যের পতন ঘটেছিলো তার হাতেই। ফলে একজন গেরিলা বীর হিসেবে গ্যারিবাল্ডির যে উপাখ্যান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো যেটি ইতালির অন্যান্য সব রাষ্ট্রেও রিসরজিমেন্টোর প্রতি প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এর সুযোগে পীডেমোন্ট দেশটির রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল একত্রীকরণের বাণী নিয়ে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দখলে থাকা উত্তরের ছোট ছোট দেশগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে অষ্ট্রিয়ানদের বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন। কাভুর ছিলেন পীডেমোন্টের প্রধানমন্ত্রী– তাঁর রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে রাজা করে একীভূত ইতালিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। শেষ বড় বাধাটি ছিল রোমের চারিদিকে বিরাট অঞ্চলে ধর্মগুরু পোপের রাজ্যকে এতে আনা, যেই রোমকে ইতোমধ্যে আগেই ঐক্যবদ্ধ দেশের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে। সেটি সম্ভব হয়েছে কাভুরের কূট-কৌশলে। তিনি চাচ্ছিলেন মাৎসিনি ও গ্যারিবাল্ডির বিপ্লবী প্রভাব থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে নতুন ইতালিকে কম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে। একজন পুরানো ধাঁচের অভিজাত কেতাদুরস্ত ধূরন্দর রাজনীতিবিদ হিসেবে এটিই তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। রিসরজিমেন্টো সম্পূর্ণতা লাভ করে ১৮৭১ সালে এসে। তিন নায়কের বিভিন্নমুখী অবদানের মধ্য দিয়ে গেলেও এর মূল চালিকাশক্তি ছিল মানুষের আকাঙ্খা। এর একশ' বছরেরও কিছুটা বেশি সময় পরে ইতালির নানা শহরে নানা মানুষে আমি সেই আকাঙ্খার রেশটি অনুভব করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারপর আরও ৫০ বছরে এর বিন্দুমাত্র কমায়নি।

জার্মানিও ওই একই বছর তার মধ্যে থাকা অনেকগুলো ছোটবড় রাষ্ট্রের একত্রীকরণ সম্পূর্ণ করেছে। সব থেকে শক্তিশালী ছিল প্রাশিয়া, বার্লিন যার রাজধানী; তার কাছাকাছি ছিল দক্ষিণে ব্যাভারিয়া, মিউনিখ যার রাজধানী। বাকি সব খুবই ছোট, কিন্তু একেবারে স্বাধীন। এদের একত্রীকরণে ইতালির মত এত চমক ছিলনা– আর যে একজন মানুষ এর বড় নায়ক সেই বিসমার্কও তেমন চটকদার মানুষ ছিলেন না, যদিও অত্যন্ত বিশাল ব্যক্তিত্বের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমস্ত জার্মানভাষী মানুষের আকাঙ্খাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন প্রধানত প্রাশিয়ার গৌরব বাড়াতে। অস্ট্রিয়াও জার্মানভাষী দেশ ছিল। বিসমার্ক সুকৌশলে অষ্ট্রিয়াকে বাইরে রেখেই (প্রাশিয়ার সমকক্ষ কাউকে তিনি এতে চাননি) প্রথমে ১৮৬৬ সালে কিছুটা ঢিলেঢালা ধরণের নর্থ জার্মান কনফেডারেশন গঠন করেন

এবং পরে ১৮৭১ সালে ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধে জয়কে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী 'জার্মান সাম্রাজ্য'– প্রাশিয়ার রাজাকেই সম্রাট (কাইজার) করে। বিসমার্কের বড় সুবিধা ছিল তাঁর বিচক্ষণ রাজনীতি এবং প্রাশিয়ার খুব উচ্চমানের সেনাবাহিনীর প্রতি সব জার্মানদের আকর্ষণ। তবে এক জার্মানির প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছিল বহুদিন থেকে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আরও কিছু দেশ অপেক্ষাকৃত নানা ছোট দেশের সমন্বয়ে সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছিলো– যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, শ্লোভাকিয়া, সাইলেশিয়া, রুথানিয়াকে একত্র করে গঠিত হয়েছিলো চেকোশ্লোভাকিয়া। পরে অবশ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য থাকা কালেই এটি আপোষে চেক ও শ্লোভাকিয়া এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে– উভয়েই ইউনিয়নের পৃথক সদস্য হিসেবে থেকেছে। আবার অন্যদিকে ওই প্রথম মহাযুদ্ধের পরই অস্টো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অধীনের শ্লাভ জাতিগোষ্ঠির বিভিন্ন রাজ্যকে সার্বিয়ার সঙ্গে একত্র করে যুগোশ্লাভিয়া (দক্ষিণ শ্লাভদের বাসভূমি) দেশটি গঠিত হয়। পরে যুগোশ্লাভিয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ভেঙ্গে গেলে তার স্বাধীন রাজ্যগুলোর দুটি স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য, অন্যগুলো যোগদানের চেষ্টায় রয়েছে। বৃহত্তর ঐক্যের উপলব্ধি এবং তার জন্য চেষ্টা দেশে দেশে নতুন কিছু নয়, মাঝে মাঝে বিভক্তির কারণ ঘটলেও।

তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যা হয়েছে, তা অতুলনীয়। এর ধাপে ধাপে জন্মকাহিনিটি খুব সুন্দর, কারণ এটি একেবারেই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ও এক একটি পর্যায়ে ঐক্য অর্জন করেছে। এর প্রাথমিক অবস্থায় নানা দেশের কয়েকজন দূরদর্শী মানুষ যার যার মত করে ব্যক্তিগত চিন্তায় এর স্বপ্ন দেখেছেন, এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিকের উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করে সরকারগুলোকে এই লক্ষ্যে কাজে নামিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর কনরাড এডেনেয়র, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী পল হেনরি স্পার্ক, লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ বেখ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী আলচিডে গাসপেরি এবং বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। এঁরা সবাই যার যার দেশের সরকার-প্রধান হয়েও একটি ইউরোপীয় সত্ত্বার মধ্যেই নিজের চিন্তাকে নিবদ্ধ করেছিলেন, চার্চিলতো একটি নামই দিয়ে দিয়েছিলেন– ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইউরোপ। আরও দুজন রাজনীতিবিদ এতে আরও গভীর মনোযোগ দিয়েছেন দুজনই দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী– ফ্রান্সের রবার্ট শ্যুমান এবং

হল্যান্ডের ইয়োহান বেয়েন। তবে আরও সুদূরপ্রসারী গভীর চিন্তায় যাঁরা ইউরোপীয় স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা রাজনীতিবিদ ছিলেননা– তার মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ মনে, এবং জার্মান অধ্যাপক ভাল্টার হালস্টাইন। তাঁরা সবাই সেই পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে একটি সুদূরপ্রসারী স্বপ্নকে শক্ত একটি ভিত্তি দিচ্ছিলেন মাত্র। চূড়ান্ত লক্ষ্য তখনো তখনো অনেক দূর।

বিশ্ব ইউনিয়নের লক্ষ্যকে সম্ভব করে তুলতে হলে এর থেকেও অনেক বেশি জটিল পথ অতিক্রম করতে হবে, আর তার জন্য প্রয়োজন আরও সাহসী সব স্বপ্নদ্রষ্টা ও সমঝোতা স্থাপনকারী– পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এখনই তাঁদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ব ইউনিয়নের প্রথম পদক্ষেপগুলো নেয়ার সময় এসে গেছে বহু আগে থেকেই। জাতিসংঘেই তার প্রাথমিক আলোচনা শুরু হতে পারে, স্বপ্নদ্রষ্টারা সেখানেই এগিয়ে আসতে পারেন। অথবা যে যেখানে আছেন আপাতত নিজের মত করেই উপায়-উপকরণের কথা নিয়ে আসতে পারেন যে কোন ফোরামে আলোচনা শুরুর জন্য; সেই সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক কিছু বিষয়ে পূর্ণ অভিন্ন নীতি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এভাবেই শুরু হয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরস্পরকে ধ্বংস করা যজ্ঞ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর পর দুই পক্ষের ছয়টি দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও লুক্সেমবুর্গ তাদের কয়লা ও ইস্পাত শিল্পকে একই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অভিন্ন একটি কয়লা ও ইস্পাত সংস্থা গঠন করেছিলো– ওটি ছিল ইউনিয়নের প্রথম পদক্ষেপ, অত্যন্ত বিনীতভাবে। ১৯৫৭ সাল আসতে আসতে এই সীমিত সংস্থাটিই পরিণত হলো ইউরোপীয় কমন মার্কেটে– ভালো নাম ইউরোপীয় ইকনোমিক কম্যুনিটি– ঐক্যবদ্ধ একটি সত্ত্বা। এটি একটি কম্যুনিটি যার অর্থনীতিকে এক সূত্রে গাঁথার সাহসী সব পদক্ষেপ নেয়া হলো। ১৯৬৯ সালের মধ্যে দেশগুলোর মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে কোন কাস্টম শুল্ক তো রইলই না, পুরো অঞ্চলে কোন খাদ্য কত উৎপাদন হবে তাও এই কম্যুনিটি ঠিক করে দিলো যাতে কোন জায়গায় খাদ্যাভাবও হতে না পারে, আবার কৃষি পণ্যের মূল্যও রক্ষিত হয়। একটি দেশ যেভাবে তার নানা অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা করে, কম্যুনিটিও সবগুলো সদস্য দেশের জন্য অনেকটা তাই করলো। ১৯৭২-৭৩ সালে ছয় বেড়ে নয় হলো– বৃটেন, আয়ারল্যান্ড, ও ডেনমার্ক এই কমন মার্কেটে যুক্ত হলো। এর মধ্যে এই নয়টি দেশের নিজস্ব আইনে এমন সব পরিবর্তন আনা হলো যেন এটি কম্যুনিটির অভিন্ন আইনে পরিণত হতে পারে। ১৯৭৯ সালে ঘটলো আর

একটি বিশাল পদক্ষেপ– এতদিন সবকিছু নয়টি দেশের সরকারের পর্যায়ে হচ্ছিলো, এ বছর সেটি সম্প্রসারিত হলো দেশগুলোর সব মানুষের পর্যায়েও। সব দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভোটের ভিত্তিতে তৈরি হলো ইউরোপীয় পার্লামেন্ট– এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা– নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের একটি পর্যায় এখন সরাসরি চলে গেলো সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় জনগণের কাছে। নির্বাহী, আইনি এবং বিচারিক সব দিক থেকে একটি অভিন্ন ইউরোপীয় সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯৮১ সালে গ্রিস এবং ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল যোগ দিলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো বারোতে। শেষের দুটি দেশের যোগ দিতে এত দেরি হবার কারণ ছিল ওই দুটি এতদিন গণতান্ত্রিক দেশ ছিল না, ছিল যথাক্রমে ফ্রাঙ্কো ও সালাজারের অধীনে একনায়কতন্ত্রের দেশ। ওই বছর এ দুই একনায়কের পতন হলে এবং দেশ দুটিতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই এরা ইউরোপীয় কম্যুনিটির অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে। এর মধ্যে ছয় বছরে ধাপে ধাপে এগিয়ে ১৯৮৫ সালে কম্যুনিটির দেশগুলো পূর্ণ কাস্টম ইউনিয়নের মধ্যে চলে এসেছে– অর্থাৎ এটি একেবারেই অভিন্ন বাজারে পরিণত হলো, প্রায় এক দেশের মত; কম্যুনিটির বাইরের যে কোন দেশের সঙ্গে করা সব বাণিজ্যনীতি বা শুল্কনীতি সব পণ্যের ক্ষেত্রে পুরো কম্যুনিটির ওপর অভিন্নভাবে প্রযোজ্য হবে, কোন দেশ একা সেটি স্থির করবে না। কম্যুনিটির শক্তি বাড়লো যখন ১৯৮৯ সালে পূর্ব জার্মানির কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রটির ইতি হয়ে জার্মান একত্রীকরণ সম্ভব হলো। পরের এক দশকে যা হলো সেটি আরও চমকপ্রদ। এতদিন অভিন্নতা শুধু পণ্য, বাণিজ্য, কৃষির মত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, এসব অবাধে চলতো, অভিন্ন নীতিতে চলতো। এখন এটি সম্প্রসারিত হলো মানুষের চলাচলে এবং শ্রমের চলাচলে।

দেশগুলোর মধ্যে চলাচলে নিজেদের জন্য কোন ভিসা প্রয়োজন হলো না। ইউনিয়নের বাইরে থেকে যারা আসবে তারা এক সঙ্গেই সবগুলো ভিসা পাবে– এ সম্পর্কিত চুক্তির স্থানটির নামে সে ভিসা সারা দুনিয়ায় 'শেনগেন ভিসা' নামে পরিচিত। একবার এটি নিয়ে কম্যুনিটির যে কোন একটি দেশে ঢুকলে অন্য সব দেশে তার অবাধ চলাচল সম্ভব। দু'একটি দেশ অবশ্য এই সুবিধা দেয়া থেকে বিরত রইলো– যেমন বৃটেন। দেশগুলোর যে কোনটির মানুষ অন্য দেশে অবাধে কাজ নিয়ে কাজ করতে পারে, যে কোন ছাত্র অন্য দেশে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে, যাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থাও হলো। অভিন্নতা এতটাই হলো যে একে আর কম্যুনিটি বা

এক সমাজ বলাটি যথেষ্ট হলো না, ১৯৯৩ সালে এটি হয়ে গেলো প্রয়োজনীয় সবগুলো ক্ষেত্রকে জড়িয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সত্ত্বা, একটি ইউনিয়ন– ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইতোমধ্যে অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন এতে যোগ দিয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ এর মধ্যে এসব সম্পন্ন হলো, পরের দশ বছরে ২০০১ থেকে ২০১০ এ আরও যেসব অকল্পনীয় অভিন্নতা তৈরি হলো তার মধ্যে প্রধান ছিলো অভিন্ন মুদ্রা ইউরোর প্রচলন– এক এক দেশের এক এক মুদ্রা মার্ক, ফ্রাঙ্ক, লিরা, শিলিং ইউরোতে বদলে নেয়া হলো, একই মুদ্রানীতির অধীনে চলে আসলো সবাই– বৃটেনসহ কোন কোন দেশ অবশ্য এই 'ইউরোজোনের' বাইরে রইলো, কারণ তারা নিজের মুদ্রানীতির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছিলো। ইউরোজোনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে পরস্পরের সঙ্গে বিশাল পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের সবার জন্য সুবিধাজনক অভিন্ন মুদ্রানীতি করা যাবে এমন আস্থাটি বেশ দুঃসাহসী কাজ ছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নানা পরিস্থিতিতে বহু টানাপোড়েন গেছে, কিন্তু ইউরোজোন আজ অবধি টিকে আছে।

ভূতপূর্ব কম্যুনিস্ট দেশ বা তার অংশগুলো যোগ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টিতে যদিও খুব সম্প্রতি বৃটেন এটি ছেড়ে যাওয়ায় সেটি ২৭ এ নেমে এসেছে। এদের মধ্যে ১৯টি সদস্য ইউরোজোনে আছে, অভিন্ন মুদ্রানীতির কড়াকড়ি নিয়ম কবুল করে যারা পেরেছে তারাই এতে আছে, বাকিরা যখন পারবে তখন আসবে। অভিন্ন মুদ্রানীতির অনুসরণে শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশ একেবারেই স্বাধীন, কিন্তু তাদের অভিন্ন বিষয়গুলোর পরিচালনার ভার চলে গেছে ইউনিয়ন পর্যায়ের পার্লামেন্ট, বিভিন্ন দপ্তর, কোর্ট, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সবই তাদের সরকার ও তাদের মানুষেরই সৃষ্টি। এর শাসন চালাবার জন্য রয়েছে ইউরোপীয় কাউন্সিল ও ইউরোপীয় কমিশন। কাউন্সিল সরকারসমূহের সমন্বয়ে গঠিত যাদের মধ্যে এক একটি দেশ ছয় মাসের জন্য প্রধান ভূমিকা নেয়, প্রেসিডেন্সির দায়িত্বে থেকে। কাউন্সিলই নীতি নির্ধারণ করে; সে অনুযায়ী কমিশন আইন প্রস্তাব করে যা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশ হতে হয়। নীতি বাস্তবায়নের ভার ইউরোপীয় কমিশনের ওপর– কাউন্সিল কমিশনকে নিয়োগ দেয়। তবে নিয়োগের সময় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টের পরামর্শ নিতে হয় এবং পরে প্রত্যেকটি নিয়োগকে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে হয়। কমিশনের সদস্য এক একজন কমিশনার এক একটি দপ্তরের যেমন

অর্থনীতি, কৃষি, জ্বালানি, পরিবেশ ইত্যাদির নেতৃত্ব দেন, যার জন্য রয়েছে একটি বহুদেশীয় আমলাতন্ত্র। তাঁরা পুরো ইউনিয়নের কর্ম পরিচালনা করেন প্রধানত ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেন্দ্র বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে। কিন্তু পার্লামেন্টের কেন্দ্রটি হলো ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ নগরে। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হোন। ইউরোপীয় কোর্টই পুরো ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কোর্ট, সব বিবাদে তার রায়ই চূড়ান্ত। দেশীয় কোন উচ্চতম কোর্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল্যবোধ ও অভিন্ন আইনের বিরুদ্ধে কোন রায় দিলে ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কোর্ট সেখানেও হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ইউনিয়নে টানাপোড়েন

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত একটি ঐক্য ব্যবস্থায় টানাপোড়েন থাকবে এটিইতো স্বাভাবিক– বিশেষ করে এরকম কোন দুঃসাহসী প্রচেষ্টা আগে যেখানে কোনদিন হয়নি। প্রত্যেকটি ধাপে নতুন ঐক্যের প্রস্তাব যখন করা হয়েছে তখনই নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এতটা ঘনিষ্ঠ ঐক্যকে কার্যকর করা যাবে কি না। তাই বহু তর্ক-বিতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে– তা কমন মার্কেটের জন্যই হোক, কাস্টম ইউনিয়নের জন্যই হোক, অভিন্ন আইনের ব্যাপারে হোক, অভিন্ন কৃষি ও খাদ্যনীতির জন্য হোক, শেনগেন ভিসা প্রবর্তনের জন্য হোক বা অভিন্ন মুদ্রানীতি ও ইউরোজোনের জন্যই হোক। এক একটি ধাপ যেন ছিল যেন এক একটি সুউচ্চ পর্বত আরোহণ, কিন্তু সেই আরোহণ তারা করেছে। প্রথম যে ছয়টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় কম্যুনিটি গঠিত হয়েছিলো, সেগুলো ছিল একই রকম দেশ– ধনী, শক্তিশালী, অনেকটা একই সংস্কৃতির। সেখানে সমস্যা কম ছিল। কিন্তু যতই গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগালের মত অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতি ও বেশ খানিকটা ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জগুলো বেড়েছে। তারপর যখন কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে সদ্য বের হয়ে গণতান্ত্রিক হওয়া দেশগুলোও ইউনিয়নে এলো তখনতো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ। অন্তর্ভূক্তির প্রক্রিয়াটিও সহজ ছিলনা– সবাই একমত হয়ে নতুন কোন দেশকে এর মধ্যে ঢুকানোটি যথেষ্ট দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রক্রিয়া ছিল। নতুন দেশকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে সে যোগ্য, ইউরোপীয় মূল্যবোধ, গণতন্ত্রের নীতি ও এর শৃঙ্খলা পালনে দেশটি প্রস্তুত, যদিও তার আগের ইতিহাস হয়তো ভিন্ন রকমের। এখনো কয়েকটি দেশ দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে বহুদিন হলো– যেমন সার্বিয়া, ম্যাসিডোনিয়া,

বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়া, কসোভো ইত্যাদি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে ইউনিয়নে সংকট দেখা দিয়েছে তা তারা সমাধান করেছে। বিশেষ করে ২০০৮ সনের মহামন্দার সময়ের ও তারপর ২০১২ সনে ইউরোজোনের সংকটগুলো ছিল খুবই বড়– এঙ্গেলা মের্কেলের মানুষনীতি প্রসঙ্গে সেটি আমরা দেখেছি। দেশের স্বার্থ ও ইউনিয়নের স্বার্থ কোন কোন সময় সাংঘর্ষিক হয়েছে, তারচেয়েও বেশি দেশের শাসকগোষ্ঠির স্বার্থ ও ইউনিয়নের স্বার্থ। কিন্তু ইউনিয়ন যেহেতু শুধু শাসকদের ওপর নির্ভর করেনা সব দেশের মানুষের ওপরও নির্ভর করে সেসব সংকট উতরানো সম্ভব হয়েছে।

টানাপোড়েনের সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। জার্মানি যখন উদার অভিবাসন নীতি নিয়ে তাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিতে পরিণত করার চেষ্টা করলো তখন বড় কিছু দেশ সীমিত সমর্থন দিয়ে ইউনিয়নের সব সদস্যের অভিবাসী গ্রহণের এক রকম কোটা ঠিক করে দেবার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হাঙ্গেরি, গ্রিস, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি কিছু দেশে, এমনকি শক্তিশালী সক্ষম দেশ ইতালিতে এর বিরুদ্ধে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এসব দেশে অভিবাসন বিরোধী এবং ইউরোপ-সন্দিহান রাজনৈতিক দলগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এগুলোর কোন কোনটি সরকারে যোগ দিয়ে বা সরকারকে প্রভাবিত করে দেশগুলোতে বৈরি নীতি প্রণয়ন করা শুরু করেছে। এযাত্রা অবশ্য ইউনিয়ন সার্বিক তেমন ঝুঁকিতে পড়েনি, শুধু একটি বড় ধাক্কাই খেয়েছে যা হলো বৃটেনের ইউনিয়ন ত্যাগ, যেটি আরও জটিল বিষয়, এর কথায় একটু পর আসছি। ওই সব দেশ আতঙ্কিত হয়েছিলো দক্ষিণ দিক থেকে আসা অভিবাসীদের স্রোত দেখে। আরও সম্প্রতি উত্তর দিকে রাশিয়ার সহযোগী বেলারুশ দেশটি খুব সম্ভব ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বেকায়দায় ফেলার জন্য অভিবাসীদেরকে তার দেশে আসতে দিয়ে তার সীমান্ত দিয়ে পোল্যান্ড ঢুকানোর চেষ্টা করছে– যার ফলে পোল্যান্ডের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের টানাপোড়েনের আর একটি বড় মাত্রা যোগ হয়েছে। অন্য মাত্রাগুলোও বেশ সমস্যা সংকুল। পোল্যান্ডের এবং হাঙ্গেরির উভয়ের সরকারে বেশ কিছু দিন ধরে অগণতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছিলো; দেশ দুটিতে কিছু আইন পাশ করা হয়েছে যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি ও মূল্যবোধের বিরোধী; এমনকি কোন কোনটি মানবাধিকারেরও। সর্বশেষ যা করা হয়েছে তা আরও ক্ষতিকর– পোল্যান্ড তার নিজস্ব কোর্টের ওপর ইউরোপীয় কোর্টের রায়ের অগ্রগণ্যতাকে অস্বীকার করে আইন প্রণয়ন করেছে।

এগুলো সবই ইউনিয়নের ভবিষ্যতের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং অন্যান্যদেরকে তা করতে উৎসাহিত করে ইউনিয়নের জন্য অশনি সংকেত ডেকে আনতে পারে। এগুলোর প্রত্যেকটির প্রতিকার ব্যবস্থা ইউনিয়নের নিয়মের ভিতরেই আছে, যেমন এর গণতান্ত্রিক, মানবাধিকার ও অন্যান্য যে কোন নীতি ভঙ্গ করলে ও সর্বোচ্চ কোর্টের রায় প্রতিপালন না করলে তার জন্য পর্যায়ক্রমে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে– যেমন ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্য তহবিল আটকে দেয়া, ও নানা সুযোগ সুবিধা তুলে নেয়া ইত্যাদি। সমস্যা হলো যাদের হাতে ইউনিয়নের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁরা সেভাবে কঠোর হচ্ছেন কি না। অনেকে অভিযোগ করেছে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড তাদের আইন প্রণয়নে যা করেছে তা আরও অনেক আগেই কঠোর হাতে দমন করা উচিত ছিল। তা না করে তিরস্কার, মৃদু শাস্তি এবং সতর্ক করার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হয়েছে। এর একটি কারণ হলো এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার আসল ক্ষমতা রয়ে গেছে ইউরোপীয় কাউন্সিলের ওপর, যা সব রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তাঁরা সাধারণত কারো প্রতি শাস্তি দিয়ে সহজে নষ্ট করতে চান না, তাছাড়া ২৭টি দেশ একমত হয়ে না চাইলে কোন কড়া সিদ্ধান্ত নেয়াও যায়না– এই একমত হবার প্রক্রিয়াটি বড় দীর্ঘসূত্রী। এক্ষেত্রে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের ভূমিকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি ছয় মাসের জন্য এক এক দেশ প্রেসিডেন্ট থাকলেও প্রতি তিনটি প্রেসিডেন্সি মেয়াদকে এক একটি গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে একটি প্রধান দেশের (তার সরকার-প্রধানের মাধ্যমে) একটি প্রেসিডেন্সি রাখার চেষ্টা করা হয় এবং পুরো গ্রুপের সময় তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি প্রভাব থাকে। ওভাবে গত তিনটি প্রেসিডেন্সিতে জার্মানির মের্কেল সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন– তিনি শাস্তি দেবার ব্যাপারে নরমপন্থী হওয়াতে, যথাসম্ভব সমঝোতা পছন্দ করেন বলেই শাস্তি দেয়া যায়নি বলে কারো কারো ধারণা। ২০২২ সালের শুরুতে দুটি পরিবর্তন হয়েছে– এরপর ফরাসি প্রেসিডেন্সি শুরু হয়েছে– ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো ইউরোপের ব্যাপারে আরও শক্ত অবস্থানের পক্ষপাতী, তা ছাড়া জার্মানিতেও ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে, মের্কেলের বদলে যাঁরা এসেছেন সেই জোট সরকারও শক্ত অবস্থানের পক্ষপাতী। অন্তত অধিকাংশ সদস্য একই মনোভাব দেখাবে, হয়তো পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি তাদের কৃতকর্মের জবাব এবার পাবে। এখানে ইউরোপীয় কমিশনেরও একটি ভূমিকা আছে– বিশেষ করে কমিশন প্রেসিডেন্টের। কমিশন হলো বাস্তবায়নের জন্য দায়ী– বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন কমিশনার নিযুক্ত করে

কাউন্সিল, কিন্তু তাঁদের সবারই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সব সদস্যের ভোটে অনুমোদন প্রয়োজন হয় এবং পার্লামেন্ট ইচ্ছে করলে যে কোন সময় তাঁদেরকে পদচ্যুত করতে পারে, অতীতে কয়েকবার পুরো কমিশনকে সেটি করেছে। এই ব্যাপারে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তায় পার্লামেন্টও অধৈর্য হচ্ছে। কিন্তু কমিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হল্যান্ডের উরসুলা ভ্যান ডের লীয়েন– ইউনিয়নের আরেকজন প্রধান নারী নেত্রী, এঙ্গেলা মের্কেলের মতই এ পর্যন্ত নরম পন্থাই গ্রহণ করেছেন। তিনি সহজে ওই দেশগুলোর কোনটিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে সাধারণত অনিচ্ছুক হন, বিশেষ করে কাউন্সিল নিজে যদি সে ব্যাপারে অগ্রণী না হয়। এখন হয়তো তাঁরও মত পালটাবে। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দ্রুত নেবার জন্য ইউনিয়নের নিয়ম সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, এবং এ ধরণের সংস্কার ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রায়ই হয়ে আসছে, তাও সব দেশের মধ্যে, বিশেষ করে প্রধান দেশগুলোর মধ্যে খুবই জোরালো তর্ক-বিতর্কের মধ্যে। এখন এ সংস্কারে জনগণের বিভিন্ন অংশকেও মতামত দেবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো শুধু সরকারসমূহ নিয়ন্ত্রিত কাউন্সিলের ওপর নির্ভর না করে আরও বেশি বেশি করে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওপর নির্ভর করা– সে প্রক্রিয়া চলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি ভালো দিক হলো এটি কখনো নিজের নিয়মনীতিতে সংস্কার আনতে পিছ-পা হয়নি।

এই বিতর্কে অভিবাসনের বিষয়টিও খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে শরণার্থীরা এখনো ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করছে তাদের বিষয়ে বিভিন্ন দেশ যার যার মত করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বড় দেশগুলো জার্মানি, ফ্রান্স এরা নিজস্ব নীতি অনুযায়ী কিছু কিছু অভিবাসীকে গ্রহণ করছে। অনেকে এঙ্গেলা মের্কেলের জার্মান সরকারকে দোষী করছে ২০১৫-১৭ সালে ১৪ লক্ষ অভিবাসী গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে তা করার জন্য, এটি করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামত না নিয়ে, বা বিষয়টি ইউনিয়নের হাতে ছেড়ে না দিয়ে– যার ফলে পরবর্তীতে এতগুলো সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও এটি ইউরোপীয় বিষয় হওয়া উচিত তবুও বিষয়টা সব দেশের সরকারের জন্য খুব সংবেদনশীল হওয়াতে ঐক্যমত্যের অভাবে এটি এখনো যার যার দেশের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। তাদের কোন কোনটার অভিবাসীদের প্রতি বিরূপ আচরণ পুরো ইউনিয়নের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এটিও ওভাবে শতভাগ ঐক্যমত্যের প্রতি নির্ভরতাকে কমিয়ে ইউনিয়নের ক্ষমতা-প্রয়োগে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে। আর একটি নাজুক বিষয় হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা। ঐতিহাসিকভাবে সেই

সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সময় থেকেই ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিরক্ষার ভার নিয়েছিলো ন্যাটো– নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন নামের সামরিক জোট যা এই দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এমনকি তুরস্ক পর্যন্ত কিছু কম্যুনিস্ট বিরোধী দেশের সমন্বয়ে– যুক্তরাষ্ট্রই যার প্রধান শক্তি ও ব্যয়ভার বহনকারী। এখনো ব্যাপারটি তাই আছে তবে এখন পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সামগ্রিক প্রতিরক্ষায় ন্যাটো সক্রিয়। ইউনিয়ন স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা ব্যয়ভার এখন বহন করছে, কিন্তু সেই হিসেবে এর ওপর তার বেশি নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই ইউরোপীয় দেশগুলো মনে করে। তাছাড়া এখন ইউরোপের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে সামরিক নীতি কী হবে তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে যেমন চীনের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াইয়ে। ন্যাটোকে ওই সব জায়গার বিষয়েও জড়িত করা হচ্ছে, যেটি সমস্যা সৃষ্টি করছে। এখন অনেকে চাচ্ছে ইউনিয়নের নিজের নিয়ন্ত্রণেই তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকুক– কিন্তু সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সামরিক শক্তি এত প্রবল যে ন্যাটো ছাড়া চলবে কিনা তাও বিবেচ্য।

সব দিক থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষের স্বপ্ন হলো একে অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি ফেডারেল পদ্ধতিতে নিয়ে আসা– কার্যত চার্চিলের ভাবনায় দেখা দেয়া সেই ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র– ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপ। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রে ইউনিয়নের হাতে এতখানি সার্বভৌমত্ব ছাড়ার বিরোধীও প্রচুর মানুষ ও দল রয়েছে। তারপরও নানা ব্যতিক্রম নিয়েও ইউরোপ সেদিকেই এগিয়েছে; নামে না হলেও, পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও কার্যত এটি তাতে পরিণত হয়েছে, অনেক টানাপোড়েন সত্ত্বেও। এমন একটি অসম্ভব কর্মযজ্ঞে টানাপোড়েন থাকাটিই তো স্বাভাবিক, তাই বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে মানব জাতির ঐক্যের জন্য একটি বিরাট আশা একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

অনৈক্যের উপাদান

আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে বিশ্ব ইউনিয়ন গড়ার কথা বলছি। অথচ বিশ্বের তুলনায় ইউরোপ কতটাই সমসত্ত্ব একটি জায়গা– দেশগুলোর মধ্যে অমিলের থেকে মিল কত বেশি! তাতেও তো ইউরোপীয় ইউনিয়ন গড়ে তুলতে বেগ পেতে হয়েছে, সব সময় চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। সব সদস্য সব বিষয়ে ঐক্যের মধ্যে আসেওনি, যেমন শেনগেন ভিসায় অথবা ইউরোজোনে। এক এক সময় মনে হয়েছে এগুলো টিকবে

কিনা– বিশেষ করে ইউরোজোন, কিন্তু কখনো কখনো মচকালেও এটি ভাঙ্গেনি। আর বিশ্ব ইউনিয়নের চ্যালেঞ্জটিতো হবে এর থেকে অনেক অনেক বেশি। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে যা ইউরোপ পেরেছে, বিশ্বও পারবে; তা ছাড়া পরিস্থিতিই তাকে পারতে বাধ্য করবে। তাই সেই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখতেই আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে একটি ক্ষেত্রে ভাঙ্গনের সুর শুধু বাজেনি, শুধু মচ্‌কায়নি, সত্যি সত্যি ভেঙ্গে গেছে– সেই অতি সম্প্রতি বৃটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাটির দিকে, যাকে চলতি কথায় ব্রেক্সিট (বৃটিশ এক্সিট) বলা হয় তার দিকে ভালো করে তাকাতে চাই। উদ্দেশ্য হলো কী কারণে এত বড় অঘটন ঘটতে পারলো– আপাত দৃষ্টিতে যেখানে মনে হচ্ছে যে বৃটেন ও ইউনিয়ন উভয়েরই ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয়নি; তবুও এই ভাঙ্গন ঘটলো কেন? অনৈক্যের এই উপাদানগুলোর পরিচয় কিছুটা না পেলে আরও এমনি আরও অনেক বেশি উপাদান যখন বিশ্ব ইউনিয়নকে জর্জরিত করতে পারে, আগে থেকেই সেগুলোর পথ বন্ধ করা যাবে কীভাবে?

ব্রেক্সিটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হারোলো তা দেখার আগে অন্য কিছু ভাঙ্গনের দিকে তাকাতে চাই তা হলো ইউরোপে দুটি রাষ্ট্রের ভাঙ্গন– দুটিই প্রথম মহাযুদ্ধের পর তৈরি হয়েছিলো– যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকশ্লোভাকিয়া, প্রথমটি ভেঙ্গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে, দ্বিতীয়টি এর ভেতরে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ভাঙ্গলেও দুটির ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ। ইউনিয়নের মূল্যবোধই সম্ভব করেছে অত্যন্ত আপোষে প্রায় অলক্ষ্যে চেকশ্লোভাকিয়া ভাঙ্গতে, অথচ যুগোশ্লাভিয়ায় সেটি হয়েছে একালের একটি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের মাধ্যমে। ১৯৯০ সালে যখন এ অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে তখনো এবং তারপর কিছু বছর ইতালির ত্রিয়েস্ত শহরে আমি প্রতি বছর দু'তিন মাস সময় কাটাচ্ছি সেখানকার আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের কারণে। শহরটি বলতে গেলে যুগোশ্লাভ মানুষ ও যুগোশ্লাভ ঐতিহ্যে ভরপূর। রাতে বাতি জ্বল্‌লে কিছু দূরেই যুগোশ্লাভ শহর কপারকে দেখা যায়, প্রতি শনিবার ত্রিয়েস্তে যুগোমার্কেটে সীমানের ওপার থেকে মেলা মানুষ আসে যুগোশ্লাভিয়ার নানা রাজ্য থেকে, কিন্তু হঠাৎ এসবে ভাটা পড়তে দেখলাম, কারণ কম্যুনিস্টদের পতনের পর যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙ্গন শুরু হয়ে গেছে এর এক একটি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করছে– এসব রাজ্যে থাকা যুগোশ্লাভ বাহিনী এবং ও স্থানীয় সার্ব বাসিন্দারা মিলিশিয়া গঠন করে (প্রধান বড় রাজ্য সার্বিয়া যাদের মূল দেশ) এতে বাধা দিয়ে ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধ সূচনা

করেছে। অন্য রাজ্যগুলোতে যেখানে যেখানে সার্বরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সেখানেই তারা জায়গাটিকে জাতিগতভাবে পরিষ্কার (এথ্‌নিক ক্লিনজিং) করার কাজে লেগে গিয়েছিলো অর্থাৎ যারা সার্ব নয় তাদেরকে মেরে ফেলা অথবা তাড়িয়ে দেয়া। যা এক দেশ এক জাতি হিসেবে ছিল এখন তার প্রতিটি রাজ্য নিজেদের আলাদা জাতিসত্ত্বার ধারণাকে একেবারে তুঙ্গে নিয়ে গেলো বলেই এই ভাঙ্গন। ত্রিয়েস্তে তার সব ভয়াবহ খবর পাচ্ছিলাম, তা ছাড়া স্থানীয় টেলিভিশনে ভয়াবহ দৃশ্যগুলো তো দেখছিলাম। পরে দেশ থেকেও আরও বহুদিন টেলিভিশনে এ দৃশ্য দেখতে হয়েছে– বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভনিয়া রাজ্যটিতে সার্ব, ক্রোয়্যাট, ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদে সার্বদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরাই রাজধানী সারায়েভোতে অধিকাংশ বাসিন্দা। তাদের নগরের চারিদিকে বেপরোয়া সার্ব বাহিনী মেশিনগান দিয়ে ঘিরে রেখেছে। পুরো নগরটিই যেন একটি বধ্যভূমি– রাস্তায় চলতে গিয়ে, বাজার করতে গিয়ে দূর থেকে কামানের গোলায় অথবা আড়ালে থাকা স্নাইপারের অব্যর্থ গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। ১৯৯৫ এ সেব্রেনিৎস্কা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের সব পুরুষ মানুষ ও বালকদেরকে আলাদা করে যখন এক সঙ্গে হত্যা করলো তখনই শুধু বড় বড় দেশের টনক নড়লো এবং কিছুদিন পর শান্তি চুক্তি করতে সবাইকে বাধ্য করলো। এমন গণহত্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ আর দেখেনি।

অন্যদিকে একই সময়ে আর একটি ভাঙ্গনের গল্পে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য থাকা কালেই ১৯৯৩ সালে চেকশ্লোভাকিয়ায় দুই প্রধান জাতিসত্ত্বা চেক ও শ্লোভাকরা শুধু নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই আপোষে আলাদা হয়ে যায়, সব সাধারণ সম্পত্তি ওভাবেই ভাগ করে নিয়ে। উভয়ের মধ্যে এখনো নানা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক– বলতে গেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের মধ্যে এই দুই রাষ্ট্রই সব থেকে বেশি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকতো, যুগোশ্লাভিয়াও ওভাবে রক্তক্ষয়ীভাবে ভাঙ্গতে পারতো না, সেব্রেনিৎস্কা গণহত্যাও ঘটতে পারতো না। সেব্রেনিৎস্কা, আফ্রিকার রুয়ান্ডা এসব ভয়ানক গণহত্যা জাতিসংঘের নাকের ডগাতেই হতে পেরেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভেতরে তা কখনো তা ঘটতে পারতো না, কারণ তার বহু আগেই তাকে অঙ্কুরে থামিয়ে ঘটতে দেয়াই হতো না, ওরকম সহিংস কোন বিষয় দানা বাঁধতে কীভাবে না দিতে হয় সে ব্যবস্থা ইউনিয়নে আছে। যেদিন বিশ্ব ইউনিয়ন হবে আশা করবো সেদিন সারা দুনিয়া থেকেও

এমনটি হবার সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়ে যাবে।

ব্রেক্সিটও তাই ঘটনাবহুল হলেও সব কিছু ছিল একেবারেই শান্তিপূর্ণ বিচ্ছেদের মত। বৃটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন এভাবে ছেড়ে যাবার সময় কাছে থেকে না দেখলেও ওতে যোগদানটি কাছে থেকেই দেখেছি, কারণ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ ওই সময়টি ছাত্র হিসেবে বৃটেনেই ছিলাম। দ্বীপরাষ্ট্র বৃটেন যে নিজেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা ভাবতো তখন সেটি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, তার মুখ ছিল ইউরোপের দিকে নয় বরং কমনওয়েলথ নামে পরিচিত দূরে দূরে তার স্বজাতীয় এক কালের উপনিবেশগুলোর দিকে– কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এবং এশিয়া-আফ্রিকার জোরপূর্বক চেপে বসা ভূতপূর্ব-উপনিবেশগুলোর দিকেও, যারা ওই কমনওয়েলথে আছে। কিন্তু তারপরও ইউরোপীয় কম্যুনিটির সৃষ্টির পর পর ওর থেকে দূরে থাকাটিকে বৃটেন লাভজনক মনে করেনি, তাই যোগদানের দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলো। তাতে অন্য অসুবিধা না থাকলেও বেঁকে বসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও মহাযুদ্ধকালীন মুক্ত ফ্রান্স সংগ্রামের বিখ্যাত নেতা দ্য'গল। যুদ্ধের সময় বৃটেনে থেকেই ওই সংগ্রাম নেতৃত্ব দিলেও খুব সম্ভব ওসময় বৃটেন ও আমেরিকার কাছ থেকে এমন কোন আঘাত তিনি পেয়েছিলেন যে পরবর্তী সময়ে পুরো এ্যাংলো স্যাক্সন জাতিগোষ্ঠির প্রতিই তাঁর বিতৃষ্ণা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বৃটেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ঢুকতে না দেয়ার ব্যাপারে তিনি এতো অনমনীয় ছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। সে সময় দ্য'গলের ছবির পোস্টারের নিচে বড় করে একটি কথা লেখা দেখতাম– 'NON'– ফরাসিতে যার মানে 'না'। এর মানে বৃটেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কখনো না, এবং অন্যান্য বিষয়েও বৃটেন ও আমেরিকার প্রতি তাঁর এই 'না' এর নীতি।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে দ্য'গল মারা গেলে তাঁর ঘনিষ্ঠজন ও উত্তরসূরী পম্পেদ্যু'র অবশ্য সেই আপত্তি ছিল না, তাই বৃটেনের যোগদানের আলাপ আলোচনা শুরু হতে পেরেছিলো। কিন্তু বৃটেনের নিজের মধ্যে– তার দুটি প্রধান দলের ভেতর এবং মানুষের মধ্যে– যোগদান করা না করা নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্ধ ছিল, যে কারণে তখনকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হীথের কন্‌জারভেটিভ দলীয় সরকারের পক্ষে সবাইকে বুঝিয়ে রাজি করানো সহজ হয়নি, বেশ বড়-সড় প্রচার কার্যে নামতে হয়েছিলো। সবার মুখে তখন একই আলোচনা শুনেছি– যোগ দিলে কী লাভ হবে, কী ক্ষতি হবে। ক্ষতির মধ্যে একটি কথা শুনে খুব মজা পেতাম– নিউজিল্যান্ড থেকে

যে ভেড়ার মাংস আর মাখন আসছে তা পাবো কোথায়? সেদিন ওরা ভাবতে পারেনি যে কিছুদিনের মধ্যে সরু সমুদ্র ইংলিশ চ্যানেলের মাত্র ওই পারের ফ্রান্স থেকেই সব রকম খাদ্য ও কৃষিপণ্য এসে দেশ সয়লাব হয়ে যাবে। ভুলে গেলে চলবেনা এসবের জন্য বৃটেন খুব বেশি ভাবে আমদানির ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া কথাবার্তায় মনে হচ্ছিলো বৃটেনের লোকরা ইউরোপে যোগ দিয়ে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে তার হারানো সাম্রাজ্য নতুন ভাবে আবার হারানোর ভয়ে রয়েছে। বৃটিশ সরকারকে তাই বার বার আশ্বস্থ করতে হচ্ছিলো যোগদানের গ্রহণযোগ্য শর্ত পেলে তবেই যোগদান, নইলে নয়।

১৯৭২ সালের একেবারে শেষে এসে যোগদানটি খুব ধূমধাম করেই হয়েছিলো। মানুষের মধ্যেও দারুণ উৎসাহ দেখেছি, মনে হচ্ছিলো যেন রাতারাতিই বৃটিশরা পাক্কা ইউরোপীয় হয়ে যাবার উদ্যোগ নিয়েছে, যা তাদের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। যোগদানের দিন টেলিভিশনে দেখলাম ডোভারের সমুদ্রতীরে বিশাল আগুন জ্বালানো হয়েছে ইউরোপীয় কম্যুনিটিতে ঢোকার বার্তাটি যেন এখানকার সবার থেকে সরু চ্যানেলের ওপারের বন্ধুদের জানান দিতে। আজ পঞ্চাশ বছর পর ইউরোপীয় কম্যুনিটি যখন ইউনিয়ন হয়ে ঐক্য প্রচেষ্টার তুঙ্গে উঠেছে তখন কোন দুঃখে যে তারা মনের আগুনটিও নিভিয়ে দিলো তার উত্তর এখনো খোঁজার চেষ্টা করছি।

শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৃটেনের মানুষ ২০১৬ সালের গণভোটে সামান্য ব্যবধানে। 'ইউরোপ ছাড়' এই আন্দোলন এর কিছুদিন আগে থেকেই প্রধান দুটি দলের ভেতরর একটি বড় অংশের দ্বারা বাতাস পাচ্ছিলো, তা ছাড়া শুধু এই 'ছাড়' নীতির ওপর ভিত্তি করেই বেশ উগ্রবাদী কয়েকটি নতুন দল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন নিজে ইউরোপে থাকার পক্ষে হলেও অন্যদের চাপে তিনি পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিষয়টি গণভোটে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর থেকে বৃটেনের সব দলের অস্তিত্ব যেন বিলীন হয়ে শুধু দুটি দলে পরিণত হলো– 'লীভ' (ছাড়) এবং 'রিমেইন' (থাকো)। উত্তেজনা চরমে উঠেছিলো, রীতিমত হিংসাত্মকও যা বৃটেনের মত দেশে অকল্পনীয়। বিশেষ করে লীভের দিক থেকে প্রচারণা অত্যন্ত উগ্র মূর্তি নেয়, যেন বৃটেনের সব সমস্যার মূলে রয়েছে ওই ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ওটি গর্বিত বৃটিশ জাতিকে পরাধীন করে ফেলেছে, এটি ছাড়লেই বৃটেন আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, তার চেয়েও বড় কথা সব টাকা ইউরোপকে দিয়ে দিতে হবেনা বলে দেশে দুধ-মধুর বন্যা বইবে– এসব কথার ফুলঝুরি

চল্‌ছিলো। এক সন্ত্রাসী একজন তরুণী পার্লামেন্ট সদস্যকে সবার সামনে হত্যা করলো শুধু তিনি রিমেইনের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছেন বলে। শেষ পর্যন্ত গণভোটে জিতলেও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি মোটেই অল্প সময়ে হয়নি বা সহজ হয়নি। প্রায় চার বছর 'ব্রেক্সিট' বলে কথিত এই প্রক্রিয়াটি বৃটেনবাসী, ইউরোপবাসী, আর সারা দুনিয়ার গণমাধ্যমকে পাগল করে রেখেছিলো– এতই সমস্যা-সংকুল ও ঘটনাবহুল ছিল সেটি। দেখতে চাই কেন বৃটেন ব্রেক্সিটের জন্য এতসব সমস্যা কবুল করে নিলো; যেখানে সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে ছিল এতদিন? আগামী দিনে বিশ্ব ইউনিয়নের পথে এই জানাটি হয়তো কাজ দেবে।

মনে হয়নি যে খুব গভীর কোন কারণ ছিল। বরং অধিকাংশ বিশ্লেষকের কথা শুনে যা মনে হয়েছে তা হলো ব্রেক্সিট ছিল একটি রাজনৈতিক আত্মপ্রবঞ্চনার ফল, মানুষকে অনর্থক একটি প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ সত্তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে কিছু নেতার বাহবা নেয়া, ও রাজনৈতিক সুবিধা নেবার ফলশ্রুতি। ওতে বৃটেন আবার এককভাবে বিশ্বসভায় বড় হবে এমনি চটকদার কথা ছাড়া যুক্তির মত করে যা বোঝানো হয়েছে তা অনেকটা এরকম: ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে সব নিয়ম ও আইন আমাদেরকে মান্‌তে বাধ্য করা হচ্ছে তাতে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি– ওরা জিতছে, আমরা ঠকছি। আগড়ম-বাগড়ম সব দেশ থেকে বিজাতীয়রা আমাদের দেশে ইচ্ছেমত আসছে, যাচ্ছে, আর আমাদের চাকরিগুলো নিয়ে নিচ্ছে। আমরা আমাদের বৃটিশ পরিচয় হারিয়ে ফেলছি, আমরা আরও স্পষ্টভাবে বৃটিশ হতে চাই, ইউরোপীয় নয়। আমাদের দেশের অভিবাসন নীতি, আইন-কানুন, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন কিছুর ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এ যেন নিজেদের জীবনের ওপরেই আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই– সব নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে ওই ব্রাসেল্‌সের (ইউরোপীয় ইউনিয়নের) আমলাদের হাতে। এরকম চিন্তা মাথায় ভর করলে তো ঐক্যের মধ্যে সুবিধাগুলোর থেকে বঞ্চনাই বেশি দেখা যাবে। ব্রেক্সিটের পেছনে এমন চিন্তাই কাজ করেছে, কিছু রাজনীতিবিদ এই চিন্তা অনেকের মাথায় সফলভাবে ঢুকাতে পেরেছে বলেই এমন হয়েছে। ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান সবাই যদি এমন চিন্তা করতো তা হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কখনো হতো না। অন্যরা এরকম চিন্তা করেনি, বৃটেন করেছে।

পরবর্তী ভোট বিশ্লেষণে যা দেখা গেছে তাও বেশ শিক্ষণীয়। 'লীভের' পক্ষে ছিল প্রধানত অল্প শিক্ষিত, নিম্ন দক্ষতা সম্পন্ন এবং নিম্ন আয়ের মানুষরা। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে অসন্তুষ্টির রাগ তারা ইউরোপের ওপর

ঝেড়েছে। অভিবাসন-বিরোধী, বিদেশি-বিরোধী ও ডানপন্থী হিসেবে যাদেরকে চেনা যায় তারাও লীভের পক্ষে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। এগুলোর কারণ বোঝা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধনী, অভিজাত ও সুবিধাভোগীদের একটি বড় অংশও লীভের পক্ষে ভোট দিয়েছে, যে পরিস্থিতিতে তারা ধনী ও সুবিধাভোগী হয়ে রয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা ভোট দিতে গেলো কেন? গবেষকরা বল্‌ছেন এর একটি কারণ হলো তাঁরা তাঁদের বৃটিশ বনেদিয়ানা ও সম্পদকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রমাগত উদারনীতির মধ্যে নিরাপদ বলে বোধ করছিলেন না। সত্যি সত্যি যে কোন অসুবিধায় তাঁরা পড়েছেন তা নয়, বরং পড়ার আশঙ্কার কারণেই 'লীভে' ভোট দেয়া। তবে একটি বিষয়ে সব গবেষক একমত তাহলো সাধারণ মানুষরা লাভ-লোকসান বিবেচনা করে নয়, বরং অন্যের উস্‌কে দেয়া আবেগবশতই লীভে ভোট দিয়েছে। আমরা কী খাব, কার সঙ্গে কাজ করবো, কোন্ আইনে চলবো তাতে দূর দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা, আর পণ্ডিতদের কথা থাকবে কেন, এসব আমরাই শুধু ঠিক করবো। এজন্য নানা অসুবিধা কবুল করে নিয়েও এবং বিচ্ছেদ-দণ্ডি হিসেবে ইউরোপকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি হয়েও এ বিচ্ছেদ ঘটাতেই হবে। ব্রেক্সিট চুক্তির পর সত্যি সত্যি সেই নিয়ন্ত্রণ কতখানি আসবে তারা তা ভেবে দেখেনি, যদি বুঝতে পারতো যে আদৌ সে রকম কিছু বড় পরিবর্তন হবে না, তাহলে ওই ভোট দিতো না।

ব্রেক্সিটের পর অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার বড় কারণ হলো বৃটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়লেও কমলি তাকে ছাড়ছেনা– সেই কমলি ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারের সুবিধাটি ভোগ করতে চাওয়া, শুল্কমুক্ত পণ্য আনা-নেয়ার সুবিধা বজায় রাখা। এ সুযোগ না পেলে তার অর্থনীতি বিপদে পড়বে। ইউরোপও তা চায় কারণ বৃটেনের বাজারটি তার দরকার। কাজেই ইউনিয়নে না থেকেও বৃটেনকে ইউনিয়নের অনেক নিয়মই আগের মত মেনে যেতে হচ্ছে, না মানলে সেই সুযোগ হারাবার হুমকিতে পড়বে। তাই ব্রেক্সিটের পরের জন্য একটি নতুন চুক্তি ইউরোপের সঙ্গে করতে হয়েছে যার জন্য দর কষাকষিতে এই চার বছর লাগলো। এ চুক্তির মধ্যে বৃটেনকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছে এমনকি তার অখণ্ড অস্থিত্বেরও ঝুঁকি। কারণ লীভ ভোট দিয়েছে শুধু ইংল্যান্ড ও ওয়েল্‌স; বৃটেনের অন্য দুটি অঙ্গরাজ্য স্কটল্যান্ড আর উত্তর আয়ারল্যান্ড বিপুল ব্যবধানে 'রিমেইন' ভোট দিয়েছে। ওরা ভীষণভাবে ইউরোপপন্থী। যদিও সার্বিকভাবে ৫১.৯% ভোট পেয়ে লীভ জিতেছে, তাতে ওই দুই রাজ্যের মত নেই। স্কটল্যান্ড এখনই স্বাধীন

হয়ে যাবার পদক্ষেপ হিসেবে এই বিষয়ে আর একটি গণভোট চায়, স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছুদিন আগেই একটি গণভোটে অল্পের জন্য যদিও স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি পরাজিত হয়েছিলো। ইউরোপে থাকা তাদের জন্য জরুরি বলে পরবর্তীটিতে স্বাধীনতার পক্ষের মত অবশ্যই জিতবে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য এটি আরও বেশি জরুরি, কারণ পঞ্চাশ বছরের মত সময় জুড়ে সেখানে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথোলিক জনগোষ্ঠির মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলেছে এবং বৃটেন সেখানে প্রটেস্টান্টদের পক্ষ নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করেছে, সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে এই ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারণেই। ক্যাথোলিকরা আইরিশ রিপাবলিকের (আয়ারল্যান্ড) সঙ্গে যোগদানের পক্ষে। আইআরএ নামে (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) নামে তাদের মিলিশিয়া আপাতত শান্ত আছে কারণ বৃটেন ও আয়ারল্যান্ড উভয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়াতে এখন উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে রিপাবলিকের কোন বর্ডার নেই, ইচ্ছে মত আসা যাওয়া চলছে, পণ্য আনা-নেয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক যোগাযোগ চল্‌ছে। প্রধানত এ জন্যই 'গুড ফ্রাইডে শান্তি চুক্তি' নামে পরিচিত চুক্তির মাধ্যমে প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথোলিকরা জোট-সরকার গঠন করে শান্তিতে উত্তর আয়ারল্যান্ড চালাচ্ছে।

এর ব্যতিক্রম হলে হয় রক্তক্ষয়ী গৃহ যুদ্ধ আবার শুরু হবে, নইলে এটি সত্যি সত্যি রিপাবলিকের অংশ হয়ে যাবে, বাধ্য হয়ে। এখন বৃটেন ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়াতে এমন চরম ব্যাপার হবার সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে। তবে ব্রেক্সিট চুক্তিতে 'নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড প্রটোকল' নামে একটি ধারা অনুযায়ী গোঁজামিলের স্থিতাবস্থা বজায় রেখে এই পরিণতি থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া গেছে। এতে উত্তর আয়ারল্যান্ড ও রিপাবলিকের মধ্যে বর্ডার এখনো পুরোপুরি খোলা থাকবে– মানুষ ও পণ্য চলাচলও। এর ফলে এখান দিয়ে বৃটেন নিজে ইউরোপের সঙ্গে বর্ডারহীন উন্মুক্ত হয়ে পড়াতে উত্তর আয়ারল্যান্ডেরসঙ্গে বৃটেনের বাকি অংশের পণ্য চলাচলের সময় তার কাস্টম তল্লাশী করাটি বাধ্যতামূলক হলো যাতে বৃটেনের বাকি অংশ থেকে অবাঞ্ছিত কিছু ইউরোপে না ঢুকে যেতে পারে যেমন– ইউরোপীয় ইউনিয়নের পারিবেশিক ও স্বাস্থ্যগত নিয়ম কড়াকড়িভাবে মানে না এমন খাদ্য। নিজের দেশের দুই অংশের মাঝখানে কাস্টম বাধা বসিয়ে বৃটেন এভাবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলো।

বিচ্ছেদের অন্য সমস্যাগুলো কোনভাবে সমাধান করলেও শেষ পর্যন্ত

ঠেকে ছিল তিনটি বিষয়– তার মধ্যে একটি আগেই বলেছি– ওই নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড প্রটোকল। আর একটি ছিল ইউরোপ ও বৃটেনের মাঝখানে যে উর্বর মৎস্য ক্ষেত্র তাতে বৃটিশ সীমার মধ্যেও আগে ইউরোপীয় জেলেরা মাছ ধরতে পারতো, চুক্তির অংশ হিসেবে ওরা এই সুবিধা বজায় রাখতে চাচ্ছিলো। অনেক দর কষাকষির পর ২০২৬ সাল পর্যন্ত সীমিত আকারে এটি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন রকমে শেষ রক্ষা হয়েছে, তারপর স্বাধীনভাবে নতুন চুক্তি করতে হবে। তৃতীয়টি ছিল ইউরোপে না থেকেও তার সঙ্গে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করতে গিয়ে খেলার মাঠটি উভয়ের জন্য সমতল থাকছে কিনা তা নিশ্চিত করা। বৃটেন যেহেতু নিজের নীতি নিজে করছে তাই তার পরিবেশ নীতি, শ্রম নীতি, ভর্তুকি নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে সে প্রতিযোগিতায় কোন বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে কিনা সেটিই এখানে বিবেচ্য। একইভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নও নিজের নীতি পরিবর্তন করে সুবিধা নিতে পারে, তাও যেন না হয়। বহু দর কষাকষির পর এক্ষেত্রে ঠিক হলো বৃটেন তার সব নীতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির খুব কাছাকাছি রাখবে। কখনো এক পক্ষ খেলার মাঠের সমতল চরিত্র নষ্ট করলে অন্য পক্ষ শাস্তিমূলকভাবে শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এই শাস্তি যথাযথ হয়েছে কিনা যে সম্পর্কে ইউরোপীয় আদালতের এখতিয়ার যেহেতু এখন বৃটেন মানবেনা তাই নিরপেক্ষ সালিশী কাউন্সিলও গঠন করা হলো।

বোঝাই যাচ্ছে ব্রেক্সিটের মধ্যেও ঐক্যের মূল সুযোগগুলো বজায় রাখতে উভয় পক্ষ আগ্রহী, পার্থক্যটি হলো শুধু বৃটেনের গোঁ রক্ষা এইটুকুই যা। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের পর এ পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেছে তাতে বৃটেনকে এই গোঁ রক্ষার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হচ্ছে। দেখা গেল উত্তর আয়ারল্যান্ড ও বৃটেনের বাকি অংশের মধ্যে কাস্টম তল্লাশির জন্য যে বাড়তি সময়ও বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তাতে নিজের দেশের মধ্যে পণ্য চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে ও দাম বেড়ে যাচ্ছে– যা এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে বৃটেন এককভাবে ইতোমধ্যেই চুক্তিভঙ্গ করার ঝুঁকি নিচ্ছে। ব্রেক্সিটের পরে পরেই বৃটেনের সুপার মার্কেটগুলোর তাকে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছিলো না বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে আমদানিকৃত খাদ্য বন্দর থেকে আনার জন্য ট্রাকের ইউরোপীয় সব চালকরা চলে গেছে বলে, এবং কৃষি ক্ষেতে কাজ করা ইউরোপীয় কর্মীরাও। বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ছাত্ররা যেমন আর নেই তেমনি বৃটিশ ছাত্ররা জার্মানি, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে পড়ার বৃত্তি আর পাচ্ছে না। অসংখ্য যে সিরীয়, সোমালীয় ও অন্যান্য দেশীয় শরণার্থীরা অবৈধভাবে বৃটেনে ঢোকার জন্য ফ্রান্সে অপেক্ষা করছে

তারা রাবারের ডিঙ্গিতে করে চ্যানেল পার হয়ে যাচ্ছে– ফরাসি পুলিশ এখন তাদেরকে বাধা দেবার গরজ তেমন অনুভব করছে না। বৃটেন তাদেরকে বাধা দিয়ে ডুবে যাওয়া আশঙ্কা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে। বৃটেন আবার বিশ্বসভায় একক গৌরবের আসন পাবে, সর্বাংশে বৃটিশ হবে, নিজের জীবন সম্পূর্ণ নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে– এসব যে নেহাৎ হাওয়াই কথা ছিল সে রকম প্রমাণই মিলছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে বিশ্ব ইউনিয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কীভাবে ধাপে ধাপে গড়ে উঠলো, কী ধরণের টানাপোড়েন তাকে পোহাতে হচ্ছে, এর মধ্যে অনৈক্যের কী ধরণের উপাদান থাকতে পারে এ সব একটু বিস্তৃত দেখার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই– তার আদলে বিশ্ব ইউনিয়নের কথা ভাবতে পারা। এখানকার সমস্যাগুলো বিশ্ব ইউনিয়নে আরও বড় হয়ে, কিছুটা অন্যভাবে দেখা দিতে পারে মনে করেই, এই অভিজ্ঞতাগুলোকে এক ঝলক দেখা; গোড়া থেকেই এসব বিশ্ব ইউনিয়নের চিন্তায় রাখতে হবে বৈ কি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় একত্রিত হতে পেরেছে বলেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন আজ এ অবস্থায় আসতে পেরেছে। এটি যে আগাগোড়া সফল হয়েছে এ কথা কেউ বলবে না। বিশেষ করে কোভিড বিশ্বমারিতে যখন পুরো বিশ্বের সঙ্গে ইউরোপও অত্যন্ত করুণ অবস্থায় চলে গিয়েছে তখন আমরা তার ইউরোপীয় সত্ত্বার থেকে দেশীয় সত্ত্বাটাই বেশি ফুটে উঠতে দেখেছি। অনেকের মধ্যেই 'চাচা আপন পরান বাঁচা' নীতিটিই বেশি দেখা গেছে, বিশেষ করে টিকা মজুদ করার প্রতিযোগিতায়। একদিকে জার্মানি টিকা কোম্পানিতে তার হাত থাকার সুবাদে উচ্চ মানের টিকা যত পারে মজুদ করেছে অন্যদিকে ইউনিয়নের দুর্বল দেশগুলো প্রয়োজনীয় টিকা পায়নি, হাঙ্গেরির মত কয়েকটি সদস্য নিজেদের জন্য চীনা টিকা সংগ্রহ করেছে এমন সময়ে যখন সে টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পায়নি। এমন বিপদের দিনে ইউনিয়নের কাছ থেকে আর একটু বেশি সমন্বিত ব্যবস্থা আশা করা যেতো। কিন্তু অন্যভাবে কোভিড প্রসঙ্গেও ঐক্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন ইউরোজোন দেশগুলো ৫০০ বিলিয়ন ইউরোর একটি বিশাল তহবিল তাৎক্ষণিকভাবে ২০২০ সালে গঠন করেছিলো যে কোন সদস্য দেশকে কোভিড সংকটে সাহায্য করার জন্য– স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা জোরদার করতে, ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করার পেছনে গ্যারান্টি যোগাতে, অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য কোম্পানিগুলোকে টিকিয়ে রাখতে, অথবা

লকডাউনের সময় কর্মচারীদের বেতন যোগাতে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ওরা ব্যবহার করতে পারবে। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

তবে আমাদের চিন্তা হলো পুরো বিশ্বে এমনি একটি ভরসা কীভাবে গড়ে তোলা যায়, কোথাও যেন কোভিডের মত সংকটে মানুষকে হাল ছেড়ে দিতে না হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিছু বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য শুরু হয়েও একটি পুরো প্রায় মহাদেশের সব মানুষের জন্য উচ্চ মানবিক মূল্যবোধকে যেমন নিশ্চিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছে সেটিকে অনুসরণ করে এমন আশা আমরা করতেই পারি। যদি এত বড় একটি ভূখন্ডে যুদ্ধবিগ্রহ বা হিংসাশ্রয়ী কোন বিরোধের কোন অবকাশ না থাকে; যেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আদর্শ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমের জায়গা না হয়; যেখানে ইউনিয়নের ভেতরের মানুষের সংকটে তো বটেই এমনকি তার বাইরের মানুষের সংকটেও একযোগে এগিয়ে যাওয়াটি নিয়ম; যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলো যে কোন বিরূপ পরিস্থিতিতে সবল দেশগুলোর স্বয়ংক্রিয় সাহায্যের উপর ভরসা করতে পারে, তাহলে বৃহত্তর ইউনিয়ন তা পারবেনা কেন? এ অবস্থায় সকল মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সুরক্ষা, এবং দারিদ্র ও অবিচার থেকে মুক্তির ব্যাপারে সবাই একই কড়াকড়ি নিয়ম-নীতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে পারে; আর সবচেয়ে বড় কথাএই সব কিছু সম্ভব হয় পুরো ইউনিয়নের সব মানুষের স্বাধীন মতামতের মাধ্যমে; এই সবকিছুকে বিশ্বের পর্যায়ে পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা যে উচিৎ তা বলাই বাহুল্য।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পথে যে সমস্যাগুলো ছিল এবং আছে, সেগুলো আরও অনেক বড় হয়ে বিশ্ব ইউনিয়নের পথে দেখা দেবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু বড় কথা হলো ইউরোপ এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ওখানেও ধনী দেশ ও সাধারণ দেশগুলোর মধ্যে সম্পদ এবং শিল্পসমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য ছিল, গণতন্ত্রের চর্চায়ও ছিল বড় রকমের পার্থক্য, মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এবং আইনের শাসনের ক্ষেত্রেও সে কথা বলা যায়। অসম্ভব নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে মাত্র দুই-এক দশক আগে রক্তস্নাত হয়েছে এমন দেশও এই ইউনিয়নে আছে। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নে এসব জিনিসের কোন রেশ আর নেই, থাকার কথা চিন্তাই করা যায় না। আজ বিশ্বের দেশে দেশে মানবতার যে অপমান ঘটছে, চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার যে মহড়া চলছে, অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-ভোটের অধিকার এবং একেবারে বেঁচে থাকার ও মৌলিক মানবাধিকারটুকুও লুণ্ঠিত হচ্ছে এখন। পুরো বিশ্ব একযোগে দায়িত্ব নিয়ে

ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের মধ্যে তার অবসান ঘটানো ছাড়া আরও কোন বিকল্প দেখা যাচ্ছে না।

এখনো এক দেশ আরেক দেশকে সহায়তা দিচ্ছে, জাতিসংঘ এখনো চেষ্টা করছে বিশ্বময় শান্তি বজায় রাখতে, কল্যাণ আনতে, কিন্তু সেগুলো চিরকালই খুচরা চেষ্টা হিসেবেই ছিল, থাকবে। এর মধ্যে কোন নিশ্চয়তা ছিল না, আইনের বাধ্যবাধকতা ছিলনা– যার ফলে জাতিসংঘের সহায়তার জন্য কাতর আবেদন বার বার জানানো সত্ত্বেও কোন কোন অঞ্চলে নিয়মিত দুর্ভিক্ষ ঘটতে পেরেছে, সোমালিয়া-সিরিয়ার মত এক একটি দেশের প্রায় পুরো ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটতে পেরেছে, রুয়ান্ডা- সেব্রেনিৎসকার মত গণহত্যা ঘটতে পেরেছে, বার্মার মত গণতান্ত্রিক দেশ একটানা গণতন্ত্রবিহীন সামরিক সরকারের শাসনে ছিল যেখানে মানুষের অধিকার ও ভোট কেড়ে নেয়া হয়েছে, শ্রীলঙ্কার মত শান্তির দেশকে বহু দশক নিষ্ঠুর গৃহযুদ্ধের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। বিশ্ব ইউনিয়নে তার কোনটি ঘটতে পারবে না, কারণ দুনিয়ার মানুষের সমন্বিত চেষ্টা এর কোনটি ঘটতে দেবে না; যেমন আজ ইউরোপ ইউনিয়নের মানুষ দেয় না।

বলা হতে পারে ইউরোপের দেশে দেশে যতখানি সাযুজ্য ছিল, পুরো বিশ্বের দেশে দেশে এতটা নেই। কিন্তু বিশ্বের মানুষে মানুষে অমিলগুলো বেশি দেখলেও তাদের মধ্যে সাযুজ্য যে কতখানি আছে তা আমরা লক্ষ্য করি না। আমরা দেখেছি কেমন করে সব মানুষ বলতে গেলে একই গ্রামের মানুষ। বিশ্ব ইউনিয়নের নিয়মকানুন, এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও এর মানবাধিকার নীতি, পরিবেশ নীতি কোন দেশের জন্য একেবারে অদ্ভুত, বিজাতীয় কিছু হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে নিয়ম-নীতি ও সক্ষমতায় প্রচুর পার্থক্য ছিল। দেখা গেছে ইউরোপ ইউনিয়নে আসার পরই এই পার্থক্যগুলো দূর হওয়া আরম্ভ হয়েছে, অথবা অন্তত এই পার্থক্য নিয়েও পরস্পরের সঙ্গে চমৎকারভাবে বাস করা সম্ভব হয়েছে–প্রত্যেকের নিজস্বগুলো বৈশিষ্টগুলোকে বরং তাতে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সবাই সুবিধা পেয়েছে বলেই এসেছে। ইউরোপের বাকি অনেক দেশ এ কারণেই ইউনিয়নে ঢোকার দরখাস্ত দিয়ে চেষ্টা করছে। একই কারণে বিশ্ব ইউনিয়নেও তাই হবে।

মানুষে মানুষে বৈষম্যগুলো প্রায় সর্বাংশে মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো। সেগুলো ঐক্য প্রক্রিয়ায় বাধা হতে পারে না, সেগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া অমানবিক কাজ হবে। সবার দেশ, সবার সংস্কৃতি, সবার ভাষা বৈশিষ্ট্য সবই অক্ষুণ্ন থাকবে, সবার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। শুধু সেই

সার্বভৌমত্ব থাকবেনা যা নিজ দেশের মানুষকে অবদমিত করার জন্য বা বিশ্ব মানবতার মূল্যবোধকে পদদলিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। শুধু সেই বিষয়গুলোই ইউনিয়নের এখতিয়ারে দেয়া হবে যেগুলো বিশ্বজনীনভাবেই করতে হবে যেমন বিশ্বশান্তি ও মানবতা রক্ষা; চরম বৈষম্য, হিংসা, দারিদ্র দূর করা; অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেখানে বিশ্ব সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত না হতে পারে, বরং বিশ্ব মানুষের কল্যাণে যেতে পারে; সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমূহের ওপর বিশ্বজোড়া নিয়ন্ত্রণ থাকে যাতে তা সব মানুষের উপকারে লাগে, কারো গলার ফাঁস না হয়। এ সব ব্যাপারে মানুষ ঠেকে ঠেকে শিখবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাই হয়েছে। ওরা শুরু করেছিলো কয়লা আর ইস্পাত শিল্পকে সবার জন্য এক নীতিতে এনে। তারপর কেমন করে ঐক্যকে অভিন্ন বাজার, অভিন্ন কাস্টম, অভিন্ন আইন; পণ্যের, মানুষের, শ্রমের, এমনকি মুদ্রার পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত নিয়ে গেছে ধাপে ধাপে তা আমরা দেখেছি। একইভাবে ধাপে ধাপে বিশ্ব ইউনিয়নও তা করবে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পথ দেখিয়েছে বলে কাজগুলো দ্রুততরও হতে পারে। বিশ্ব ইউনিয়নের আকর্ষণ আরও অনেক বেশি হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে গণতন্ত্রের কোন রূপটি, মানবাধিকারের কোন রূপটি বিশ্ব ইউনিয়নের জন্য গৃহীত হবে। বিশ্ব ইউনিয়নের সকল প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ সরাসরি ভোটে বিশ্ব পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবে। বৈশ্বিক বিষয়গুলো সেখানেই নির্ধারিত হবে। সবাই মিলে বিশ্বের মানুষরা তাদের বিশ্ব পার্লামেন্টে এবং বিশ্ব 'কাউন্সিলে' এবং বিশ্ব 'কমিশনে' যা ঠিক করবে সেই রূপটিই গৃহীত হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ঐক্যমত্যে আসতে যতটা সহজ হয়েছে এক্ষেত্রে তার থেকে হয়তো কঠিন হবে, কিন্তু অসম্ভব হবে একথা মানা যায় না। তারপরও কোন দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে যদি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠের মূল্যবোধ না মেলে তার পক্ষে বিশ্ব ইউনিয়নের বাইরে থাকার স্বাধীনতা থাকবে। ইউরোপের বহু দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে আছে, হয়তো অনেকদিন তাই থাকবে। বাইরে থাকা দেশগুলো যদি নিজেদের মধ্যে আলাদা বিশ্ব ইউনিয়ন গঠন করে তাতেও ক্ষতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এদের একটি অন্যটির শান্তিতে বিঘ্ন না ঘটিয়ে বরং স্বাস্থ্যকর সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় থাকে ততক্ষণ লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। হয়তো তার প্রয়োজন হবে না। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষ যখন দেখবে কোন ইউনিয়নে মানুষের জয় জয়কার বেশি হচ্ছে তারা স্বাভাবিকভাবে সেদিকেই চলে যাবে।'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ নীতির ওপর গঠিত বিশ্ব ইউনিয়নকে সবাই বরণ করবে।

মানুষের ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ

পদাতিকদের উত্তরণ

শ্রমেই মুক্তি (?)

নাৎসীদের ইহুদি হত্যাযজ্ঞের কথা যেখানেই আসে, লেখায় বা টেলিভিশনে, একটি ছবি অবশ্যই তাতে থাকে; তা হলো পোল্যান্ডের আউস উৎস কনসানট্রেশন ক্যাম্পের যে গেইট দিয়ে বন্দী ইহুদিদের বহনকারী বদ্ধ ট্রেনগুলো ঢুকতো সেই গেইটটির ছবি। ওখানে লোহার গ্রিলের আকারে একেবারে ঝালাই করা লেখাগুলো এখনো অক্ষত হয়ে আছে 'আরবাইট মাখ্‌ট ফ্রাই'– জার্মান ভাষায় এর অর্থ 'শ্রমেই মুক্তি'। শুধু এটি নয় দেখা গেছে যে প্রায় সব ক'টি কনসানট্রেশন ক্যাম্পের কোথাও না কোথাও এই একই কথা খোদাই করা রয়েছে। এই কথাটিকে কেন নাৎসিরা তাদের নিধন কেন্দ্রগুলোর শ্লোগান হিসেবে বেছে নিয়েছিলো তা নিয়ে অনেক কিছু ভাবা যায়, এটি কি হতভাগ্য মানুষগুলোকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার জন্য যে এখান থেকে তাদেরকে কাজ করতে পাঠানো হবে, নাকি তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর তামাশা করার জন্য। গবেষকরা বল্‌ছেন এর কোনটাই নয়– এটি পুরানো জার্মান সাহিত্যের একটি উদ্ধৃতি যাতে শ্রমকে মানুষের আত্মার মুক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে; এখানেও মৃত্যুর যে আয়োজনে তাদেরকে কাজ করতে বলা হচ্ছে, তাও যেন তাদের আত্মার এক রকম মুক্তি!

নাৎসিদের ক্ষেত্রে কথাটি বীভৎস রূপ নিয়ে আসলেও মানুষের বহু হাজার বছরের ইতিহাসে এই রকম কথাই নানাভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছে– গতর খাটার মাধ্যমেই তাদের জন্ম সার্থক হবে। এটি নানা সময় নানাভাবে এসেছে। দীর্ঘতম সময় ধরে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে এসেছে দাস হিসেবে কাজ করানোর মাধ্যমে, অথবা নিচু তলার শ্রমিক হিসেবে। তারাই রোমান যুদ্ধ জাহাজ গ্যালিয়নের দাঁড় বেয়েছে, চাবুক হাতে তাল রাখা সৈন্যের দেয়া তালে তালে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন; পিরামিডের বিশাল পাথরগুলো টেনে তুলেছে; অমানুষিক পরিশ্রমে জীবন দিয়ে দুনিয়ার সভ্যতাগুলো গড়েছে। শ্রমের

কারণে তারা কখনো মুক্তির স্বাদ পেয়েছে একথা বিশ্বাস করা শক্ত, বড়জোর মৃত্যুর স্বাদ পেতে পারে।

শিল্প বিপ্লবের কারখানাগুলোতে বা খনিতে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সবাই দৈনিক প্রায় ষোলো ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করলে, জাহাজগুলোর ডেকে সাধারণ নাবিকরা প্রাণ হাতে মাস্তুলে উঠে কাজ না করলে, কামানের রসদ হবার জন্য হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য এগিয়ে না আসলে আজকের ধনী দেশগুলো ধনী হতো কীভাবে? ইতোমধ্যে তাদের মানুষদের জন্য শ্রমের পরিস্থিতি খানিকটা বদলিয়েছে বটে কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ ওভাবেই খেটে যাচ্ছে। কোভিড বিশ্বমারি যখন সবার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিককে তখনো বাঁচার তাগিদে দুনিয়ার বস্ত্র যোগাতে খেটে যেতে দেখে, এবং আমেরিকার মীট প্যাকিং ফ্যাক্টরি অর্থাৎ কসাইদের কারখানাগুলোতে ভিন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদেরকে অভাবনীয় নারকীয় পরিবেশে মাংস কাটতে দেখে সেই প্রশ্নটাই এখনো আসে যে ওরা যদি ওভাবে জীবন হাতে করে শ্রম দিয়ে না যেতো তা হলে মালিকরা এমন ধনী হতো কী করে? দুনিয়ার সুখীদের নিশ্চিন্ত অন্ন-বস্ত্র কাথেকে আসতো। এতে দুনিয়া মুক্তি পেয়েছে, দেশ মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু ওই মানুষগুলো মুক্তি পেয়েছে কি? তারা কখনো এই শ্রম উপভোগ করেছে, তাতে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, এসব কথা ছেলে-ভুলানো কথা মাত্র। বরং শ্রমের গুণগান করেছে তারাই যারা এ শ্রমের উপকারগুলো ভোগ করে ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে অথচ নিজেদেরকে কখনো শ্রম দিতে হয়নি।

এসব শ্রম আরও অসহনীয় হয় যখন একেতো গায়ের খাটনি তার ওপর একঘেঁয়েভাবে একই কাজ ক্রমাগত করে যেতে হয়– বলতে গেলে জীবন ভর। কায়িক শ্রম না হয়েও যদি কাজ এমনিই একঘেঁয়ে গতানুগতিক হয় তখনো তাকে অসহ্য মূল্যহীন কাজ বলেই শ্রমিকের নিজের কাছে মনে হবে– অন্যেরা তার যত মূল্যই দিক না কেন। কারখানার পরিবেশে এরকম কাজকে আমরা বার বার একটি স্ক্রু ঘুরিয়ে দেয়া কাজ বলি, আর লেখাজোকার মধ্যে এরকম কাজকে আমরা কেরাণিগিরি বলি। সুইডেনে থাকতে সেখানকার টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম– কোন কথাবার্তা নেই একজন শ্রমিক একটি যন্ত্রে চাকা ঘুরে তার কাছে আসা মাত্র আর একটি চাকা থেকে একটি প্লেট তুলে সেখানে রাখছিলো, কয়েক সেকেণ্ড পর পর, প্রায় বিশ মিনিট ধরে শুধু এটিই বার বার করতে দেখিয়ে গেছে। যারা দেখেছে বিরক্ত হয়ে টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়েছে। অনুষ্ঠানটি বুঝাতে চেয়েছে যে যা বিশ মিনিট দেখাটাও মানুষ সহ্য করতে পারে না, তা

অনেক মানুষ সারাদিন, সারা জীবনভর করে যাচ্ছে কীভাবে? আজ যাঁরা অর্থপূর্ণ কাজের দ্বারা মানুষটির জীবন সার্থক হয় এমন কথা বলেন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন অসংখ্য দুর্ভাগা মানুষের জন্য সে কাজ মানে কী। তারপরও তাঁরা এই শ্রমের মহিমার কথা বলেন, কখনো শ্রম দিতে ব্যর্থ হলে মানুষগুলোর জীবনই ব্যর্থ মনে করেন; কিন্তু নিজেদেরকে সব সময় মালিক, ম্যানেজার, নীতি-নির্ধারক, বিশ্লেষক ইত্যাদির ভূমিকায় দেখেন। আসলে তাঁদের দুঃখ শ্রমিক কাজ পেলোনা তার জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি ওদের কাজ না থাকলে নিজেদের জন্য যে ওই সব ভূমিকা আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা সেখানেই।

এই মানুষগুলোকে এসব কায়িক শ্রম ও একঘেঁয়ে কাজের শ্রম থেকে মুক্তি দেবার কথাই ভাবা উচিত, কারণ মুক্তি ওই শ্রমের মাধ্যমে নয়, বরং শ্রম থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমেই। সভ্যতার ইতিহাসের বড় অংশটি দাসদের কায়িক শ্রমের ওপর সবকিছু গড়ে তোলার পর অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি কয়েক শ' বছর আগে মাত্র ওরকম দাসত্ব থেকে মানুষকে রেহাই দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু অমানবিক শ্রম থেকে নয়। একেবারে বর্তমান যুগেও যে প্রকারান্তরে দাস-শ্রম রয়েছে এবং বিশ্ব সমাজকে তার বিরুদ্ধে এখনো লড়াই করতে হচ্ছে সে কথাও ভুলে গেলে চলবে না। তবে ওই কয়েকশত বছরে ওই মানুষগুলোকে কিছুটা রেহাই দেবার পথে বড় বড় অগ্রগতি হয়েছে। দাসত্ব প্রথা উঠে গেছে, সামন্ত প্রথায় ভূমিদাস হিসেবে থাকা প্রজারাও রেহাই পেয়েছে। দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমেছে– অন্তত নির্দিষ্ট হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমটিকে সহনীয় করার জন্য কিছু যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এসব সত্ত্বেও সারা দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো সারাদিন কায়িক শ্রম করে দুবেলার অন্ন যোগায়। বিশ্বায়নের একটি ফল হয়েছে সেই কায়িক শ্রমের দায়টি ক্রমে কম অসহায় থেকে বেশি অসহায় দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে, কারণ সেখানকার মানুষকে আরও কম অর্থ দিয়ে বেশি শ্রম করিয়ে নেয়া যায়। সেটি ঘট্‌ছে শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের কাজটি অসহায় দেশে ছেড়ে দিয়ে এবং ওই দেশ থেকে ওরকম শ্রমিক নিজের দেশে নিয়ে এসে। অবশ্য অসহায় দেশের জন্য দুটিই মন্দের ভালো, কারণ এরকম না হলে তারা আরও অসহায় হয়ে পড়তো। কাজেই এই অল্প পারিশ্রমিকে শ্রম দেবার সুযোগটি অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে এটিই স্বাভাবিক। অন্য দেশের শ্রমিকের কাছে এ কাজ চলে গেলে যেরকম আতঙ্ক, তেমনি রোবট-শ্রমিকের কাছে চলে গেলে আরও বেশি আতঙ্ক।

শেষের ক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের হাতেই কাজ আর থাকবে না, একেবারে যেগুলো নেহাৎ কায়িক শ্রমের কাজ নয় সেগুলোও থাকবে না। কাজেই সেখানে প্রায় বিশ্বজোড়া আতঙ্ক। আগে এগুলো উন্নত দেশের প্রসঙ্গে কিছু কিছু শোনা যেতো যে সেখানে কারখানাতে রোবট-শ্রমিকরা কাজ করছে, তাই কিছু কিছু মানুষ-শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে– তা ছিল বেশ দক্ষ শ্রমিকদের কাজগুলোতে যেমন গাড়ি তৈরির কারখানায়। এখন সেদিকে পানি অনেক গড়িয়ে গেছে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বলীয়ান হয়ে রোবট-শ্রমিক এখন সবার জায়গা নিয়ে নেয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, অনেক জায়গায় নিয়ে নিচ্ছেও। সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত অসহায় দেশের মানুষ যেমন রক্ষা পাবে না, তেমনি উন্নত দেশের মানুষও না। কিন্তু তাই বলে কী আমাদের শুধু আতঙ্কিতই হওয়া উচিত? হ্যাঁ যদি যারা রোবট-শ্রমিক আন্‌ছে তাদেরকে যথেচ্ছভাবে তা করতে দেয়া হয়, এ নিয়ে কোন আইন-কানুন, বিচার-অবিচার কিছু না থাকে তা হলে আতঙ্ক ছাড়া আর কীই বা হতে পারে। কিন্তু এটি তো একটি সুযোগও বটে যা লক্ষ বছরের মানুষের ইতিহাসে কখনো আসেনি– শ্রম থেকে মুক্তির সুযোগ। যথেচ্ছভাবে না করে সুবিচারের মধ্য দিয়ে করলে এটি মানবজাতির জন্য একটি সবচেয়ে বড় সুযোগ হতে পারে, আর সেই সুবিচারটি করতে হবে পুরো বিশ্বকে মিলে, পুরো বিশ্বের জন্য আসা এ আশীর্বাদকে বরণ করতে।

শ্রম থেকে মুক্তিঃ

উন্নত দেশে সবাই না হলেও অনেকে কঠিনতম কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি আগেই পেয়ে গেছে, সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নয়, বরং এগুলোকে গরিব দেশের মানুষের কাছে চালান করে দিয়ে। এখন বাকি সব মানুষদেরও সে মুক্তি পাওয়ার পালা, এবং তার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই ভরসা। স্বাভাবিকভাবে কায়িক শ্রম আর গতানুগতিক বার বার একইভাবে করে যাওয়া কাজগুলোই শুধু আমরা যান্ত্রিক কর্মীদের হাতে ছাড়তে চাইবো; আমাদের পছন্দনীয়, উপভোগ্য সৃষ্টিশীল কাজগুলো নয়। কায়িক শ্রমের ও গতানুগতিক কাজের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কর্মীর সুবিধাটি কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয়না– কারণ সে যে ক্লান্ত হয় না, ভুল করে না, বিরক্ত হয়না এসব সবাই জানে। কিন্তু এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এত উন্নত হয়েছে যে আমাদের উপভোগ্য কাজগুলোও সে নিয়ে নিতে শুরু করেছে। কারণ সেগুলোতেও সে আমাদের থেকে ভালো করার উপক্রম করেছে। তার মানে কি আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাত-পা বেঁধে দেবো যাতে সে কিছু কাজ করতে পারবে,

বাকিগুলো করতে পারবে না। না সেটি সম্ভব নয় কারণ প্রযুক্তিকে হাত-পা বেঁধে দিয়ে তার থেকে কিছুই পাওয়া যায় না, মানুষেরও অগ্রগতি হয় না। স্বল্পমেয়াদে আমাদেরকে অসহনীয়, অপছন্দনীয় কায়িক ও গতানুগতিক কাজগুলো যন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাকিগুলোতে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। যাদের দেশের বহু মানুষ ওই শ্রমের কাজের ওপর নির্ভর করে তাদের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষেই সেটি করতে হবে। সেই বাকিগুলোতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক সুবিধা আছে আমাদের থেকে ভালো কাজ করার, কিন্তু আমাদেরও অনেক সুবিধা আছে তার থেকে এসব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করার; সেখানে আমরা প্রতিযোগিতা করবো, আবার যন্ত্রের সঙ্গে মিলে একত্রে কাজ করে সব কিছু আরও উপভোগ্য করে তুলবো। তাই কায়িক শ্রমের কাজগুলো যখন রোবটের হাতে চলে যেতে থাকবে মানুষ-শ্রমিকদেরকে অন্য দক্ষতার কাজে সরিয়ে নিতে হবে যেখানে যান্ত্রিক কর্মী এখনো প্রবেশ করতে পারেনি, বা অন্তত ব্যাপকভাবে পারেনি। যত তাড়াতাড়ি এটি করা যায় ততই ভালো।

তবে দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে এটি করার ক্ষেত্র কিছু সীমিত হয়ে আসবে। শেষ পর্যন্তই অবশ্য সৃষ্টিশীল কাজগুলোতে আমাদের অগ্রগণ্যতা থাকবে, আর অগ্রগণ্যতা থাকার কথা সেবার, সহমর্মিতার কাজে। সেখানেও যন্ত্র কাজ করবে না, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পাল্লা দেবেনা তা নয়, এখনই দিচ্ছে কিছু কিছু; কিন্তু অনেকের মত আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেখানে মানব মস্তিষ্কের ওই অপূর্ব জিনিসটি– চেতনাবোধ– তাকে বেশকিছু সুবিধা দেবে, যা যন্ত্রের কখনো থাকবে না। সেখানে যন্ত্র আমাদের ওপর নির্ভর করবে। আমরা সেগুলো করেই আনন্দ পাব, বাধ্যবাধকতার জন্য যে করবো তা নয়, আনন্দের জন্যই, তৃপ্তির জন্যই করবো, আর করবো সৃষ্টিশীল হয়ে যন্ত্রকে পরিচালনার জন্য। আমাদের আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, শুধু সবাই মিলে সমঝোতায় কাজ করতে হবে। সেভাবে কাজ করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থনীতি বিশ্বময় গড়ে তুলতে পারবো যা কিছু মানুষের কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করবে না, উৎপাদন ও অনেক সেবার দায়িত্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিলেও মানবোচিত উপভোগ্য কাজগুলো মানুষের হাতেই থাকবে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও। কাজেই মানুষের সীমিত কাজ তার সমৃদ্ধির পথে কোন বাধা হবে না। কীভাবে বিশ্ব-সমঝোতার মাধ্যমে সেটি সম্ভব হতে পারে তা একটু পরে দেখবো।

যেটি বড় কথা সেটি হলো প্রথম বারের মত বাধ্যতামূলক কায়িক শ্রম থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়া যাবে। মানুষের জন্ম এমন কাজের জন্য হয়নি,

এটি আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেভাবেই মানুষকে এতদিন কাটাতে হয়েছে, তাদেরকে যতখানি মুক্তি দেয়া সম্ভব ছিল ততটুকুও আমরা দিইনি, বরং সুবিধাভোগীরা নিজেদের কাছে সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য তার সুযোগ নিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসার পরও এটি অব্যাহত রাখার কোন যুক্তি আর থাকে না। অবশ্য সাবধান না হলে এই কুক্ষিগত করার বিষয়টি তার ফলে কমার থেকে বরং আরও বেড়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। কারণ গুটিকতেক মানুষ বা কোম্পানি যদি ওই কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে তাই ঘটবে, যার ফলেও আবার ব্যাপক অবিচার শুরু হতে পারে। তখন ওই নিয়ন্ত্রকরা বাকি মানুষের ভাগ্য কেড়ে নেবে। সেজন্যও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্ব সমাজের সমঝোতার মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, হয়তো বিশ্ব ইউনিয়নের বড় প্রয়োজন এখানেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বুদ্ধিটি আসে আগের অসংখ্য প্রকৃত ঘটনার উপাত্ত থেকে। আসলে এটি একটি অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার যা একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে অসংখ্য কাজ করতে পারে খুবই দ্রুত গতিতে, আবার করতে করতে নিজেকে আরও 'শিক্ষিত' করে তুলতে পারে যাকে বলা হয় 'মেশিন লারনিং'। ওভাবে এটি নিজের জন্য নিজেই আরও ভালো কর্ম-প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে পারে– অর্থাৎ কিনা নিজেকে নিজে প্রোগ্রাম করা। এসব গুণের ফলে ওই অসংখ্য উপাত্ত থেকে শিখে শিখে সে তার ক্ষমতা বা বুদ্ধি বাড়াতে পারে। এভাবে বিশাল সংখ্যক উপাত্ত থেকে মূল্যবান খবরগুলো বের করে আনার জন্য বহু সংখ্যাতাত্ত্বিক উপায় আছে– সংখ্যাতত্ত্বের ছাত্ররা জানে সেগুলো কী রকমের। এভাবে উপাত্ত থেকে মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক খবরগুলো জানার মাধ্যমেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সম্ভব হয়। কম্পিউটারের কাজের গতি যেহেতু মানুষের থেকে অনেক দ্রুত তাই এটি এত অসংখ্য উপাত্ত নিয়ে কাজ করতে পারে নিমিষের মধ্যে। ওই উপাত্ত খুঁজে নেয়া আর সেগুলোকে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করতে পারার মাধ্যমেই তার বাহাদুরি, এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বহু ক্ষেত্রে আমাদেরকে টেক্কা দিতে পারে। বলা হয় 'বিগ ডাটার' ওপর দখলেই আসে তার সাফল্য।

কাজেই যন্ত্রের সব বুদ্ধি আসছে আগের অভিজ্ঞতা থেকে, সে অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবান তথ্যগুলো যে সূক্ষ্মভাবে নিংড়ে নিতে পারে বলে। যেমন কোন কিছুর চেহারা, আকৃতি, প্রকৃতি দেখে সে আগের অভিজ্ঞতা থেকে ওটিকে চিনতে পারে। তাহলে সে যদি কারখানায় রোবট শ্রমিক হিসেবে কাজ করে সেখানে কোন জিনিসটি তুলে নিতে হবে, কোনটি ধরতে হবে,

কোনটি ঢুকাতে হবে তা সে চিনে চিনে করতে পারে, মানুষের মতই। একই সক্ষমতা দিয়ে সে মানুষকেও চিনতে পারে, বহু মানুষের মধ্যে একজনকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পারে। এভাবে হাতের লেখা দেখে কার হাতের লেখা তাও শনাক্ত করতে পারে, হাতের লেখাকে ছাপার অক্ষরে নিয়ে যেতে পারে, কার গলার স্বর তা শুনে বুঝতে পারে, মুখে যা বলা হয়েছে তা টাইপ করে লিখে দিতে পারে– এমনিতরো নানা কাজ। ওই অসংখ্য উপাত্তের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেই এগুলো পারে, যেমন এক এক জনের গলার স্বরের ফ্রিকোয়েন্সির উঠা-নামার প্যাটার্ন চিনে নেয়ার মাধ্যমে সেই মানুষকে চিনতে পারে। শুধু তাই নয় একটি জিনিসের মধ্যে কিছু গুণাগুণ লক্ষ্য করলে, অন্য কোন জিনিসে সে ধরণের গুণ আছে এটি তা খুঁজে বের করতে পারে।

এটি যদি একটি বাক্স হয় তা হলে ঠিক এর মত আকার-আকৃতি বা স্টাইলের আর একটি বাক্স খুঁজে বের করতে পারে। কিন্তু বাক্সের ক্ষেত্রে কাজটি সহজ কারণ বাক্সের গুণাগুণ বেশি হয় না। যদি তা একটি সিনেমা হয় তা হলে এটি ওই সিনেমার মত নানা সূক্ষ্ম গুণ আছে এরকম বেশ কিছু সিনেমা খুঁজে একত্র করতে পারে। আপনি হয়তো নেটফ্লিক্সের মত চ্যানেলে সিনেমা দেখতে গিয়ে তা লক্ষ্য করেছেন। একটি সিনেমা যদি আপনি পছন্দ করে দেখেন, দেখবেন সে আরও দশটা সিনেমা এনে বলছে 'যেহেতু আপনি অমুক সিনেমা পছন্দ করেছেন, তার মত এগুলোও আপনার ভালো লাগবে'। স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেটে নানা সাইটে যাওয়ার ব্যাপারেও সেটি দেখা যায়। আমি সাধারণত যে সব বিষয়ের সাইটে যাই দেখা যায় সে রকম আরও বেশ কিছু সাইট আমার ফোনে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ; এভাবে আমার সূক্ষ্ম পছন্দগুলো ধরতে পেরে সেগুলোর মত আরও যোগাড় করে আনা সহজ কাজ নয়। অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান মানুষকে এই সিনেমা বা সাইট খোঁজার কাজ দিলে অনেক সময় নেবে তাঁর এটি করতে।

বড় বড় নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রায়ই অনেক উপাত্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় কাদেরকে কোন্ দলে ফেলা যায় তা নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাজ দেখা যাক। যখন একটি ব্যাংক কাউকে ঋণ দেয়ার জন্য বিবেচনা করে এখন তাঁর আয়, তাঁর চাকরি, বা তাঁর অন্য কাজের ধরণ, তাঁর অতীত ঋণ গ্রহণের ও পরিশোধের ইতিহাস, উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর আগের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলো, ইত্যাদি অনেক কিছু বিবেচনা করে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে উপযুক্ততার বিভিন্ন দলের একটিতে তাঁকে ফেলার চেষ্টা করে। একজন মানুষ-কর্মকর্তা বড়জোর কয়েক জন সম্ভাব্য ঋণ

গ্রহীতার বিষয়ে সব তথ্য নিয়ে কাজটি করতে পারেন, যথেষ্ট সময় লাগিয়ে। যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা বিপুল সংখ্যক এরকম ঋণের দরখাস্তকারীর উপাত্ত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে তাঁদেরকে চট্‌পট্ নানা দলভুক্ত করতে পারে। একই সঙ্গে বহু উপাত্তের মধ্যে পরস্পর তুলনা করতে পারে বলেই তার পক্ষে এটি সম্ভব হয়। এটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কাকে ঋণ দিলে ব্যাংকের কী রকম ঝুঁকি থাকবে। আসলে উচ্চতর অনেক সিদ্ধান্তই তো ঝুঁকি নির্ণয় ও ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপার।

একজন ডাক্তার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কীভাবে করেন? বেশ কিছু লক্ষণ এক সঙ্গে মিলিয়ে অথবা বেশ কিছু পরীক্ষার ফল (রক্ত, এক্সরে, আল্‌ট্রাসনোগ্রাম ইত্যাদি) এক সঙ্গে মিলিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন রোগটা কী, এবং তা কী অবস্থায় আছে। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করেন চিকিৎসার কোন পথে গেলে ভালো হবার সম্ভাবনা কী রকম। এই কাজগুলো মানুষ-ডাক্তারের মত এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডাক্তারও করতে পারছে। নীতিগতভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা ওই একই– আগের অসংখ্য উপাত্ত থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরস্পর তুলনা করে প্রাসঙ্গিক খবরগুলো বের করা, এ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গেও মিলিয়ে নেয়া– অর্থাৎ নিজের 'অভিজ্ঞতা' ও 'শিক্ষা'র ওপর নির্ভর করা। মানুষ-ডাক্তারও ঠিক তাই করেন, তবে এক সঙ্গে এত উপাত্ত নিয়ে এত দ্রুত করতে পারেন না। তারপরও এতে হয়তো তাঁরই সুবিধা বেশি রয়েছে; এমন কিছু সূক্ষ্ম বিবেচনা আছে যা মানুষ সহজাতভাবে পারে; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চেতনার অভাবে তা পারে না। সেগুলোর বিবেচনায় অভিজ্ঞ ও সংবেদী মানুষ-ডাক্তার কখনো অনেক জটিলতার ভেতর হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টিতে একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু গতানুগতিক ডাক্তারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক দ্রুত ও অনেক ভালো করে। এমনকি একটি এক্সরে' বা আলট্রাসনোগ্রাম, বা ক্যাটস্ক্যান দেখে তার সূক্ষ্ম আলো-ছায়ার কোন অংশ মানুষ ডাক্তারের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডাক্তারের তা এড়াবে না। এই এসব কাজ দ্রুত ও নির্ভুল করতে তার ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ডাক্তারির অনেক গতানুগতিক অংশ তার হাতে চলে যেতে পারে।

উপাত্ত বলতে সব সময় তা সংখ্যায় প্রকাশ পাবে এমন কথা নয়, সেটি পেলে অবশ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজটি সহজ হয়। উপাত্ত অন্য রূপে খবর হিসেবে আসতে পারে, যেমন ধরা যাক একটি গবেষণা করতে গিয়ে আমি বহু মানুষের পরস্পরের মধ্যে ইমেইল চালাচালিগুলো দেখছি। এগুলো আলাপ-সংলাপের মত লেখা, এগুলো থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য বের করে

আমাকে কোনভাবে তাদেরকে সংগঠিত উপাত্তের আকারে সাজাতে হবে গবেষণার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে। এতে মোটা দাগে শ্রেণি বিভাগ থাকবে, আবার তার অধীনে আরও চিকন দাগের জিনিসগুলো আসবে, কোন্‌টির অধীনে কোনটি যাবে তা ঠিক করে। ইমেইলের ধরণ, তার বিশেষ ধরণের বাক্য, শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদির দিকেও হয়তো লক্ষ্য করতে হবে। এর মধ্যে কোন্‌টি কী ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে হবে; লেখার সময় কার মনে কী কাজ করছিলো তাও। একজন অভিজ্ঞ গবেষক হিসেবে এবং মানবচিন্তায় অভ্যস্ত মানুষ হিসেবে আমার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব, যদিও বেশ ধীর গতিতে এক এক ইমেইলের জন্য অনেকটা সময় লাগিয়ে। কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার জন্য যতটা সহজ এরকম একটি গবেষণার কাজ করা সেটি তা না হওয়ারই কথা– কারণ এ তো রীতিমত রচয়িতার বা সমালোচকের মন নিয়ে কথা– যা সংখ্যায় নয়, কথামালার সৌকর্যে প্রকাশিত। কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো একই সুবিধা ব্যবহার করে যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা এখন তাও করতে পারছে, মানুষের থেকে অনেক দ্রুত। এভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য আলোচনার মধ্যেও চলে এসেছে, আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত করে। তবে সৃজনশীল সাহিত্য, যেখানে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার ওসব ক্ষেত্রে মানুষের মত মুনশিয়ানা পেতে তার আরও অনেক বাকি। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখনই উপন্যাস ও কবিতা লিখছে, এক্ষেত্রে পাঠকরা খুব সম্ভব বরাবরই মানুষ সাহিত্যককেই বেশি পছন্দ করবেন।

কিছু উপাত্ত কোনদিকে যাচ্ছে সেই প্রবণতাটি ধরতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন উপাত্তের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় থেকে যা জানা যায়। এক একটি উপাত্ত যদি সময়ের গ্রাফে এক একটি বিন্দু হয় সেই বিন্দুগুলো যোগ করে কী রকম রেখা দাঁড়াচ্ছে উপাত্তগুলোর প্রবণতা সেখান থেকে গাণিতিকভাবে পাওয়া যায়। এটি জানা বেশ মূল্যবান হতে পারে যেমন স্টক এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে– অসংখ্য নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে কোন স্টকের মূল্য কেমন বাড়বে বা কম্‌বে তার প্রবণতা নির্ণয়, মানুষের জন্য খুবই জটিল কাজ হতে পারে। এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফ্‌টওয়্যারের অনেক সুবিধা– তা প্রতি মুহূর্তে প্রকৃত উপাত্ত থেকে ক্রমাগত শিখছে, অভিজ্ঞ হচ্ছে, নিজেকে আরও উপযুক্ত করে তুল্‌ছে।

এতো সব সক্ষমতা যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা পেরে উঠবো কেন? সব ক্ষেত্রে পারার দরকারও বা কী? আমাদের শুধু একটি জিনিস পারতে হবে তা হলো একে সব মানুষের জন্য নায্যভাবে

এবং উপকারীভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতাটি আমাদের থাকতে হবে– যেন নিজেদের কাজ হারিয়ে কাউকে দিশেহারা হতে না হয়। আর দেখতে হবে এই সুযোগে সব সক্ষমতা ও সম্পদ যেন কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হতে না পারে, ধনবৈষম্য যেন কমার বদলে আরও বেড়ে না যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তার উচ্চ সক্ষমতার কারণেই অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিশ্বে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এর চেয়েও ক্ষতিকর এমনকি পুরো বিশ্বের জন্য চরম ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তিকেও আমরা অতীতে নিয়ন্ত্রণ করেছি– সেটি দেশে দেশে জমিয়ে রাখা ভয়ঙ্কর নিউক্লিয়ার অস্ত্র। সমঝোতার মাধ্যমে আমরা তাকে শুধু ধ্বংস থেকে বিরত রাখিনি, একই প্রযুক্তিকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ভালো উৎসে পরিণত করেছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবশ্য আমাদের জীবনের সব কিছুকে স্পর্শ করবে বলে এর বিষয়ে সমঝোতাকে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী ও বিচক্ষণ হতে হবে। সেটি যদি করতে পারি তা হলে এই প্রযুক্তি আমাদেরকে সেই অতি কাম্য লক্ষ্যটি অর্জন করতে দেবে কায়িক শ্রম থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে, অর্থহীন একঘেঁয়ে গতানুগতিক কাজ থেকেও।

অন্য কোন দিক থেকেও এর মধ্যে আমাদের অহেতুক আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, যেমন ছিলনা অতীতের প্রযুক্তি বিপ্লবগুলোতেও। চিঠি বহনকারী রানার বেচারাকে রাত-দিন দৌড়ানোর থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমরা টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে-রেডিওতে সেই কাজ করেছি। তাতে মানুষ উচ্চতর পর্যায়ে কাজ করতে পারছে, বিশ্বময় আলাপ উপভোগ করছে। সেই প্রযুক্তির সঙ্গে যেভাবে চুটিয়ে কাজ করে আমরা জীবনকে কিছুটা পরিবর্তন করেছি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে তেমনি মানব জীবনকে আগাগোড়া বদলে দেবো। এর লক্ষ্য হবে মানুষের একটি বড় অংশকে আর নির্মম, নিরানন্দ, অনেক সময় নিষ্ঠুর শ্রমের মধ্যে জীবন কাটাতে হবেনা; সবাই উপভোগ্য কাজ করবে, এবং তারপরও অভাবে থাকবে না।

প্রাথমিক বাধাটি সরিয়েই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ মানুষঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে মানব-ইতিহাসের একটি শীর্ষে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যদি বিশ্ব-সমঝোতার মধ্য দিয়ে সবকিছু ঘটে। তবে ওই শীর্ষে আরোহণের শুরুতেই আমাদেরকে কিছু বাধা অতিক্রম করেই এগুতে হবে, তাও করতে হবে ওই সমঝোতার মধ্য দিয়েই। আসলে কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তার অনেকখানি সক্ষমতা অর্জন ও তার প্রয়োগ অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে, যদিও খুব প্রকাশ্যে নয়, মোটেই ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়। এর সাহায্যেই বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যকে অনেক উন্নত করতে পেরেছে, অনেক লাভজনক করতে পেরেছে। সেগুলোর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে যাচ্ছে। এতে আমরাও উপকৃত হচ্ছি, যদিও প্রায়ই অজান্তে– যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করি, কিংবা উবারে ট্যাক্সি ডাকি, এমনি বহুতরো কাজে। কিন্তু এর মধ্যেই কিছু মানুষ তাদের চাকরিও হারাচ্ছে– এখনো এমন ব্যাপকতায় নয় যে তা বিরাট ঝড় তুলবে। তবে শিগগির যে রকম ব্যাপকতায় চলে যেতে পারে। লাভজনক হচ্ছে বলে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে, অন্যরাও করবে যখন তাদের জন্যও লাভজনক হবে তখন; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা ইতোমধ্যেই অনেক দিকেই রয়েছে। এখন মোটর গাড়ি শিল্প, ও অন্যান্য কিছু উচ্চ দক্ষতার শিল্পে এটি সীমিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে রোবট শ্রমিক এবং রোবট সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী হিসেবে। কিন্তু যে কোন দিন এটি আমাদের দেশের মত পোষাক শিল্পে এবং মধ্যপ্রাচ্যের নির্মাণ শিল্পেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে ওই লাভজনক হবার কারণে। এতে কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সত্য, তিনি সেই অর্জন উপভোগের আগেই ভুক্তভোগী দেশসমূহে বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয় নামতে পারে। এর ফলাফল যে শুধু এসব দেশে সীমাবদ্ধ থাকবেনা সেটিও স্পষ্ট। এটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত সৃষ্টি করবে। যেই লাভজনকতার লোভে এর বেপরোয়া একতরফা প্রয়োগ, তাও হয়তো ওই বিশৃঙ্খলার কারণে ফলপ্রসূ হবে না। আসল শীর্ষে আরোহণের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা এখানেই। যদি সেখানে যেতে হয় তা হলে এটি এড়িয়ে অথবা এটি অতিক্রম করেই যেতে হবে– তার একমাত্র উপায় বিশ্বজনীন বাধ্যবাধকতায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত প্রয়োগ। সে রকম প্রয়োগ সবার জন্য বিকল্প জীবিকা অথবা বিকল্প আয় সৃষ্টি করেই এগুবে।

আর একটি বাধা, আর একটি বড় সংকট, যা গোড়াতেই দেখা দিতে পারে তা হলো রোবট-কর্মীদের কারণে মানুষের শ্রম মূল্যহীন হয়ে পুঁজিতেই সব মূল্য পুঞ্জীভূত হবে এবং যেই পুঁজি আবার কুক্ষিগত হবে ওই গুটিকতেক কোম্পানির হাতে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা নিজেরদের সীমাহীন পুঁজির দ্বারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উৎপাদন, সেবা ও সম্পদ সৃষ্টির পুরো ব্যাপারের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াবে। তারা

যথেচ্ছ ভাবে মানুষের দৈনন্দিন সব যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা থেকে সব উপাত্ত অবৈধভাবে আহরণ করে নিজের আওতায় নিয়ে নেবে তাদের প্রযুক্তি শক্তিতে; আর তার বলেই তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলীয়ান হবে। এটি বিশ্বজোড়া বৈষম্যকে একটি চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এভাবে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভূতপূর্ব সম্ভাবনাকে শুরুতেই শেষ করে দিতে সক্ষম। এই বাধাও এড়াতে পারে বিশ্বজনীন বাধ্য-বাধকতা, হয়তো বা বিশ্ব ইউনিয়নের বৈশ্বিক হস্তক্ষেপ। সে ক্ষেত্রে ওই পুঁজিকে উচ্চ মাত্রায় বিশ্ব-করের আওতায় এনেই সম্ভব হবে মানুষের কাজ হারাবার ক্ষতিপূরণ; কাজ হারোনো বরং উল্টো শপে বর হবে, মানুষ অমানবিক কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত হবে।

তবে এই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে অনেক জুজুর ভয়ের মত কথা হয়েছে সেগুলো অমূলক। স্বার্থপরতাকে লাগামহীন হতে না দিলে এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এখনো এটি যেভাবে এগুচ্ছে তা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে খাইয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগুচ্ছে বলা যায়। তাই এটি যে পরিবর্তনগুলো আন্‌ছে তাও ধীরে ধীরেই মানুষের অভ্যাস ও জীবনাচরণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আসছে যার অনেক কিছু মানুষ ওভাবে লক্ষ্যও করছে না। তথ্য-প্রযুক্তির নানা সেবা, উবারের মত যানবাহন ডেকে নেবার সুযোগ, নতুন জায়গায় ভ্রমণে গিয়ে সস্তায় ও ঘরোয়াভাবে মানুষের বাসায় থাকার ব্যবস্থা এয়ারবিএনবি, কোভিড বিশ্বমারির বিরুদ্ধে দ্রুত টিকা উদ্ভাবনের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা, ইত্যাদির মাধ্যমে এটি সবার কাছে একভাবে পৌঁছে যাচ্ছে। এর জন্য কোথাও সবকিছু ওলটপালট করে দেবার মত ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে জাতিসংঘের যে সংস্থাগুলো আছে সেগুলোর ভেতরে অথবা তার বাইরে জরুরিভিত্তিতে সমঝোতা ও বাধ্যবাধকতার আলোচনা শুরু করে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবকে উপকারের মধ্যেই রাখতে পারি, কারো ক্ষতির কারণ যাতে হতে না পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরও শক্ত সমঝোতার দরকার হবে, আরও গণতান্ত্রিক ও আরও কার্যকর একটি বিশ্ব ইউনিয়নেই যা সম্ভব।

দেখতে হবে বেশি মানুষ যেন এক সঙ্গে চাকরি না হারায়, যারা হারাচ্ছে বা হারাবার হুমকির মুখে রয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে অন্য কম কায়িক শ্রমের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে, আর তা যতদিন সম্ভব না হবে উপযুক্ত বেকার ভাতার। যে সব দেশ ও যে সব কোম্পানি এতদিন এই মানুষগুলোকে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে লাভবান হয়েছে এবং এখন তার বদলে যান্ত্রিক কর্মীর মাধ্যমে ওই পণ্য পেয়ে আরও অনেক বেশি

লাভবান হচ্ছে, তাদেরকে এই পুনর্বাসন কাজের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য অবদান রাখতে হবে। যে সব কর্মীরা ভবিষ্যতে এই চাকরির বাজারে আসার কথা তাদেরকে আগে থেকেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিন্নতর টেকসই চাকরির জন্য তৈরি করতে হবে– যার বেশ কিছু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারার চাকরি। তাছাড়া তারা যাবে সেসব কাজে যেখানে শিগগির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হবার সম্ভাবনা নেই– যেখানে মানবিক অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনশীলতা ও চেতনা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

আরও কিছু খাতে তাদেরকে এবং সকল তরুণ-তরুণীদেরকে আকৃষ্ট করে প্রশিক্ষিত করে তোলা উচিত যা হলো সহমর্মিতার সঙ্গে সেবাদানের খাত– যার মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ, প্রতিবন্ধীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা-সেবা, শিশু-শিক্ষা ইত্যাদি থাকবে। তাছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে সমৃদ্ধি ও অবকাশ সৃষ্টি করবে তার ফলে পর্যটনের যে ব্যাপক প্রসার ঘটাবে তাতে পর্যটন ও আতিথ্য সেবাদানেরও প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কথা। পুরো চিকিৎসা খাতটি একদিকে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বেশ কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, তেমনি সহমর্মী মানুষ স্বাস্থ্য সেবকের ভূমিকাও অনেক বাড়বে। যে সব কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সহমর্মী সম্পর্ক সৃষ্টি করেই ভালো করা সম্ভব সেখানে মানুষ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বাড়বে।

ভুলে গেলে চলবেনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জন্য মানুষের পরিবেশেই ব্যবহৃত হবে, তার বাইরে নয়, অতীতের সব প্রযুক্তি যেভাবে হয়ে এসেছে। সেই মানব পরিবেশের বাইরে তার অস্থিত্ব কষ্ট-কল্পনা মাত্র। মানুষকে অথর্বে পরিণত করে এটি কখনো বিকশিত হতে পারবে না। এর নিয়ন্ত্রণ ও এর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতেই থাকবে, তা সে মানুষের যে রকম সংস্থার ওপরেই হোক। তবে সেটি সার্বিক বিশ্ব-মানুষের সংস্থার ওপরে থাকাটাই কাম্য। একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যদিও অধিকাংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার মানুষের চেহারার মত কিছু না হলেও যেখানে তার সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা দরকার সেখানে মানুষের অবয়বেই তাকে রাখা হয়– যাদের মানুষ-সদৃশ রোবট হিসেবে আমরা চিনি। হাসপাতালে, নানা বাণিজ্যস্থলে, দোকানে, রেল ষ্টেশন বা বিমান বন্দর ইত্যাদিতে, মানুষকে তথ্য দেয়ার জন্য, প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য, সহায়তা দেয়ার জন্য এরকম রোবটই সাধারণত থাকে। চেষ্টা করা হয় তাকে হাসিখুশি, বন্ধুসুলভ, স্মার্ট, বিনয়ী, অন্তরঙ্গ মানুষের মত করে তুলতে। তাতেই বোঝা যায় মানব-পরিবেশটি এবং মানব-অন্তরঙ্গতাটি কত

বেশি প্রয়োজন। এটি আরও প্রমাণ করে যে মানুষ এসব কাজের জন্য মানুষকেই প্রত্যাশা করে, রোবট তার বিকল্প মাত্র, আসল প্রত্যাশিত জন নয়। যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ– ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, গাইড, নেতা, অভিভাবক, পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী, সেবক, সঙ্গ দেয়ার সঙ্গী, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সহকর্মী, ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ রোবট ভালো কাজ করতে পারা সত্ত্বেও মানুষের জায়গাটি, মানুষের চাহিদাটি সেখানে বরাবর থাকবে এবং তাদেরকে অগ্রাধিকারও দেয়া হবে, হয়তো সব সময়, চিরকাল। খুব সম্ভব অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মানুষ আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিলিত পরিবেশই দেখতে পাবো, এবং সেটি খুবই সমৃদ্ধ একটি পরিবেশ হবে।

কোথায় আছি, সামনে কী:

এই যে মিলিত পরিবেশের কথা বলছি তার মধ্যে আজ আমরা কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছি, কোন দিকে চলছি তার প্রবণতা দেখলে ভবিষ্যতে কী আসছে তা আন্দাজ করা যাবে। কতগুলো খবর চাঞ্চল্যকর হওয়ার কারণে সবাই জানে, কিন্তু বাকি কিছু নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন ড্রাইভারবিহীন গাড়ি হঠাৎ করে এসে কোন কোন জায়গায় রাজপথে নিয়মিত চলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যদিও প্রথম প্রথম অনেকে হয়তো ভয়ে ভয়ে এতে চড়বে কিন্তু সব বিশ্লেষণ দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষ-ড্রাইভারের থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত গাড়ি বেশি নিরাপদ– যেখানে ড্রাইভার বেখেয়াল থাকে না, গল্প করে না, মোবাইল ফোনে কথা বলে না, বেপরোয়া চালায় না, কারো সঙ্গে গতির প্রতিযোগিতায় নামেনা; সামনে কোন কিছু এসে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় যান্ত্রিক ড্রাইভারের অনেক দ্রুত। চিন্তাটি হলো ড্রাইভারদের চাকরি নিয়ে। আপাতত অবশ্য একজন নিষ্ক্রিয় ড্রাইভার গাড়িতে থাকাই নিয়ম। দূরপাল্লার লরিতে যখন ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে তখনো আপাতত মানুষ ড্রাইভার আরামে বসে থাকবেন; শুধু কোথাও ট্রাফিকের লটঘট বেধে গেলে নিজে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিকল্প পথে ঘুরে যাবেন, না কি ট্রাফিক পুলিশের সাথে কথা বলে ফয়সালা করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেবেন– ওসব কাজ মানুষ ড্রাইভারই অনেক ভালো করেন। একই ব্যবস্থা শিগগির বিমান চালনার ক্ষেত্রেও হতে যাচ্ছে, কারণ পাইলট-বিহীন বিমান এখনই রয়েছে– চমৎকারভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে যাত্রীকে। কিন্তু তবুও পাইলট অন্তত একজন থাকবেন প্রধানত যাত্রীদের মনের শান্তির জন্য, তিনি ইচ্ছে করলে যন্ত্রপাতির ওপর নজর রাখতে

পারবেন বা বিমানের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নিতে পারবেন; তবে তাঁর প্রধান কাজ হবে যাত্রীদেরকে ফুরফুরে মেজাজে রাখা, তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, কখন কী হচ্ছে জানানো। এগুলো যাত্রীরা মানুষ-পাইলটের কাছেই শুনতে চাইবেন– যান্ত্রিক পাইলটের থেকে বেশি। এর জন্য অবশ্য যখন সব বিমান যন্ত্রচালিত হবে তখনো মানুষ পাইলটকে দূর পাল্লার এসব বিমান নিজে চালাবার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে; নইলে যাত্রীরা তাঁর সাহচর্যে ভরসা পাবেন কেন? কাজেই আপাতত পেশাটা টিকে থাকছে বলেই মনে হচ্ছে।

সেই কারণেই মানুষ-ডাক্তার এবং মানুষ-সার্জনও মনে হয় অনেকেই থেকে যাবেন– শুধু রুগীর মানব-স্পর্শ ও ভরসার জন্য। এটি সত্য যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিকিৎসা ও অপারেশন করার সক্ষমতা অনেক বেশি হতে যাচ্ছে– ইতোমধ্যেই অনেক বিষয়ে ওরা মানুষকে ছড়িয়ে গেছে। অতীত রুগীদের অসংখ্য তথ্যে ডুব দিয়ে যে দ্রুততায় ও গভীরতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে পারে তা মানুষ ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের মানব-মস্তিষ্কে ঝিলিক খেলে যাওয়া আইডিয়াগুলোতে অবশ্য প্রায়ই যন্ত্র পরাজিত হতে পারে। তাই অন্তত তেমনি সক্ষম অনেক মানুষ-ডাক্তার ও যন্ত্রের মিলিত কাজ আমাদের জন্য দারুণ একটি চিকিৎসা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে। যন্ত্রের দ্রুত দক্ষতার কারণে চিকিৎসার ব্যয়বহুলতা অনেক কমে যেতেও বাধ্য। কী ধরণের মানুষ-ডাক্তার ও মানুষ-নার্সের ওই অদ্ভুত মানব-স্পর্শ আছে যাঁদের ছাড়া এখনো ভালো চিকিৎসা হয় না, তাঁদেরকে সব দেশের রুগীরা ভালো করেই চেনেন। রুগীদের ভালো হওয়ার পেছনে তাঁদের যেই বিবেচনা, যেই ভরসা দেয়া সহমর্মী কথা, আর যেই হাতের স্পর্শ বাড়তি অবদান রাখে তার কথা কে না জানে। বাকি যাঁরা অবশ্য এমনিতেই এখন যন্ত্রের মত চিকিৎসা করেন, তাঁদের জায়গা অবশ্যই সঙ্গত কারণে যন্ত্রই দখল করবে, সমস্যা হবে শুধু তাঁদেরই।

অনেকটা মানুষের চেহারা নিয়েই সামনে আসা ওই রোবট অভ্যর্থনাকারীরা– আলাপ করা, প্রশ্নের উত্তর দেয়া, তথ্য দেয়া, নির্দেশনা দেয়া, কাজ করতে সাহায্য দেয়া, দোকানের সওদা দেখানো, এসবের ভালোমন্দ বুঝিয়ে দেয়া, প্যাকেট করে হাতে তুলে দিয়ে দাম নেয়া, রেস্টুরেন্টে অর্ডার নিয়ে খাবার এনে দেয়ার মত বহু রকমের কাজ করছে, করবে। সাধারণভাবে ওদের কাজ হলো মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন– যন্ত্রটি একজন মানুষের ভূমিকা নিয়ে এরকম সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা

করে। নানা ভাষার কথা অনুধাবন, প্রত্যেকের চেহারা, কথার স্বর ইত্যাদি চেনার ক্ষমতা, আশপাশের দৃশ্য চেনা ও অনুধাবন করা ইত্যাদির ক্ষমতা ওদেরকে সহজে এই সংযোগ স্থাপন করতে দেয়। এসব অনুধাবন ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ফলে এ কাজে ওরা খুব দক্ষ হয়ে পড়ে। তারপরও সব সক্ষমতা সত্ত্বেও তাদের যন্ত্রভাবটি কখনো চুকে যায় না। ওরা যে যন্ত্র সে কথা সবার বরাবর মনে থাকে, যার ফলে সংযোগটি কখনো মানুষে মানুষে সংযোগ হয়ে ওঠেনা– সব সময় যন্ত্রে-মানুষ সংযোগই থাকে। এ কারণেই অনেকে মনে করেন যে যন্ত্রে-মানুষে সংযোগের থেকেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক বেশি চমৎকার প্রয়োগ হচ্ছে মানুষে-মানুষে সংযোগকে অনেক উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার কাজে।

যেমন ধরা যাক দু'জন মানুষ একেবারেই ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির; পরস্পর আলাপ করে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছে– যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা মাঝখানে নীরবে থেকে শুধু তাদের ভাষাই অনুবাদ করে দিতে পারে না, ভাব-ভঙ্গি-সংস্কৃতির সবও এক রকম অনুবাদ করে অন্যের কাছে প্রাঞ্জল করে দিতে পারে। তেমনি ধরা যাক একজন খুব পণ্ডিত ব্যক্তি একজন অজ্ঞ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন, সেখানেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একই কাজ করতে পারে– অজ্ঞ মানুষের কাছে পণ্ডিতের সব কথার সব মানে ওই মানুষটি বোঝার মত করে সুন্দর তুলে ধরতে পারে, আবার অজ্ঞের কথা পণ্ডিতের কাছে। উভয়ের পরিবেশ-মনন-সংস্কৃতির অসংখ্য উপাত্ত থেকে ক্ষণিকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিংড়ে নিয়ে ওগুলোর মধ্যে তুলনা করে, পরস্পরের বোঝার ভঙ্গিতে তাকে রূপান্তরিত করে সে এটি করতে পারে। দুজন মানুষের অতি স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে এভাবে সে সম্ভব করে, কিন্তু নিজে সেখানে প্রকাশ্যে থাকে না। আরও অদ্ভুত কাজ সে করতে পারে। যেমন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব থেকে সকল উপাত্ত যদি তার দখলে থাকে তাহলে আজকের একজন মানুষের সঙ্গে প্রাচীন কালের একজন মানুষের কল্পিত আলাপও সে ঘটিয়ে দিতে পারে– দু'জনে কথা বলবে পরস্পরকে অনুধাবন করবে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে। এভাবে যে কোন মানুষ অতীতকে শুধু জানতেই পারবেনা একেবারে বাস্তবের মত মন থেকে উপলব্ধি করতে পারবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে তাতে অবাক হবার কারণ নেই, কারণ মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়েই তো সাহিত্য। এভাবে যে কোন দুই মানুষের মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া তুলে ধরার ক্ষমতা যার আছে সে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেনা কেন? মনে রাখতে হবে মানুষ-পাঠকের মন

ছুঁতে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে উপন্যাস লিখবে তা মানুষে মানুষে সংযোগের বিষয়, তার নিজের কোন উপস্থিতি তাতে নেই। এতখানি সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস পাঠকরা তার রচিত উপন্যাস থেকে মানুষ-সাহিত্যিকের উপন্যাস বেশি পছন্দ করবে। কারণ এই উপন্যাসে লেখক নিজে উপস্থিত– লেখক মানুষ হওয়াতে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের পরতে পরতে ছোঁয়া রাখবে, ওই ছোঁয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপন্যাসে পাঠক পাবেন না। একই কারণে ভবিষ্যতের মানুষ-পাঠক মানুষ-সাহিত্যিকদের জীবনই উদ্‌যাপন করবেন রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের মত; যান্ত্রিক-সাহিত্যিকের জীবন উদযাপনের কিছু নেই।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। ইতোমধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যান্ত্রিক সাংবাদিকদের দিয়ে গড়া সংবাদ সংস্থার খবর আমরা জেনেছি। তাদের পক্ষে খুব দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব, অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের সুযোগে। কিন্তু এখানেও মানুষে মানুষে সংযোগের বিষয়টাই মুখ্য। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধের গোলাগুলির মাঝখানে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও মাথার হ্যালমেট পরে 'ওয়ার করেসপন্ডেন্ট' হিসেবে যুদ্ধ-স্থলের যে মানুষ-সংবাদদাতা ওখানকার পরিস্থিতি বর্ণনা করছেন তাঁর কাজ কী যান্ত্রিক-সাংবাদিক নিয়ে নিতে পারবে? যদি নেয় আমরা সংবাদের গ্রাহকরা ওই সাহসী মানুষ ওয়ার করেসপন্ডেন্টের মানসিক অবস্থা থেকে নিজেকে যে ওই জায়গায় কল্পনা করতে পারতাম তার কী হবে? সে কারণেই আত্ম-নিবেদিত মানুষ-সাংবাদিক বরাবর থাকবেন, অন্তত অনেকেই থাকবেন, সবাই না থাকলেও।

শিক্ষায় যন্ত্রের প্রবেশ বহু আগে থেকেই হয়েছে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাকে আর এক মাত্রায় নিয়ে যাবে; কিন্তু তারপরও মানুষ-শিক্ষিকা সামনে না থাকলে অপূর্ণতাটি যে কি তা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না, বিশেষ করে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে। একেবারেই নতুন জন্ম হওয়া একটি শিশুর কথা চিন্তা করি– তারিখের অনেক আগে জন্ম হওয়া একটি প্রি-ম্যাচিওর শিশুর কথা বলি। তাকে রাখা হয় হাসপাতালে বিশেষ সুরক্ষিত কক্ষে যান্ত্রিক ইনক্যুবেটরের মধ্যে কারণ তার জীবন অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে, সেখানে অত্যন্ত উচ্চ মানের নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থা। তারপরও শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার আরও একটি উপায় দুনিয়ার সব হাসপাতালে এর সঙ্গে যোগ করা হয়– এটি হলো মায়ের খোলা বুকে গায়ের চামড়ার সঙ্গে শিশুর খোলা গায়ের চামড়া একেবারে ভালো করে লাগিয়ে প্রতিদিন দিন-রাতের একটি বড় সময় কাটানো। মা যদি তা করতে না পারেন হাসপাতালের একজন প্রশিক্ষিত

নার্স তা করে থাকেন। মানুষে মানুষে সংযোগের একটি অত্যন্ত সংবেদী উদাহরণ– যন্ত্র যার বিকল্প কোনদিন হতে পারবে না। এই মাতৃস্পর্শ একেবারেই মানবিক– ফলাফল ধন্বন্তরী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে সব কাজ বাইরে তেমন প্রচার না করেও নীরবে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকার, কোম্পানি ও সংস্থার ভেতরে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ, ইত্যাদি করে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত, ব্যবসা প্রশাসন, দাপ্তরিক প্রশাসন, প্রকৌশল, বিজ্ঞান গবেষণা, সুরক্ষা ও অপরাধ দমন, আইন-আদালত, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিস্তারিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে রত অসংখ্য মানুষের কাজকে করে দিয়ে। এক্ষেত্রে যন্ত্র গতানুগতিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো খুব দ্রুত লয়ে তো করছেই বহু উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পদে পদে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে সম্পাদন করে যাচ্ছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্র ও মানুষ এক সঙ্গে কাজ করছে। যন্ত্র ও মানুষের সেই সমাবেশের ওপরে মূল সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছেন মানুষ কাণ্ডারিরা। ভবিষ্যতে কাণ্ডারিদেরকে যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা পরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষ হতে হবে। সৃজনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টিই হবে এই কাজে মানুষ-কাণ্ডারিদের বড় পাথেয়। এই মূল কাণ্ডারির কাজ কোনদিন যন্ত্র নিতে পারবে সেটি অকল্পনীয়। কারণ একই, চেতনার অভাব।

একই কৌশলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুর সৃষ্টি করতে পারে দামি দামী সুরকারদের মত অথবা চিত্রকর্মও সৃষ্টি করতে পারে যা যে কোন সমজদারের দৃষ্টি কাড়তে পারে। কিন্তু সুরকার বীটাফোনের মস্তিষ্কের যে ঝড় আমরা তাঁর সিম্ফোনিতে অনুভব করতে পারি, অথবা শিল্পী ভ্যানগগের মস্তিষ্ককে যেভাবে তাঁর সূর্যমুখী চিত্রে দেখি, অথবা তাঁর আত্ম-প্রতিকৃতিতে– সেখানে তো তাঁর মস্তিষ্কের বিকল ছন্দগুলোও ধরা পড়ে। সুরের বা চিত্রের বোদ্ধারা ওই যান্ত্রিক কাজগুলোতে তো মস্তিষ্কের ঝড়, বা মস্তিষ্কের ভাঙ্গাগড়ার কোন সন্ধান পাবেননা– শিল্প অনুভূতির জন্য সেটিও যে দরকার। কাজেই এক পর্যায়ে যন্ত্র অসম্ভব ভালো কাজ করতে পারবে– মানুষ নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, গবেষককে অনেক গুণে ছাড়িয়ে যাবে; কিন্তু অন্য পর্যায়ে যেখানে মানব-মস্তিষ্কের স্পর্শ দরকার সেখানে ওটিকে বড়ই যান্ত্রিক দেখাবে– বারোয়ারিভাবে কাজ চলবে কিন্তু শীর্ষ অর্জন ঘটবে না। শীর্ষ অর্জনের জন্য সেখানে মানব সৃজনশীলতার জায়গাটি বরাবরই থেকে যাবে। বিজ্ঞানের ও গণিতের ইতিহাসে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটেনি, সেগুলো ঘটেছে বিজ্ঞানী বা গণিতবিদের অন্তর্দৃষ্টিতে ঝিলিক দিয়ে যাওয়া 'ইউরেকা' মুহূর্তে;

যেটি শুধু মানব মস্তিষ্কেই সম্ভব, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। তার বাইরে নিয়ম-বাঁধা সহযোগী গবেষণাগুলোতে অবশ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক বেশি সুবিধা থাকবে; তবে মানুষ-যন্ত্রে একত্র কাজই সেখানেও সর্বোত্তম হবে, যেমন হয়েছে খুব দ্রুত কোভিডের টিকা উদ্ভাবনে। আসলে ওই শীর্ষ অর্জনের জন্য বীটাফোন বা আইনস্টাইন হবার প্রয়োজন নেই। সাধারণ অসংখ্য কাজে যেখানে মানব-স্পর্শ প্রয়োজন সেখানেই শীর্ষ কর্মটি যে কোন সৃজনশীল ও সহমর্মী মানুষের জন্য রক্ষিত থাকবে– যেমন নবজাতককে বড় হতে দিতে হাজারো যান্ত্রিক আয়োজনের পরেও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন মানুষ-মা অথবা নিদেন একজন মানুষ-নার্স লাগবে।

কিন্তু যেখান থেকে মানুষের সম্পূর্ণ বিদায়ে আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ হওয়ার কথা নয় সেটি হলো কায়িক শ্রম ও গতানুগতিক একঘেঁয়ে কাজ– যেমন যাবতীয় উৎপাদনের কাজ– তা শিল্প, কৃষি, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ যা কিছুই হোক না কেন; এবং সৃজনশীল অংশটি বাদ দিয়ে যাবতীয় কারিগরি, নির্মাণ ইত্যাদি কাজও। এগুলোকে যান্ত্রিক শ্রমিকের কাছে হস্তান্তর করে যত তাড়াতাড়ি আমরা আরও সৃজনশীল, আরও সহমর্মী সেবামূলক কাজে যেতে পারবো, ততই মঙ্গল। তাছাড়া এর ফলে পাওয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অবকাশের সময়টি নিজের ও পরিবারের উচ্চতর শিক্ষা, বিকাশ এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবনকে উপভোগের কাজে যতই লাগাতে পারবো সেটি ততই মানবোচিত হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্বজোড়া বাতাবরণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে নিজেদের জীবন-জীবিকায় কী হতে যাচ্ছে তার কিছু আন্দাজ আমরা পেলাম। কিন্তু এসব সীমিত পরিসরে এক একটি জনপদের মানুষের বিষয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সব থেকে বড় ও ব্যাপক প্রভাব আসবে এর বিশ্বজোড়া নানা নেটওয়ার্ক থেকে, আজকের ইন্টারনেট থেকে যার সামান্য ধারণা আমরা করতে পারি। বিশ্বের সর্বত্র এই বুদ্ধিমত্তা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চালাবে এই নেটওয়ার্কগুলোই তার ফসল বিশ্বময় প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। এটি মোটেই শুধু তথ্যের আকারে আসবে না, বরং তথ্য, পণ্য, সেবা, যন্ত্র সব কিছুর আকারে আসবে– আজ যাকে বলা হয় 'ইনটারনেট অফ থিংস'– অনেকটা সে রকম। প্রত্যেকের চাহিদা, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ইত্যাদির দিকে সার্বক্ষণিক নজর রাখা এর কাজ হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোও এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই পৌঁছে যেতে পারে। এ ধরণের নেটওয়ার্ক অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যেমন কোভিড-১৯ ভাইরাসটি চীনের উহানে প্রথম যখন দেখা দেয় ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা করে ভাইরাসটি সনাক্ত করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিলো, তারপর ওখানকার কর্তৃপক্ষ আরও প্রচুর সময় নেয় সব আক্রান্তদেরকে এবং আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা সব মানুষকে খুঁজে বের করে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে। এগুলো সম্পন্ন হতে হতে একজন থেকে অন্য জনে সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিলো, যার ফলে বিশ্ব এত বড় সংকটে পড়েছে। এমন নতুন ভাইরাস উদ্ঘাটন ও এর পরবর্তী ব্যবস্থাগুলো নেয়ার জন্য দুনিয়ার সর্বত্র কার্যকর হবার মত কিছু ব্যবস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আগে থেকেই রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে সেটি যথেষ্ট দ্রুত কাজগুলো হবার মত নয়, জীবাণু সন্ধানকারী কিছু মানুষ বহু কষ্টে ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করলেও যথাসময়ে এসব ধরে ফেলতে পারেন না। এর আসল সমাধান হবে যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ উদ্ঘাটন ব্যবস্থার একটি নেটওয়ার্ক বিশ্বময় থাকা। তাহলে প্রথম মানুষটি সংক্রমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরা পড়বে এবং তাকে অন্য বেশি মানুষের সংস্পর্শে আসার আগেই আলাদা করে ফেলা যাবে। যে ক'জনের সংস্পর্শ ঘটে গেছে তাঁদেরকেও আলাদা করে ফেলা হবে– নেটওয়ার্কের মধ্যেই যেই ব্যবস্থাগুলো থাকবে। ইতোমধ্যেইতো সংস্পর্শের মানুষ শনাক্ত করার জন্য ইন্টারনেট ভিত্তিক অ্যাপ্স উদ্ভাবিত হয়েছে। যা আসছে তা হবে বিশ্বজোড়া।

যদি মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে লক ডাউন কোথাও করতে হয় তাহলে ওর মধ্যে কাদের খাদ্য, পানীয়, ওষুধ প্রয়োজন ইত্যাদি নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে জেনে নিয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই সরবরাহ করা সম্ভব। শুধু কোভিড কেন অন্য সব সংক্রামক রোগে বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত কাজে নেটওয়ার্ক এরকম ভূমিকা পালন করবে। যেমন ডেঙ্গুর এডিস মশার আবাসের খবর নেটওয়ার্কই দেবে এবং সেটিই সেখানে মশা ধ্বংসের ওষুধ ঠিক ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করবে। যে কোন ভাইরাসের প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টিকা উদ্ভাবন ব্যবস্থায় সেটি চলে গিয়ে টিকা তৈরির কাজও তক্ষুণি শুরু হতে পারে, পরে যতবার এর গুরুত্বপূর্ণ কোন মিউট্যান্ট তৈরি হবে সঙ্গে সঙ্গে তারও টিকা। ভাইরাসের জন্য নেটওয়ার্ক যা পারবে, বিশ্বের যে কোন জায়গায় দেখা দেয়া অন্য যে কোন দুর্যোগেও পারবে। যেমন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার আগেই শুঁকে বের করে সেখানে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে– এবং তা শুধু বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান বড় বিমান বন্দর বা হোটেলে নয়, যে কোন স্থানে

সাধারণ মানুষের বাড়িতেও, এমনকি সেখানে ছিচ্‌কে চুরির ঘটনা আটকাতেও।

এসবকে ইচ্ছে পূরণের কল্প-কাহিনি মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এ তা নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে এসব প্রযুক্তি এখনই আছে, যা দরকার তা হলো নেটওয়ার্কগুলো তৈরি করা; এটি হবে বিশ্ব ইউনিয়নের জন্য খুবই যুক্তিসঙ্গত একটি কাজ। এই নেটওয়ার্ক আসলে অসংখ্য তথ্য পাঠানো এবং সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য তার সঙ্গে ব্যাপক সংগঠনও প্রয়োজন– যান্ত্রিক কর্মীর দ্বারা পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজের জন্য। এগুলো এক ধরণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রিডের মত- যে রকম গ্রিডের মাধ্যমে এখন বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ আসে অনেকটা সে রকম। তবে এই গ্রিড এক তরফা হবেনা– শুধু আসবে না, যাবেও (ছাদের সৌরশক্তি থেকে পাওয়া নিজের বিদ্যুৎ যেমন কেউ কেউ গ্রিডে দেন অনেকটা সে রকম)। এটি হবে অত্যন্ত 'বুদ্ধিমান' গ্রিড– সে খোঁজ নেবে কার কী দরকার, কী রকম দরকার– সেই অনুযায়ী আসবে খাদ্য পণ্য, সেবা, চিকিৎসা, সুরক্ষা, তথ্য, বিনোদন ইত্যাদি, সবই আসবে যথাসম্ভব তড়িৎ গতিতে।

জ্ঞানের কাজ বা বিনোদনের কাজের কথাটাই যদি বলি, সেটি অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ এবং এখনো ইন্টারনেট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে আমার পছন্দের ছবি, গান, ওয়েবসাইট, প্রবন্ধ স্মার্ট ফোনে আমার কাছে হাজির করছে। তাও তখন নতুন মাত্রা পাবে। আমার আগ্রহগুলো ওই গ্রিড নিঁখুতভাবে আমার হাবভাব থেকে জেনে তো নেবেই, বরং আন্দাজ করে নেবে আর কোন কোন জিনিস আমার গোচরে আসলে আমি পছন্দ করতাম, যেমন কোন কোন প্রবন্ধ বা বই। এতে কিন্তু আমার কাজ যে বাড়বে তা নয় কারণ তার সারমর্ম সে আমার জন্য সব থেকে সুবিধামত অবস্থায় এনে দেবে, যেই মাধ্যমে আমি বেশি উপভোগ করি, চট্ করে বুঝি। কাজেই বিরাট একটি কঠিন প্রবন্ধকে সে আমার বোঝার মত করে সার-সংক্ষেপে, ভিডিয়োতে, বা কণ্ঠে আমাদের জানিয়ে দেবে। জ্ঞানের জন্য যা হতে পারে, বিনোদনের জন্যও হতে পারে। তারপরে বাড়তি আমি আর যা চাইবো তাও। আমি যদি অর্থনীতির আধুনিকতম তত্ত্ব, বা ডিএনএ'র কলাকৌশলের ধারে কাছেও না থাকি, আমার আগ্রহ দেখলে সে আমাকে ঠিকই বুঝিয়ে দেবে। কেন এত কিছু করতে যাবে? কারণ এই কাজটি আমার কাছে পর্বত-প্রমাণ মনে হতে পারে, কিন্তু তার কাছে নস্যি। আমি দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে, প্রিয় ঘটনার সঙ্গে এখনই

যুক্ত আছি ফেইসবুকে ও অন্যান্য মিডিয়াতে; কিন্তু এই গ্রিড আরও নানা ভাবে আমাকে যুক্ত রাখবে– অনেক বিবেচনা করে এমনভাবে যুক্ত করবে যাতে এদিকে আমারো দারুণ ভালো লাগে, ওদিকে যার সঙ্গে যুক্ত করছে তারও দারুণ ভালো লাগবে। এর কারণ আসল নিয়ন্ত্রণে সে থাকবেনা– নিয়ন্ত্রণে থাকবো আমরা, আমাদের সচেতন বা অবচেতন মনে, যন্ত্র হিসেবে সে সাহায্য করছে মাত্র।

তবে ওই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভয়টি থেকে যায়। যন্ত্রের পেছনে থেকে সত্যি সত্যি কোন ক্ষতিকর কর্তৃপক্ষ এই নিয়ন্ত্রণ করবেনা তো, এখন যে রকম সোশ্যাল মিডিয়ার কর্তৃপক্ষগুলোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। তার জন্য লাভজনক এমন পছন্দ ওই কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেনা তো? আমাকে সাহায্য করার নামে তারা আমার সকল ব্যক্তি গোপনীয়তা, আমার সকল তথ্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবেনা তো? তাদের ওপর অতি নির্ভরশীল হয়ে আমি একটি অসহায় অথর্বে পরিণত হবো না তো? ফলে এক বৈষম্য থেকে রক্ষা পেয়ে আমি আর একটি মহা-বৈষম্যের কবলে পড়ে যাবো। এজন্যই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ গণ-মানুষের হাতে থাকতে হবে ওই বিশ্ব ইউনিয়ন এবং তার মধ্যে নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের মাধ্যমে। ক্ষমতা সব মানুষের হাতে না রাখতে পারলে এই আশঙ্কা থেকেই যাবে; এখনো আছে, তখন আরও বেশি থাকবে। কাজেই এই শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্কগুলোর অভাবনীয় সুবিধাগুলো নিতে হলে আগেই এসব ব্যাপারে আমাদেরকে শক্ত, নিশ্ছিদ্র সমঝোতায় পৌঁছতে হবে, ইউনিয়নের মত কিছু এখনই গড়ে তুলতে হবে। তবে এর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এগুবে না, নেটওয়ার্ক এগুবে না, আগে থেকেই জুজুর ভয় পেয়ে এর কাজ বন্ধ করে দিতে হবে, তা কি হতে পারে? হ্যাকিং, বৈষম্য, তথ্য চুরির আশঙ্কায় আমরা যদি এখন ইন্টারনেট বন্ধ করে দিই, সেটি কেমন কাজ হবে? যে ক'টি অবশ্যম্ভাবী কারণে বিশ্ব ইউনিয়ন আমাদের গড়তেই হবে, নিরাপদ ও সর্বোত্তমভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নেটওয়ার্ক গড়া তার মধ্যে অন্যতম।

ঘরোয়া জীবনের বন্ধু

বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক যতই হোক শেষ অবধি সেগুলো বাইরে নীরবে কাজ করে যাবে। দৈনন্দিন আমাদের উপভোগের মধ্যে যা থাকবে তা হলো আনন্দের মধ্যে পরিবারের ভেতর ঘরোয়া জীবন যাপন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যা উপকার অন্তরঙ্গভাবে সেখানেই পেতে হবে। যেমন টেলিভিশনে একটি সিরিয়াল যখন দেখি, এর বিশেষজ্ঞ না হলে আমরা ভাবতে চাইনা কে কত

টাকা ব্যয় করে এটি তৈরি করেছে, কী কী কৌশল তাতে ব্যবহার করেছে, পর্দার অন্তরালে কত ঘটনা ঘটে গেছে ইত্যাদি। আমরা চাই পরিবার-পরিজন নিয়ে সোফায় বসে আরামে প্রতি রাতে শুধু সেটি উপভোগ করতে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি এ কাজে কোন সাহায্য করতে চায় তা হলে তাকেও একটি যন্ত্রবন্ধু হয়ে চুটিয়ে আরাম করে আমাদের সোফার কোথাও বসতে হবে। এই যন্ত্রবন্ধু আমাদের পছন্দ অপছন্দের হাসি-কান্নার যথেষ্ট খবর রাখে এমনই হবে, নইলে পরিবারের বন্ধু হলো কীভাবে? এজন্যই তো তার সঙ্গ এ পরিবারে সবার কাম্য। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে তাদের পছন্দ বদলাচ্ছে, বাবা-মা'র জীবনেও পরিবর্তন আসছে। যন্ত্রবন্ধু এসব খুব লক্ষ্য করে, নিজের কাজও সে ওই ভাবে বদলে নিচ্ছে– কার কী নতুন ভাব, কী নতুন পছন্দ সব সে শিখে নিচ্ছে, ওটাই তো তার 'মেশিন লারনিং'। সে ঠিকই খেয়াল রেখেছে পরিবারের ছোট্ট খুকিটি এখন খুকি নেই, সে এখন টিনএইজে ঢুকে গেছে, তার টিনএইজ মুডের এখন ঠিক-ঠিকানা নেই, সেটি বুঝে চলতে হবে। সেই হিসেবে সে আগে থেকে যোগাড় করে রাখছে আনকোরা সব বিনোদন-ব্যবস্থা– নতুন চুটকি, গল্প, নাটক– কী নয়? অন্যদিকে একেবারে নবজাতক নতুন শিশুদের দিকেও সে খেয়াল রাখছে।

নবজাতকের কথায় মনে হলো সেদিন ইন্টারনেটে দেখা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে তৈরি একটি নতুন ছোট্ট যন্ত্রের কথা। এখন ভাবছি তাইতো, ঘরোয়া বন্ধুতো সবচেয়ে মনোযোগী হবে এরকম শিশু, বা বয়োবৃদ্ধ, বা প্রতিবন্ধী, পরিবারের দুর্বল সদস্যদের প্রতি। তাদেরকে যদি হাসিখুশি স্বাভাবিক রাখা যায় অন্য সবার মত, তবে সেখানেই তো তার আসল বাহাদুরি। নতুন শিশুর জন্য যে ছোট্ট যন্ত্রটি ইন্টারনেটে দেখলাম তা হার্টের আকৃতির ছোট্ট তুলতুলে একটি খেলনার মত, শিশুর বাকি সব পোশাক-আশাকের সঙ্গে বেশ মানানসই। এর কাজ শিশুর কান্নাকে বিশ্লেষণ করে সে কী চায় তা বোঝা। নতুন বাচ্চা কাঁদে সাধারণ তিনটি কারণের কোনটিতে– ক্ষিদে পেয়েছে বলে, পেটে ব্যথা হয়েছে বলে, অথবা কেউ তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেনা বলে। কারণটি বুঝতে পারলে সেই ব্যবস্থা করে কান্না থামানো যেতো। অভিজ্ঞ মা'রা অনেক সময় কান্নার ধরণ দেখে বুঝতে পারেন, কিন্তু তাও ভুল হয়ে যায়; অন্যরা তো মোটেই পারেন না, কান্না না থামাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যন্ত্রটি কিন্তু কান্নাটি রেকর্ড করে, আওয়াজ বিশ্লেষণ করে নির্ভুলভাবে বলে দেয় কারণটি কী– ওই তিনটি কথা লেখা তিনটি বাতি আছে, তার মধ্যে যে কোন একটি জ্বলে ওঠে; তখন সেই অনুসারে হয় দুধ দিতে হয়, নয় তার পজিশন বদলিয়ে

পেটের গ্যাস বের করার চেষ্টা করতে হয়, অথবা কোলে তুলে আদর করতে হয়– ওই বাতির কথায়। দেখা গেছে সাফল্য প্রায় ষোলো আনা। আসলে অভিজ্ঞ মা বা আয়া যেভাবে প্রায়ই কান্নার কারণ বলে দিতে পারে, এই যন্ত্রও সেভাবেই পারে– আগের অভিজ্ঞতা থেকে। পার্থক্য হলো, মা'দের এই অভিজ্ঞতা সীমিত– বড়জোর কয়েকটি বাচ্চার ওপর। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগের হাজারো বাচ্চার ক্ষেত্রে এই কান্নার উপাত্ত যোগাড় করে, তার সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে একই কাজ করছে। এও যাকে বলে সেই 'বিগ ডাটা', তবে অতি ছোট অন্তরঙ্গ একটি কাজে। কান্নার শব্দের বিশ্লেষণে একেবারে তার ফ্রিকোয়েন্সির ওঠানামার প্রভৃতির সঙ্গে ওই কারণগুলোর সম্পর্ক খুঁজে দেখা হয়েছে হাজারো কেইসের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে। তার থেকেই এখনকার সিদ্ধান্ত– এ ভুল হবে কী করে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এভাবেই সব কিছু নিখুঁত করতে পারে। একই রকম নিখুঁতভাবে বয়োবৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ বা যত্নকে একেবারে স্বাভাবিকের মত করে তোলা হয়তো শিগগির সম্ভব হবে। সে ব্যবস্থাগুলো অবশ্য আরও অসংখ্য তথ্যের ভিত্তিতে হবে, প্রক্রিয়াকরণও হবে আরও অনেক অনেক জটিল– কিন্তু পদ্ধতি যেহেতু একই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে ওটি কোন সমস্যা নয়। এভাবে সে নিজে যন্ত্র হয়েও মানুষের দুঃখ-ব্যথা-হাসি-কান্নায় মানুষে মানুষে অসম্ভব সংযোগকে সে সম্ভব করে তুলতে পারে। দেখবো তার সব কাজ মানুষকে ঘিরেই হবে, তার নিজের জন্য নিজের কোন কাজ গড়ে ওঠবে না, কারণ তার চেতনা নেই, আত্মসচেতনতা নেই, মানুষের আছে।

ওই ঘরোয়া বন্ধু পারতপক্ষে আমাদের অসুখ-বিসুখের কথা বলে মন খারাপ করে দেবে না, কিন্তু ঠিকই টুথব্রাশ অথবা টয়লেট সীট অথবা বিছানা যখনই ব্যবহার করছি তখনই নীরবে আমার যাবতীয় স্বাস্থ্য-তথ্য– রক্ত, থুথু, নাড়ি, বর্জ্য সব কিছু থেকে জেনে নিয়ে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে– স্বাস্থ্য কোন দিকে যাচ্ছে। যতটুকু যখন আমাকে না জানালেই নয় ততটুকুই জানায়– সোজা বলে কী করতে হবে এবং করার ব্যবস্থাটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত নিজে করে দেয়– যেমন ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট; সে জানে কখন করলে ভালো হবে। অসুখ-বিসুখের মত গুরুতর বিষয় কেন, আমরা যে ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসি সেটি সে বিলক্ষণ জানে বলেই রান্নার কিছু রেসিপি আমাদের প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরে আমাদের খাবার টেবিলের আলাপ থেকে বুঝে ফেলে সবার দিক থেকে আজ বা কাল কী খেতে ভালো লাগবে। এগুলোর কাঁচা বাজার দোকানে অর্ডার করে যথাসময়ে আনিয়ে

বুদ্ধিমান চুলায় রেসিপি ফীড করে তৈরিও করে। আমাদেরকে অপশন দিচ্ছে আমরা কেউ রান্নায় অংশ নিতে চাই কিনা– কারণ জানে যে, আমরা কখনো কখনো এতে হাত লাগাতে পছন্দ করি। সাংসারিক বাজেটেরও নানা অপশন সে হাজির করে, অবশ্য নিজের পরামর্শটাও দিয়ে দেয়।

গ্রামে বা শহরে, দেশে বা বিদেশে যেখানে বেড়াতে যাই যাওয়ার সব ব্যবস্থাগুলো তো আলাপক্রমে সে করেই, তার ওপর ওখানকার ভাষা-সংস্কৃতি, দেখার ও করার জিনিস সবই আগে গবেষণা করে আমাদেরকে প্রস্তুত করে নেয়, আবার যা সারপ্রাইজ দেয়া উচিৎ সেটি সারপ্রাইজ দেবার জন্যও তৈরি থাকে। এসব শুনে তাকে যা খুশি তা করতে পারা আলাদিনের দৈত্যের মত মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে দৈত্য হবার তার কোন প্রয়োজন নেই, 'বিগ ডাটা' থেকে স্বাভাবিকভাবেই করতে পারে। শিশুর কান্না যেভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে ছোট্ট একটি তুলতুলে খেলনার মধ্যে লুকিয়ে থেকে, তেমনি বিনীতভাবে একই পদ্ধতিতে বাকি সবও করতে পারবে। গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে সব ভাষা তাৎক্ষণিক অনুবাদ করছি সেতো আজ বহুদিন হয়ে গেলো– সামনের কাজগুলোকেও মোটেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের থেকে আসছে বলে মনে হয় না। অন্যের সংস্কৃতি যে বুঝবো সেটি এখনো ইন্টারনেটে গিয়ে কিছু লেখা আর ছবি দেখে কিছু বুঝি, এবং এও বুঝে ফেলি যে কাজটি অতটা সহজ নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেভাবে সংস্কৃতি বোঝাবে না, সে বোঝাবে ওই সংস্কৃতির ভেতর এক্সরে'র মত, অণুবীক্ষণের মত ঢুকে, তাদের ইতিহাসে সত্যি সত্যি চলে গিয়ে। ওই সব কিছু যদি সে একসঙ্গে আমার ওপর ছেড়ে দেয় তাহলে আমি পাগল হয়ে সব গুলিয়ে ফেলবো। সে বরং আমার চোখের মত আমার মনকেও ওসবের কোন কোন দিকের ওপর 'ফোকাস' করতে দেবে, 'জুম' করতে দেবে, আবার ব্যাপক দৃশ্যপটে 'ওয়াইড এঙ্গেলে' দেখতে দেবে– নানা ইঙ্গিত থেকে (যেমন চোখের মণি) আমাকে বোঝে বলে আমার কখন কীভাবে দেখা বা বোঝা উচিৎ তার সুযোগও করে দেবে।

এভাবে তার বুদ্ধিমানের মত কাজ করার একটি সুবিধা হলো যন্ত্র হয়েও আসলে সে আমার কাছে যান্ত্রিক হবে না। ধরা যাক এমন একটি দেশে গেলাম যেখানে সবাই দশটার গাড়ি কয়টায় ছাড়ে সে প্রশ্ন করে। আমার ঘরোয়া বন্ধু যদি আমাকে যান্ত্রিকভাবে সে দেশের রেলওয়ে টাইম টেবিল দেখে ট্রেনের খবর দেয় তাহলে আমি স্টেশনে গিয়ে অনর্থক বসে থাকবো। সে কিন্তু দেশের সংস্কৃতি বুঝে কথা বলে, তাই মানুষ গাইডের মতই সঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাবে। তার বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম যে, সে শুধু নিয়মগুলো

বুঝে না, নিয়মের ব্যতিক্রমগুলোও বুঝে। এটি সে পারে কারণ ব্যতিক্রমেরও একটি প্যাটার্ন আছে। সেই প্যাটার্নের উপাত্ত থেকে সে ওটিও ধরে ফেলে। ওই দেশে ট্রেন চলাচলের ভাবগতিক সকালে কেমন হয় বিকেলে কেমন হয় সেই প্যাটার্ন সে বুঝে ফেলে– এত বছরের উপাত্ত আছে যে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। কাজেই আর যাই হোক এই ঘরোয়া বন্ধুকে যান্ত্রিক বলে বকা দিতে যাওয়া উচিত হবে না, কারণ দেখা যাবে যে তার থেকে আমরাই বেশি যান্ত্রিক। ঘরোয়া বন্ধুর কোন সাহায্য বারোয়ারিভাবে আসবে না, সবই আমার মাপে মাপে আসবে– বিনোদনের ক্ষেত্রে, বা খাবারের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, পেশার ক্ষেত্রে, অন্য কাজের ক্ষেত্রে- তা শিশুই হই, অতি বয়োবৃদ্ধই হই, কি প্রতিবন্ধীই হই ঠিক আমার প্রয়োজনে, আমার মাপে। সে যে রকম আমাকে ভালোভাবে বুঝতে শুরু করবে, আমিও কিন্তু তার ভাবভঙ্গি ক্রমে ক্রমে বেশি বুঝতে পারবো; তার যে রকম মানুষ-সাক্ষরতা বাড়বে আমারও সে রকম যন্ত্র-সাক্ষরতা বাড়বে। তখন আমার চাহিদার সঙ্গে তার কাজ আরও মিলিয়ে নিতে পারবো, তাকে সংশোধন করতে পারবো, হয়তো শুধু মুখের কথাতেই– যা সবাই পারবে। নিয়ন্ত্রণ সব সময় আমার কাছে, তার কাছে নয়। এর কারণ মানব মস্তিষ্কের 'কগনিশন' নামক একটি দারুণ ক্ষমতা লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে তৈরি হয়েছে– যেটি সরাসরি অন্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে; কিন্তু যন্ত্রে পারে না। একারণেই তার উপকারগুলো ক্রমে আরও ভালোভাবে নিতে পারবো, অথচ তার ওপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়বোনা যে তার কথাতেই চলতে হবে।

নিয়ন্ত্রণটাই প্রয়োজন, বাধা দেয়াটি নয়

যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার প্রতি অনেকের ভয়ভীতি আছে, অনেকে সেগুলোর দিকেই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খুব অভিনব ও শক্তিশালী প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ রকম ভয় নতুন নয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভয়টি আরও গুরুতর, কারণ এটি ক্রমে নিজেই শিখতে পারে। এটি মানুষের গড়া একটি সফটওয়্যার বটে কিন্তু এই সফটওয়্যার আবার নতুন সফটওয়্যার তৈরি করে নিজেকে ক্রমাগত শক্তিশালী করতে পারে। কাজেই অনেকের ভয় হলো শক্তিশালী হতে হতে এক সময় আমরা এর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবো। তখন ক্ষতিকর সব কিছু বিপুলভাবে আমাদের ওপর এসে পড়তে পারে, আমরা না চাইলেও। এমনকি এমন কথাও বলা হয় যে এক সময় এটি 'নিজের' স্বার্থে কাজ করবে, আমাদের স্বার্থে নয়, বরং আমাদের অস্থিত্ব বিলুপ্ত করতেও

তার বাধবে না। এসব কল্পনার পেছনে কাজ করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে একটি চেতনা আরওপ করা, মানুষের মতই চেতনা, যা এখন তার নেই, ভবিষ্যতেও থাকার কথা নয়। কারণ সে যন্ত্রই, জীববিবর্তনে সে আসেনি, আমরাই তৈরি করেছি; কাজেই সব যন্ত্রের মতই আমরা তার নিয়ন্ত্রণে থাকবো, সে যে নতুন নতুন শিখবে তাও আমরা চাইবো বলেই শিখবে, যতটুকু চাইবো ততটুকু। কাজেই কোন দিক থেকেই ক্ষতিগুলো চরম রূপ নেবার উপায় নেই, যদি না আমরা মানুষরাই নিজের স্বার্থেই আত্মঘাতী না হই। ওই যে বলা হচ্ছে এরা নিজের স্বার্থে কাজ করে আমাদের ক্ষতি করবে, এই 'স্বার্থ' জিনিসটাও কগ্‌নিশনের অংশ, এটি যন্ত্রের নেই, এমনকি অন্য জীবেরও নেই। অন্য জীবরাও চিন্তা করে স্বার্থপর হতে পারে না, শুধু মস্তিষ্কের প্রবৃত্তির কারণে আত্মরক্ষা ইত্যাদি করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি ক্ষতি করে তবে তার পেছনেও মানুষকে থাকতে হবে।

আমাদের উদ্ভাবিত নিউক্লিয়ার শক্তিকে অস্ত্রে পরিণত করে বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করার মত নিউক্লিয়ার অস্ত্র মজুদ রেখে এমন সম্ভাবনা আমরা বহুদিন থেকেই জিইয়ে রেখেছি। তবে খুশির খবর হলো ইতোমধ্যে থাকা মোটেও সন্তোষজনক নয় এমন সব সমঝোতায় জাতিসংঘের মাধ্যমেই আমরা দীর্ঘ ৭৫ বছর এই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছি। এটি পেরেছি আমরা আত্মঘাতী হইনি বলে, সব কিছু সমঝোতার ভেতরেই হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও আমরা আত্মঘাতী হবো, সমঝোতার মাধ্যমে সবকিছু করবো না এমন ভাবার কারণ নেই। এটি এমন প্রযুক্তি যা ইতোমধ্যেই আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে ভালো কাজই করছে, ভয় পেয়ে সবাই একমত হয়ে তার বিকাশ বন্ধ করে দেবে সে সম্ভাবনা কম।

ভয়গুলো কী তার কিছু ধারণা এখানে আমরা আগেই পেয়েছি, তাৎক্ষণিকভাবে তা দূর করার উপায়ও দেখেছি– যেমন এ মুহূর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে কারো চাকরি চলে গেলে ব্যক্তিগত ও আর্থ-সামাজিকভাবে দারুণ সমস্যা দেখা দেবে। দীর্ঘ মেয়াদে তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনেক মানুষের লাভজনক কাজ থাকবে না। তাদেরকে ভিন্নতর দক্ষতা অর্জন করে যেখানে মানুষের গুরুত্ব এখনো আছে সে সব কাজে চলে যাবার চেষ্টা করতে হবে। সেটি যেখানে সম্ভব হবেনা তাদেরকে 'সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের' আওতায় আনতে হবে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ট্যাক্স করার মাধ্যমে যেটি পরিচালিত হবে। কেউ কেউ এমন অনুদানকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন এই ভেবে যে কাজের চ্যালেঞ্জ ও আগ্রহ চলে গিয়ে এটি তাকে অথর্ব, এমনকি অনিষ্টকারীতে পরিণত করতে পারে।

এটি মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল ও সহমর্মী চরিত্রের ওপর একটি অন্যায় অনাস্থা বলে মনে করি। লাভজনক একটি কাজ ছাড়া মানুষ অমানুষ অথবা কিছুটা কম মানুষে পরিণত হবে এটি একটি অদ্ভুত কথা, এটি একটি জেন্ডার-বিরোধী কথাও বটে। মহিলারা যারা সার্বক্ষণিকভাবে সংসারের কাজ করেন তাঁদের সম্পর্কে কেউ এই কথা বলেন না, কখনো বলেননি। এর মানে এই দাঁড়ায় যে সংসারের কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করাটি পুরুষদের মানায় না। আর কিছু না হোক সন্তান পালন ও সন্তানের শিক্ষা মানুষকে চমৎকারভাবে সৃজনশীল করে রাখতে পারে; তেমনি অসংখ্য রকমের স্বেচ্ছাসেবী কাজও পারে; সৌখিন কাজও যে মানুষের ও দুনিয়ার কত কাজে লাগতে পারে তাও আমরা ভুলে যাইনি। কাজেই লাভজনক কাজ না করলে অথর্ব হতে হবে কেন? বরং আমারতো মনে হয় মানুষ যেদিন খাওয়া পরার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মনের উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবী ও সৃজনশীল কাজ করবে তখনই তার মানব গুণগুলো সত্যিকার বিকাশ লাভ করবে। ওদের কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেবী না হয়ে অনিষ্টকারীতে পরিণত হবে কিনা তা নির্ভর করার সমাজের শিক্ষাদীক্ষা ও মূল্যবোধের ওপর। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি যদি ঘটেও তাই বলে মাথা ব্যথা দূর করতে মাথা কেটে ফেলার কোন কারণ নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে যারা ব্যবসায়িক সুবিধা নেবে তাদেরকে অত্যন্ত উচ্চ হারে একটি করের অধীনে আনার জন্য প্রস্তাব করেছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেখা গেছে কম্পিউটারের ও ডিজিট্যাল প্রযুক্তি সংক্রান্ত সব যন্ত্রের ও তার দ্বারা উৎপাদিত সেবা, সিস্টেম ও পণ্যসমূহের উৎপাদন ব্যয় দ্রুত কমে গেছে, এবং ফলে এর পেছনে ভোক্তার খরচও ক্রমেই কমে এসেছে। 'মূরের নিয়ম' বলে একটি নিয়মই আছে যাতে বলা হয়েছে ১৯৬০-এরপর থেকে কম্পিউটারের ব্যয় ধারাবাহিকভাবে আগের বছরের থেকে অর্ধেক হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেহেতু নিজে শিখে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে পারে তার মাধ্যমে তৈরির পণ্য ও সার্ভিসের ব্যয় আরও দ্রুতগতিতে কমে যাবে; এবং সহজেই ওই সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের বিনিময়ে স্বচ্ছন্দে তা কেনা সম্ভব হবে ও তার ওপর জীবন ধারণও। অবশ্য অর্থকরী কাজের মাধ্যমে সম্ভব হলে এই আয়ের উপরেও যে কেউ আয় করতে পারবে একটি সীমা পর্যন্ত। যা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না তা হলো যে প্রারম্ভিক পুঁজির জোরে কোন ব্যক্তি বা বড় কোম্পানির পক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কুক্ষিগত করা ও সেভাবে আরও পুঁজি ও আরও সম্পদের পাহাড় গড়া।

সর্বসাধারণের মধ্যে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনে বাজার অর্থনীতির বাইরে গিয়ে কিছু করা যে যুক্তরাষ্ট্রে খুব জনপ্রিয় বিষয় নয় সে কথা সবাই জানে। কিন্তু সেখানকার রক্ষণবাদী অনেক অর্থনীবিদরাও পুঁজি ও সম্পদের ওপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আরোপ করে তা দিয়ে সর্বজনীন ন্যূনতম আয় দেবার পক্ষপাতী। কোভিডের দুর্যোগে সব মানুষকে সর্বজনীন ন্যূনতম আয় সহায়তা দেয়ার সাফল্যটিই তাঁদেরকে পথ দেখিয়েছে। কোম্পানি কিছুটা নগদে ও শেয়ারে এই কর দেবে, তাই ন্যূনতম আয়টিও নগদ ও শেয়ারে সবাইকে দেয়া যাবে– কাজেই এক ভাবে সব মানুষই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্ট পুঁজির মালিক হবে। এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ফলে সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের শ্রমের অবদান কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবে, অন্যদিকে পুঁজির অবদান তুঙ্গে পৌঁছবে এবং পুঁজির পরিমাণও দ্রুত বাড়বে। এর ভাগ সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপায়ই হলো এই ব্যবস্থা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে বৈষম্য বাড়া ও আর্থ-সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার যে ভয় তার সমাধান এভাবেই করা যাবে। যেহেতু পুঁজি সৃষ্টি হবে কোন কোন দেশে বেশি, কিন্তু এটি বণ্টিত হতে হবে সব দেশে, কাজেই এই ব্যবস্থার কর্তৃত্ব থাকতে হবে বিশ্ব কর্তৃপক্ষের, বিশ্ব ইউনিয়নের। শুরুতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা যে যে দেশে আছে পুঁজি সৃষ্টিকারী দেশের থেকে তাদের জন্য ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করে এটি শুরু করা যাবে, শেষ পর্যন্ত অর্থকরী কাজ যেহেতু সব দেশে অনেক মানুষই হারিয়ে ফেলবে, এটি সর্বজনীন হতে দেরি হবে না।

আর একটি ভয়ও কেউ কেউ করছেন যাও একটি চূড়ান্ত প্রকৃতির ভয় হিসেবে আমরা দেখেছি। যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা নিজেই দানব হয়ে উঠে মানুষের অস্থিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করবেনা তো ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো? কেউ কেউ দেখতে পান যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রভু হয়ে বসেছে এবং সব মানুষকে দাসে পরিণত করেছে। এটি কল্পকাহিনিভিত্তিক একটি সুদূর ভয়– বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। কোন সিস্টেম যখন একেবারে এমন একটি সংকট-বিন্দুতে পৌঁছে যায় যে তা অসম্ভব কোন ঘটনায় পরিণত হয় তাকেই বলা হয় সিঙ্গুলারিটি– গাণিতিকভাবে শূন্য দিয়ে সবকিছুকে ভাগ করার পরিস্থিতির মতো, যখন ভাগফল অসীমের দিকে– অসম্ভবের দিকে চলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলারিটি দেখা দেয়া মানে হলো কোথাও কিছু একটি ভুল হচ্ছে, ওটিকে অবশ্যই এড়াতে হবে, কারণ গণিতে সম্ভব হলেও বিজ্ঞানে এটি সম্ভব নয়। যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কেউ কেউ শুধু সিঙ্গুলারিটিকে কল্পনাই করছেন না, এর কোন সম্ভাবনা যেন কখনো না

আসে সে জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা ও ব্যবহারই হয় বন্ধ, নয় সীমিত করে দেয়ার পক্ষপাতী।

ভুলে গেলে চলবে না এমন কি ৭৫ বছর আগে থেকে চলে আসা নিউক্লিয়ার বোমায় পৃথিবী ধ্বংসের ব্যাপারটি কিন্তু সিঙ্গুলারিটি ছিল না, ওটি ছিল একেবারেই বাস্তব ভয়। সেই তুলনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে অস্থিত্ব হারানোর ভয়টি তাত্ত্বিক পর্যায়ের ভয়। বাস্তবটাই যখন এড়ানো গেছে– মানুষ ইচ্ছে করলে তাত্ত্বিকটাও এড়াতে পারবে। তারপরও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুণোত্তর হারে বিকাশের কথা চিন্তা করে এটি মাথায় রাখতে হবে। কোন প্রযুক্তি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটি সব সময় একটি অনিশ্চয়তার রাজ্য। তাই বলে অতীতে যেমন হয়নি তেমনি মানুষের কোন গবেষণার জন্য সীমা টেনে দেয়া যায় না– দিলে যা হয় তা প্রকাশ্য থেকে গোপনে চলে যায়, যেটি আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক। বরং গবেষণার ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে ক্ষতিকর দিকগুলোকে এড়িয়ে একে এগুতে দিতে হয়, দেখতে হয় এটি মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে তার মানবতাকে উচ্চে তুলে ধরে। শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নয়, সুরক্ষা আমাদের দরকার আরও অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ডিএনএ সংশ্লেষণের মাধ্যমে কৃত্রিম অণুজীব সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা ডানা মেলেছে, জিন কারিগরির সীমাহীন সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। মানব ঐক্যই একমাত্র পারবে সুরক্ষার মধ্যে সব কিছু করতে। সবাই মিলে এই সুরক্ষার জন্য আমরা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। মানুষ আমরা– একথাই মনে রাখা চাই।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।